সামাজিক উপন্যাস

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
প্রণীত।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৩২৪

মূল্য ১৷৹ টাকা।

উৎসর্গ

তুমি আগে আমার কেহই ছিলে না !
মধ্যে শ্রীভগবানের পবিত্র দানরূপে আমার
সংসার আলো করিয়া বিরাজিত ছিলে।
মহাকাল সে সমুজ্জ্বল দেউটী
নিভাইয়া দিয়াছেন। তুমি এখন চন্দ্রালোক
সমুজ্জ্বল বৈজয়ন্তে। আর আমি এই জ্বালাময়
মর্ত্ত্যে। এ মহাদূরত্বের একমাত্র সেতু, একমাত্র
বন্ধন—স্মৃতি। তাই স্বর্গমর্ত্ত্যের বিস্মৃতি তন্দ্রাচ্ছন্ন
কুহেলি যবনিকা অপসৃত করিয়া এই গ্রন্থের
সহিত তোমার পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত করিলাম।

উপহার

রমেশ একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন
"আবার জ্বালাতে এলে তুমি?"

স্বর্ণ-প্রতিমা

(১)

জীবনে যে একদিন সুখের অবস্থায় থাকিয়া নানা সুখভোগ করিয়াছে, সে অবস্থার অবসানে যখন দারিদ্র্যের মসীকৃষ্ণ ছায়া, তার নষ্টভাগ্যের উপর পড়িয়া চারিদিক আঁধার করিয়া দেয়, তখনকার অবস্থা সেই ভাগ্যতাড়িত ব্যক্তির পক্ষে একটা ভীষণ পরীক্ষা।

যখন স্মৃতির আগুন লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া, তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তনের অবসন্ন মনটাকে ক্রমাগতঃ ঝল্‌সাইয়া দিতে থাকে, সে জ্বালা সহ্য করিবার শক্তি তখন ক্রমশঃ লোপ হয়।

চক্রনেমির মত মানুষের ভাগ্য যে সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনীয়, একথা পুরুষকারের শক্তিতে দাম্ভিক মানুষ অনেক সময়ে বুঝিতে পারে না বলিয়া সে মদগর্ব্বে অধীর হয়। কিন্তু যখন এই পরিবর্ত্তিত ভাগ্য, তাহাকে সুখের পরিবর্ত্তে নিছক দুঃখ আনিয়া দেয়, আর সে সহস্র

ফিরাইতে পারে না, তখন সে প্রতি...

...ঘোষের এইরূপ অবস্থা
চাষ বাস ও চাকুরীতে, ...
...চলিবার উপযুক্ত বিত্তসম্ব...
...লেন। কিন্তু ভাগ্যদোষে সেটী বজায় রাখিতে পারে...
... কোনরূপ অপব্যয়ে যে তাঁহার উপার্জ্জিত ধন নষ্ট...
তাহা নহে। পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধ, জাঁক করিয়া জগদ্ধাত্রী...
অন্নপূর্ণাপূজা প্রভৃতিতে, আর গরীব দুঃখীর দায়ে...
মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করায়, যে তাঁহার এই অবস্থা উপনী...
ঠিক তাহাও নয়। কেন হইয়াছিল, তাহা পরে প্রকা...

পুণ্যকার্য্যে, সৎকর্ম্মে যাঁহারা অর্থব্যয় করেন, তাঁ...
ধর্ম্মের খাতায় জমা থাকে। তবে রমেশচন্দ্রের কেন এ...
পরিবর্ত্তন হইল, এ রহস্য সহজে মীমাংসিত হইবার নয়।

নারিকেলে জলসঞ্চারের মত, কমলা কখন আসেন...
চলিয়া যান, তাহা কেহ কখনও বলিতে পারে না।
সৌভাগ্য যখন আসিয়াছিল, তখন অতি গুপ্তভাবেই...
চলিয়া যাইবার সময় সেইরূপেই যাইল। ক্রিয়াকলাপে...
ভাবে অর্থাৎ আয়ের অপেক্ষা অধিক ব্যয় করিবার...
কারণ ছিল। সেটা আর কিছু নয় রমেশচন্দ্রের পুত্র-ক...
হয় নাই।

এইজন্য তিনি তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী, ছায়ার...

সারিণী ভার্য্যা কল্যাণীকে যখন তখন বুঝাইতেন, যে যখন ছেলে পুলে হইল না, তখন এই সব সৎকাজে ব্যয় করিয়া, পরকালের কিছু সম্বল করা উচিত। কল্যাণী, স্বামীর কথায় কখনও প্রতিবাদ করিতেন না, এজন্য রমেশচন্দ্র জীবনে হস্তসংকোচ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই প্রকার অতিরিক্ত ব্যয়ের মাত্রা যখন খুব চড়িয়া উঠিয়াছে, তখন তাঁহার পত্নী কল্যাণী এক কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। দিনে দিনে, শশীকলার মত এই কন্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। রমেশচন্দ্র আদর করিয়া কন্যার নাম রাখিলেন—স্বর্ণপ্রতিমা। আর সেটী ক্রমশঃ অপভ্রংশে দাঁড়াইয়া "প্রতিমা"তে পৌঁছাইল।

প্রতিমার জন্মের পরও রমেশচন্দ্রের আয় ব্যয় সমানভাবেই চলিতেছিল। আর প্রতিমার দশ বৎসর বয়সের সময়, এক অননুভূত ঘটনাচক্রে পড়িয়া, রমেশচন্দ্রের একশত টাকা মাহিনার চাকুরিটী গেল।

রমেশচন্দ্র হার্টম্যান ব্রাদারের বাড়ীতে ক্যাশে কাজ করিতেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার একজন সহকারীই তহবীল তছরূপ করে। কিন্তু এমন চতুরতার সহিত সেই ধূর্ত্ত সহকারী এই কাজ করিয়া আসিতেছিল, যে রমেশ তাহাকে তিলমাত্র সন্দেহ করিতেন না। শেষে সমস্ত দোষটা রমেশচন্দ্রের উপরেই পড়ে।

আপিসে যখন এই সব ব্যাপার লইয়া গোলমাল চলিতেছে, সেই সময়ে আপিসের বড় সাহেব একখানি বেনামী চিঠি পাইয়া একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

সে চিঠিতে লেখা ছিল—"রমেশচন্দ্র নিজের পল্লীভবনে
জাঁকজমকের সহিত পূজা আশ্রয় করেন, লোকজন খা
সব পূজার সময়ে যাত্রাদিও হয়। এইরূপে অপব্যয়
রমেশচন্দ্রের মন পাপের দিকে গিয়াছে। আশা করি
উদারতাগুণে বড় সাহেব তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

পত্রখানি ইংরাজীতে টাইপ করা। সুতরাং কার হা
রমেশচন্দ্র তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। আর এই
অজানিত বন্ধু যে কে, তাহাও সহজে তাঁহার মাথায় আসি

বড় সাহেব রমেশচন্দ্রকে খুব বিশ্বাস করিতেন, ভালও বা
কিন্তু অবিশ্বাসের পূর্ণ প্রমাণ সম্মুখে পাইয়া তাঁহার পূর্ব
মূল শিথিল হইল।

রমেশচন্দ্র নিজে না বুঝিতে পারিলেও, আপিসের লে
ছিল, যে তাঁহার অন্যতম সহকারী অদ্বৈতচরণের চেষ্টা
উড়ো চিঠিখানি বড়সাহেবের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে

এই কূটবুদ্ধি অদ্বৈতচরণকে রমেশচন্দ্রই আপিসে আনিয়া
আর এই অদ্বৈত যে রমেশচন্দ্রের চির অনুগত ও বিশ্বাসভা
সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে তিলমাত্র সন্দেহ জন্মে নাই। অদ্বৈ
ব্যাপারে মূলে আছে, একথা তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

হিসাব পত্র বড়সাহেব নিজে তজদিগ্ করিয়া বুঝিলে
"পঁয়তাল্লিশ শত" টাকা পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে
মধ্যে পড়িয়াছে। আর সমস্ত হিসাবপত্রও ভাউচারে
সহি আছে।

বড়সাহেব একদিন রমেশচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "যদিও আমি তোমায় অবিশ্বাস করি না, কিন্তু ঘটনাচক্রে দোষটা তোমারই উপর আসিয়া পড়িতেছে। এই টাকাটা যদি তুমি দাও, তাহা হইলে ব্যাপারটা আর পুলিশ পর্য্যন্ত গড়ায় না। আর তুমি আমার বিশেষ অনুগ্রহভাজন বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থায় আমি মিটাইয়া লইতে ইচ্ছুক। অপর কেহ হইলে তাহাকে ফৌজদারী মামলায় জড়িত করিতাম। তবে অনুগ্রহের মধ্যে এইটুকু করিতে পারি, এই চার হাজার পাঁচশো টাকা, আমার হাতে তুলিয়া দিলে তোমার চাকরিটা বজায় থাকিবে।"

রমেশচন্দ্র তাঁহার বিশ্বাসভাজন অদ্বৈতচন্দ্রের সহিত যুক্তি আঁটিতে আরম্ভ করিলেন। অদ্বৈত তাঁহাকে টাকা জমা দিতেই পরামর্শ দিল।

যে কারণে হউক, জমীজমা বেচিয়া, কিছু ধার কর্জ্জ করিয়া রমেশচন্দ্র সে যাত্রা ফৌজদারীর দায় হইতে উদ্ধার পাইলেন। অথচ ধর্ম্মতঃ তিনি এ ব্যাপারে একটুও দোষী নহেন।

ব্যাপারটা এইভাবে মিটিয়া গেলে, অদ্বৈতচন্দ্রও সেই সঙ্গে নিরাপদ হইল। ধরিতে গেলে সেই জ্ঞানত পাপী। রমেশচন্দ্র তাহার মহোপকারী বন্ধু, তবুও সে নিজে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কৌশল সহায়তায় সমস্ত দোষটা রমেশচন্দ্রের স্কন্ধেই ফেলিয়াছিল।

সংসারে একরকম ভয়ানক লোক আছে—তাহারা দু-মুখো সাপের প্রকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা বাহিরে দেখায় একান্ত হিতৈষিতা। আর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, উপকারীর সর্ব্বনাশ করিতেও ইহারা প্রস্তুত। ইহাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, আছে কেবল

নিজের স্বার্থ, নিজের সুখ। শ্রীমান্ অদ্বৈতচরণ এই শ্রেণীর লোক। তাহা না হইলে সে তাহার অন্নদাতা মহোপকারী রমেশচন্দ্রের এরূপ সর্ব্বনাশ করিবে কেন?

বলা বাহুল্য রমেশচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে এ সম্বন্ধে সন্দেহ বিমুক্ত করিবার জন্য, অদ্বৈতচরণ, তাহার বড়বাবুর এই বিপদ শান্তিতে দশবার টাকা গাঁট হইতে খরচ করিয়া কালীঘাটে পাঁটা দিল, মায়ের পূজা দিল। রমেশচন্দ্রকে সে প্রত্যক্ষভাবে বুঝাইয়া দিল, যে তাহার ন্যায় হিতকারী রমেশের এজগতে নাই।

রমেশচন্দ্র এই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, ছুটীর প্রার্থনা করিলেন। ছুটীও তিনি পাইলেন। আর ছুটীর পর কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া বসিলেন। বড় সাহেব রমেশকে ডাকাইয়া অনেক বুঝাইলেন, ইস্তফা পত্র প্রত্যাহার করিতে বলিলেন—কিন্তু রমেশচন্দ্র কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি সাহেবকে বলিলেন—"যে আপিসে এতদিন বিশ্বাসের সহিত কাজ করিয়া আসিয়াছি, সহকারীদের একান্ত বিশ্বাস করিয়া এই বিপদে পড়িয়াছিলাম, সেখানে চোরের ছাপ কপালে আঁটিয়া চাকরী করা, আমার পোষাইবে না সাহেব! আমি মনে জানি, কোন পাপ করি নাই। যাহা কিছু উপায় করিয়াছি তাহা ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিয়াছি, সুতরাং আমার অন্নাভাব হইবে না। বিশেষতঃ—হেমন্তবাবু ক্যাশে থাকিতে, আমি কখনই চাকরী করিব না।"

রমেশচন্দ্রের ভণ্ড হিতচিকীর্ষু অদ্বৈতচরণ, তাহাকে ইতিপূর্ব্বে খুব স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়া দিয়াছিল, সে ক্যাশ-ডিপার্টমেণ্টের

ছোটবাবু হেমন্তকুমারের চক্রান্তেই, তাঁহার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। আর তাহার কালীঘাটের পূজা দিবার দিনে, সে ইচ্ছা করিয়াই হেমন্তবাবুকে নিমন্ত্রণ করে নাই।

যাই হোক—দুর্ভাগ্যের প্ররোচনায়, রমেশচন্দ্র একটা নির্ব্বন্ধ দেখাইয়া চাকরী জবাব দিলেন। তাঁহার মনে একটা দর্প ছিল ক্যাশের কাজে তিনি অতি সুদক্ষ। এই কলিকাতায় সওদাগরী আফিসের অভাব নাই। কোন স্থানে খালি হইলেই তিনি অতি সহজেই আবার এই একশো টাকার চাকরী যোগাড় করিতে পারিবেন।

রমেশচন্দ্রের ইস্তফার ফলে, হেমন্তকুমার তাঁহার পদে পাকা হইলেন। অদ্বৈতচরণ হেমন্তের সহকারী পদে উন্নীত হইল।

একদিন অদ্বৈত, হেমন্তকে নিভৃতে পাইয়া বলিল—"কেমন, দেখলেন ত হেমন্তবাবু! যা বলেছিলুম তাই ঘটালুম। লোক-টার মনে একটা ধারণা হয়েছে যে আপনার যোগসাজোসে এইটে হয়েছে। বয়ে গেল তাতে আপনার। ভেবে দেখুন না রমেশ না সরলে এ পায়া পাওয়া আপনার পক্ষে বড়ই দুর্ঘট হতো। যাই হোক্ এবার থেকে আমার উপর একটু নজর রাখবেন।"

হেমন্তকুমার অদ্বৈতের এই মুরুব্বিয়ানায় মনে মনে বিরক্ত হইলেও মুখে বলিল—"সে আর বলতে অদ্বৈতবাবু! তবে তুমি খুব সাবধানে চলো। ভিতরের কথা আমি সবই জানি।"

(২)

রমেশচন্দ্র অতি সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। পরোপকার করাই তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম। এই অদ্বৈতচরণের চাকরী করিয়া দেওয়া, তাহার মাহিনা বাড়াইবার জন্য সাহেবের কাছে অনুরোধ করা, সবই তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরশ্রীকাতর অদ্বৈতচরণ বিনা কারণে, উপকৃত বন্ধুর শত্রুতা করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিল। কেবল যে তাহার ক্রূর স্বভাবের জন্য সে এই ভয়ানক কাজ করিল তাহা নয়, তাহার মনে একটা দূরাশা জন্মিয়াছিল, এক দিন সে এই হেড্-ক্যাশিয়ারের পায়াটী লাভ করিবে। কিন্তু রমেশচন্দ্র অক্ষয় পরমায়ু লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছিলেন। সুতরাং তাহার সে আশা সুসিদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

সংসারে—"জল উঁচু নীচু" বলা লোকের অভাব নাই। শক্তিমানের তোষামোদ সকলেই করে। যে সকল স্বর্ণগর্দ্দভ রাশিকৃত টাকার উপর বসিয়া আছে, তাহাদের চারিদিকে এই শ্রেণীর জীবের বড়ই আবির্ভাব। আপিসের মধ্যে যাঁহারা ভাগ্যক্রমে বড় বাবু হইয়া দাঁড়ান, সাহেবের নেকনজরের লোক হন, স্বার্থসিদ্ধির জন্য, এই সব জল-উঁচু-নীচুর দল তাঁহাদের চারিদিক বেষ্টন করিয়া, ক্রমাগতঃ শ্রুতিসুখকর তোষামোদের কথায়, তাহাদের ইহকাল পরকাল খাইতে থাকে। অদ্বৈত এই শ্রেণীর জীব।

সে যখন দেখিল, হেমন্তবাবু ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টের ছোট বাবু

হইলেন, তখন তাঁহার সহকারী ক্যাশিয়ার হইবার আশায় ছাই পড়িল। আড়ালে অন্তরালে সে রমেশচন্দ্রের নিকট হেমন্তের খুবই নিন্দা করিত, কিন্তু এখন সে হেমন্তের একমাত্র স্তাবক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেননা তখন সোণার কাঠি রূপার কাঠি, হেমন্তের হাতে।

হেমন্ত, অদ্বৈতকে মনে মনে ঘৃণা করিত বটে, কিন্তু বাহিরে সে ভাবটা দেখাইত না। বলা বাহুল্য, অদ্বৈত ও রমেশচন্দ্র এক গ্রামের লোক। অদ্বৈত, ভবানীপুরে এক মেসের বাসায় থাকিত। শনিবার শনিবার বাড়ী যাইত। তাও ঠিক নিয়মিত নয়। সে অবিবাহিত। বাড়ীতে এক বিধবা ভগ্নি ও বৃদ্ধামাতা।

বর্দ্ধমান জেলার কাননগাঁয়ে তাহার বাড়ী। অদ্বৈতচরণের মাত্র দুখানি চালাঘর। রমেশচন্দ্রের একতালা পাকা বাড়ী। উভয়ের বাড়ীর দূরত্ব গ্রাম্যপথ দিয়া এক মাইলের উপর।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। আপিসের অন্যান্য কেরাণীরা চলিয়া গিয়াছে। আফিসের মধ্যে আছেন কেবল হেমন্ত ও অদ্বৈতচরণ।

রমেশের চাকরী যাওয়ার পর, ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে তাঁহার দিন কাটিতেছে। সম্পত্তি যাহা কিছু করিয়াছিলেন, তাহা সব বাঁধা দিয়া গ্রামের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান উত্তমর্ণ কালীকিশোর চৌধুরীর নিকট হইতে তিনি সাড়ে চার হাজার টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন। সুদে সুদে সে টাকাটাও বাড়িতেছে। কালীকিশোর ভয়ানক সুদখোর লোক। তাহা ছাড়া রমেশচন্দ্র গ্রামের মধ্যে ক্রিয়াকলাপাদি করায়, সকলে তাঁহার অনুগত ছিল।

লোকে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত। সুদখোর কালীকিশোরের নাম সকাল বেলা কেহ করিত না। কালীকিশোর ইহা মনে জানিত, এজন্য রমেশচন্দ্রকে ঘৃণা করিত।

যাই হোক এখন হেমন্ত ও অদ্বৈতর মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইতেছে, তাহা আড়ি পাতিয়া আমাদের শুনিতে হইবে।

হেমন্ত। ওহে অদ্বৈত! আজ কাল তোমাদের লেট্ ক্যাশিয়ারের চল্‌ছে কেমন? তুমি তো গত শনিবারে বাড়ী গিয়েছিলে।

অদ্বৈত। চলছে ‘অন্তভক্ষধনুগু´ণের’ অবস্থায়। আফিসের ক্যাশ ভেঙ্গে পরিবারের যে গয়না গুলো গড়িয়েছিলেন, সে গুলো এক একখানা বিক্রমপুরে চলে গেছে।

হেমন্ত। আর বাড়ী বাগান?

অদ্বৈত। বাড়ীখানা এখনও হাতে আছে শুনেছি। তবে বাগান-টাগান আর ধানজমী গুলো কালীকিশোরের কাছে বাঁধা। সে একটা পেল্লায় সুদখোর মানুষ। তার গ্রাসে একবার যা যায় তা আর ফেরে না। কেউ ত কখনও দেখেনি!

হেমন্ত। গত সপ্তাহে ত অন্নপূর্ণা পূজো গেল। অবশ্য এবার পূজোটা তেমন জুৎসই হয়নি কেমন?

অদ্বৈত। আজ্ঞে পূজো হয়েছিল বৈকি? তবে ঘটপূজোয় সেরেছে। পাড়া প্রতিবাসী কাউকে খেতে বলেনি।

হেমন্ত। চাকরী বাকরীর কোন চেষ্টা কচ্ছে কি?

অদ্বৈত। শুনেছিলুম ত, দুই চারি জায়গায় চেষ্টার জন্য গিয়েছিল। তবে কিছু কত্তে পারেনি।

হেমন্ত। বেশ হয়েছে। দেখ অদ্বৈত! একটা কাজ কত্তে হবে।

অদ্বৈত। বলুন, কি কাজ?

হেমন্ত। বড় সাহেব এখনও রমেশকে ভুলতে পারেনি আমাকে সেদিন জিজ্ঞাসা কচ্ছিল রমেশ কি কচ্ছে?

অদ্বৈত। তারপর?

হেমন্ত। আমি মিথ্যে করে বল্লুম, সে আর সওদাগরী আপি চাকরী করবে না। এক জমীদারের তরফে একজন কর্ম্মচারি হয়েছে। মাহিনা ত্রিশ টাকা, কিন্তু তাতে চুরীর অর্থাৎ উপরি পাওনার খুব খোলা পথ। তা থেকে সে একশো টাকার উপর কামাতে পারে।

অদ্বৈত। সাহেব কি বল্লেন?

হেমন্ত। বল্লেন যেতে দাও;—তাকে বড় পছন্দ কত্তুম। তা সে যখন চাকরী জোগাড় করেছে তার উপর কথাই নেই! ভ এখন থেকে তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, কেন না সাহেবের ঘরে তুমিও কাগজ সই করাতে যাও। যদি কখন সাহেব তোমায় সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করে ত আমার কথারই প্রতিধ্বনি করো তা না হলে, তোমাকে আর আমাকে মিথ্যাবাদী হতে হবে। কারণ আমি বলেছি আমাদের আপিসের অদ্বৈত বাবুর কাছু থেকে আমি এ খবর পেয়েছি। কেমন কি না?

অদ্বৈত এক গাল হাসিয়া বলিল—"বলেন কি বড় বাবু! সে কথা আপনি আমায় বলে দেবেন, তবে আমি বলবো?"

জগতের গতিকই এই। স্বার্থের জন্য মানুষ একদিন যাহার

তোষামোদ করে, তাহাকে খুব বড় করিয়া তোলে, সেই স্বার্থের ব্যাঘাতেই আবার তাহাকে খুব ছোট করিয়া দেয়। এই অদ্বৈতের চাকরী রমেশচন্দ্রই করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পদোন্নতিও হইয়াছিল, এই রমেশের জন্য। এক সময়ে এই নরাধম অদ্বৈত ক্রমাগত "বড়বাবু" সম্বোধনে, রমেশের কানটাকে ঝালা পালা করিয়া তুলিত। আজ রমেশের কাছে কোন উপকারের প্রত্যাশা নাই বলিয়া, সে তাহার পেয়ারের এই তোষামোদের বিশেষণ "বড়বাবুটী" হেমন্ত সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া ধন্য হইতেছে।

হেমন্ত পূর্ব্ববঙ্গের লোক। বহুদিন কলিকাতায় বাস করিয়া তিনি এখনও তাঁহার জন্মভূমির স্বভাব সুলভ—"নির্ব্বন্ধ" গুণটাকে বিসর্জ্জন করিতে পারেন নাই। এই রমেশচন্দ্র তাঁহার চাকুরী-জীবনে, হেমন্তের প্রতি একটুও প্রসন্ন ছিলেন না। হেমন্ত যখন তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিত, অদ্বৈত তখনই গিয়া তাহা অবসর বুঝিয়া রমেশচন্দ্রকে লাগাইয়া তাঁহার কাণ ভারি করিত। এখন রমেশ অন্তর্হিত—হেমন্ত তাহার স্থানে অভিষিক্ত। এজন্য ক্রূরবুদ্ধি স্বার্থান্বেষী অদ্বৈত, তাহাকে তোষামোদ দ্বারা আয়ত্ত করিয়া নিজের চাকরী বজায়ের চেষ্টা করিতেছে।

হেমন্তের ধারণা, যে বড় সাহেব এখনও যদি রমেশকে পান তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় চাকরী দেন। যাহাতে তাহার আর ডাক না পড়ে, সেই জন্যই হেমন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। আর অদ্বৈতকে তাঁহার গুপ্তচররূপে তৈয়ারী করিয়া লইতে-ছিলেন।

হেমন্ত বলিলেন—"আচ্ছা অদ্বৈতচরণ ! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। তোমাদের রমেশবাবুর মামলার পর ধুমধাম করিয়া তোমরা যে কালীঘাটে পূজাটা দিলে, তাতে আমার নিমন্ত্রণটা বন্ধ করিলে কেন ?"

অদ্বৈত, যতক্ষণ বুঝিয়াছিল যে এই রমেশচন্দ্রের পুনরায় পূর্ব্বকর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা ষোল আনা, ততক্ষণ সে হেমন্তের বিরুদ্ধাচারী ছিল। সেই পাকেপ্রকারে রমেশকে বুঝাইয়াছিল, যে হেমন্ত অতি দুর্দ্দান্ত লোক। তাহার বেনামী চিঠিতে বড় সাহেব খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, সে চিঠিখানি খোদ অদ্বৈতচরণেরই লেখা। কিন্তু তখন সে রমেশকে তাহাই বুঝাইল। আর হেমন্তের উপর তাহার বিরাগ প্রতিপন্ন করিবার জন্য সেই তাহার নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছিল।

কিন্তু এখন পাশা উল্‌টাইয়া গিয়াছে। হেমন্তের এই প্রশ্নে শ্রীমান অদ্বৈতচরণ মহাসঙ্কটে পড়িল। কিন্তু সে উপস্থিত বুদ্ধির সহায়তায় বলিল—"সে কথা আর তোলেন কেন বড়বাবু ! সেটা বড়ই ঘেন্নার কথা ! ঐ রমেশ বাবুর নিষেধেই ত আমি আপনাকে বল্‌তে সাহস পাই নাই। কারণ এই ব্যাপারে যা কিছু খরচ পত্র হয়েছিল, সবই তার। এতে আমার অপরাধ কি বড়বাবু !"—

হেমন্তকুমার সহাস্যে বলিল—"তোমার দোষ কি ? তা তোমাকে একটা কথা বলে রাখ্‌ছি, অদ্বৈত ! ঐ রমেশ আমার অবনতির জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। আমার উপরে উঠবার পথ পর্য্যন্ত

উনি দেবে রেখেছিলেন। তা আমি যদি বাঙ্গাল-কায়েত হই, যেন তেন উপায়ে ঐ রমেশবাবুকে আমি নাস্তানাবদ করবোই করবো। আপিসের পেয়াদাদের পর্য্যন্ত কালীঘাটের ভোজে নেমন্তন্ন হলো, আর আমাকে বাদ দিয়ে ফেল্লেন। ব্যাপারটা হলো কিনা শিবহীন যজ্ঞ। ঐ যে কালীকিশোরের কথা বল্লে—সেত আমাদের এক গাঁয়েরই লোক। তার ছেলে নন্দকিশোর আমাকে গুরুর মত মান্য করে। ঐ কালী বা নন্দকে হাত করে আমি একবার রমেশকে দেখিয়ে দোব, যে বাঙ্গালে গোঁ কত ভয়ানক জিনিস। কেন—তুমি কি শোননি, আপিসে উনি আমাকে বাঙ্গাল বলে দশজনের সুমুখে ঠাট্টা তামাসা কত্তেন।”

এই সব কথা বার্ত্তায় ছয়টা বাজিয়া গেল। সুতরাং হেমন্ত অদ্বৈতকে বলিলেন—“চল—এখন তবে উঠা যাক্।”

উভয়ে আপিসের বাহিরে আসিলেন। দরোয়ানেরা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, হেমন্তকে লম্বা সেলাম করিল। অদ্বৈত ঢাকের বাঁয়া। সে এই সেলামের অর্দ্ধাংশ তাহারই প্রাপ্য মনে করিয়া, একটু মুচ্‌কিয়া হাসিল।

হেমন্তবাবু এক খানা ট্রামের ফাষ্ট ক্লাসে চড়িলেন। আর অদ্বৈতচরণ পদব্রজে ফুটপাথের উপর দিয়া চিন্তিতভাবে বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

(৩)

যে রমেশচন্দ্রকে লইয়া এই ব্যাপার, একবার তাহার অবস্থাটা কি দাঁড়াইল, তাহা আমাদের দেখিতে হইবে।

রমেশ বাহিরের কক্ষে বসিয়া তামাকুর ধূম পান করিতেছেন। কাছে কেহই নাই। তিনি নির্জ্জন অবস্থায় চিন্তা নিমগ্ন। তাঁহার সেই অধঃপতিত জীবনের বিষণ্ণ দিনে, এই গড়গড়াটী তাঁহার একমাত্র বন্ধু ছিল।

যখন রমেশচন্দ্রের সুদিন ছিল, যতদিন তিনি বড়বাবু ছিলেন, যতদিন তাঁহার একশত টাকা বেতনের চাকরী ছিল, যতদিন বহু ব্যয়বাহুল্য করিয়া পূজা উপলক্ষে তিনি দশজনকে তাঁহার দালানে পাত পাতাইতে পারিতেন, যখন লোকে ভাবিত, রমেশকে ধরিলে আমার ছেলেটীর বা জামাইটীর চাকরী হইতে পারে, যখন তিনি বিপন্নগণকে তাহাদের প্রয়োজনমত টাকা কড়ি দিতে পারিতেন, তখন তাঁহার বাহিরের এই বৈঠকখানা কোলাহলসংক্ষুব্ধ ছিল! হায়! এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য। বে অবস্থাহীন, শক্তিহীন, ঋণদায়গ্রস্ত দরিদ্র মাত্র!

প্রত্যেক টানের সহিত রাশিকৃত ধূম রমে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। আর রমেশচন্দ্র চিন্তাকুল কৃত, বাতায়নপথনিঃসৃত ধূমরাশির দিকে আকাশ পাতাল ভাবিতেছেন।

তাঁহার চিন্তার প্রধান কারণ দুইটী। প্রথ হৃদয়হীন মহাজন কালীকিশোরের কড়া তাগাদা তাহার সরকারের মারফৎ বলিয়া পাঠাইয়াছে টাকা ফেলিয়া রাখিতে পারিব না। তামাদি হইয়া গেলে আমাকে পথে বসিতে হইবে। টাকাত কম নয়, সুদে আসলে পাঁচ

হাজারের উপর দাঁড়াইয়াছে। রমেশবাবুকে তিন মাসের সময় দিলাম। মাঘ—ফাল্গুন—চৈত্র। যদি চৈত্রের শেষ সপ্তাহে টাকা না পাই, তাহা হইলে আদালতে খরচা জমা দিতে বাধ্য হইব।”

কথাটা বড়ই শক্ত। নালিশ করিলে এই ঋণের দায়ে রমেশচন্দ্রের বাস্তু ও তৎসংলগ্ন বাগানখানি পর্য্যন্ত থাকিবে না। তিনি একেবারে পথের ভিখারী হইবেন।

তাঁহার দ্বিতীয় চিন্তা প্রতিমা। সে এখন দ্বাদশ বৎসরে পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহার বাড়ন্ত গড়ন বলিয়া, যেন চৌদ্দবৎসরের মেয়ের মত দেখায়। এই বৰ্দ্ধিতাকায়া পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিলে তাহার যেন শোণিত শুকাইয়া যায়।

উপযুক্ত পাত্রানুসন্ধানের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিতেছিলেন না এরূপ নয়। কিন্তু অর্থ সামর্থ্য বিহীন চেষ্টা যে কিছুই নয়। ভাল পাত্রের স্থানে গেলেই, লোকে আড়াই হাজার হাঁকিয়া বসে। কাজেই ঋণভারগ্রস্ত রমেশচন্দ্র বিমর্ষমুখে ফিরিয়া আসেন।

পূর্ণ এক বৎসর তিনি বেকার অবস্থায় বসিয়া আছেন। কলিকাতায় আসিয়া বহুস্থানে বহুবার চাকরীর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রহ বিরূপ বলিয়া, কোথাও তাঁহার চাকরী জুটিল না।

রমেশের মনে এক একবার এ কথাটা উদয় হইয়াছিল, না হয় বড় সাহেবকে আবার কাঁদিয়া ধরি গে। যার পেটে ভাত নাই, এত বড় আইবুড়ো মেয়ে গলায়, তার আবার মানসম্ভ্রম কি? লাজ লজ্জা কি?

কিন্তু এই সময়ে হেমন্তের কথা মনে উঠায়, তিনি, তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন। তাঁহাকে বাহাল করিবার জন্য, সাহেব কিছু হেমন্তকে বড়তরফ করিতে পারেন না। চাকরী করিতে হইলে তাঁহাকে এই হেমন্তের অধীনেই করিতে হইবে। একজনের অন্ন মারিয়া নিজের অন্নরক্ষা করিতে, তিনি বড়ই নারাজ। তাঁহার অবস্থা ছোট হইয়া গিয়াছে বটে, মন তখনও তত ছোট হয় নাই। সুতরাং অভিমানী, দর্পিত, কর্ত্তব্যজ্ঞানপূর্ণ রমেশ, আপিসের কথা, মন হইতে একবারেই নিষ্কাসিত করিয়া দিলেন।

কিন্তু তাহা হইলেও দুশ্চিন্তা তাঁহাকে ছাড়িবে কেন? রমেশ নিবিষ্টমনে ধূমপান করিতেছেন, আর অতীত ও বর্ত্তমানের ভাবনা ভাবিতেছেন—এমন সময়ে পত্নী কল্যাণী দিল।

কল্যাণী জানিত, দুপুর বেলা বৈঠকখানায় কেহ এজন্য সে সম্মুখে আসিয়া বলিল—"দিন রাত ভাব্‌লে ক'দিন বাঁচবে?"

রমেশ একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"আ এলে তুমি?"

কল্যাণী। আমি এলে কি তোমার জ্বালা হয়? বল্‌তে নেই।

রমেশ। সাধে কি বলি কল্যাণ! রোগে বলায়। যাক্ খবর কি?

"খবর আছে, কথাটা যদি মন দিয়ে শোন তো বলি।"

"স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পার। তুমি যা বল—তাতো আমি চির-দিনই শুনে থাকি।"

"প্রতিমার জন্য একটা চেষ্টাবেষ্টা কিছুই কচ্ছ না? মেয়ে যে আর রাখা যায় না।"

"আবার সেই কথা কল্যাণ! তুমি দেখছি, বাড়ীতে টিক্‌তে দিলে না। ছেলে খোঁজবার ত্রুটি কি আমি করেছি, না কর্‌ছি! কিন্তু যার বলে, ছেলে বা ছেলের বাপ্‌কে হাত কর্ব্বো সে জিনিস্ যে আমার নেই। এ নির্ম্মম সমাজে, কেউ যে পরের মুখের দিকে চেয়ে দেখে না। সবাই এখন মনুষ্যত্ব হারিয়ে পয়সার ক্রীতদাস হয়েছে।"

"তা হলে কি প্রতিমার বিয়ে হবে না?"

"হবে না কেন? ভগবান মুখ তুলে চাইলেই হবে।"

"তুমি যদি চেষ্টা কর, তা হলে একটী ছেলের সন্ধান আমি বলে দিচ্ছি। বোধ হয়—সেটী হতে পারে। ও পাড়ার ক্ষান্তমাসী এই ছেলের সন্ধান দিয়েছেন। ছেলেটী দুটো পাশ করেছে, জমিজমাও আছে।"

"ঐ রে সর্ব্বনাশ! ঐ পাশই যে আমার কপালে পাঁশ ঢেলে দেবে। ও হবে না—হবে না। এখনিই হাজার আড়াই কি তিন চেয়ে বস্‌বে!"

"না—গো না। আমার কথাটা শোন না আগে।"

"বলে যাও।"

"ছেলেটীর বাপ নেই। মা আছে। মা বুড়ো হয়ে পড়েছে,

সংসারে একটী বৌ তাদের বড়ই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। তুমি যদি ছেলেটীর একটী চাকরী করে দিতে পার, তা হলে সাত আটশো টাকা হলেই সব হয়ে যাবে।"

"আর কি আমার সে দিন আছে কল্যাণী! যে চাকরী করে দোব? যে আপিসে আমি রাস্তার লোক ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে বসিয়ে দিয়েছি, এক ভয়ানক চোরের সঙ্গে পড়ে, নিষ্কলঙ্ক হয়েও, আমাকে সেখান থেকে কলঙ্কের ছাপ নিয়ে বেরিয়ে আস্‌তে হয়েছে। তার পর কপাল একবার ভাঙ্গলে, সে কপাল জোড়া দেওয়া বড়ই শক্ত কাজ। আমার নিজের জন্য না ঘুরেছি এমন জায়গা নেই! তবুও কি একটা চাকরী জোগাড় কর্ত্তে পার্‌লুম! দুহাতে একদিন যথেষ্ট টাকা খরচ করেছি, এখন একটী টাকার জন্য এক একদিন কিস্ত হয়ে লোকের কাছে হাত পাত্‌তে হয়! যখন আমার টাকার স্বচ্ছলতা ছিল, তখন এ মেয়ে আমার ঘরে জন্মায় নি। হায়! তাহলে কি বুঝে চল্‌তে পার্ত্তুম না!"

"দেখ যা হয়ে গেছে, তার জন্যে আপ্‌শোষ করে কি হবে? সময় খারাপ হলে, এইরূপ হয়েই থাকে। চিরদিন ত সমান যায় না। যা ছিল—তা ভুলে যাও, যা আছে—তাই আঁকড়ে ধরে থাক। আমাদের চেয়েও গরীব ভদ্রলোক এ সংসারে অনেক আছে। কিন্তু কোথাও ত দেখলুম না, কারুর অবিবাহিত মেয়ে ঘরে পড়ে রইলো। দিনরাত কেবল না ভেবে, আপ্‌শোষ না করে, ভগবানকে এক মনে ডাক দেখি। তিনি তোমার প্রতি

নিশ্চয়ই একদিন মুখ তুলে চাইবেন। কারুর কখনও অনিষ্ট কর নি, লোকের ভালই করে এসেছ, সৎকার্য্যে, ধর্ম্মকার্য্যে, টাকা খরচ করেছ। সে টাকা তোমার তোলা আছে। ছিঃ—ভেব না! একখানা মাঠ পার বই ত নয়। জামগাঁয়ের লক্ষ্মীকান্ত বোসের বাড়ীতে তোমার প্রতিমার পাত্র রয়েছে। তুমি গেলেই হবে। একবার যাওয়ায় দোষ কি ?"

ইদানীং কন্যার বিবাহে পাত্রানুসন্ধানের অসাফল্য জন্য, রমেশচন্দ্রের মনে এমন একটা নিরাশার ভাব দেখা দিয়াছিল। এজন্য তিনি এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হইতে বড় একটা ইচ্ছুক ছিলেন না। সকল কেন্দ্রেই এক সুর—একই রব, টাকা—টাকা টাকা। রমেশচন্দ্রের তখন টাকা নাই। কাজেই এ সব নিস্ফল ব্যাপারে অগ্রসর হইতে তিনি বড়ই নারাজ। কেননা—যতবার অগ্রসর হইয়াছেন, ততবারই অসাফল্যজনিত একটা মনস্তাপে, তাঁহাকে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। এজন্য তাঁহার পরমা গুণবতী পত্নী, যাহাকে না দেখিয়া তিনি এক দণ্ড থাকিতে পারেন না, সে কাছে আসিলেও তিনি বিরক্ত হইয়া উঠেন।

রমেশচন্দ্র একটা মস্ত গোলকধাঁদার মধ্যে পড়িয়া, পথভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতে ছিলেন। এক দিকে সাইলকের প্রকৃতিসম্পন্ন নীচ হৃদয় মহাজন কালীকিশোরের সুদের তাগাদা, নালিশ করিবার ভয়প্রদর্শন, তাঁহাকে বড়ই অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপর চৌদ্দবৎসরের বাড়ন্ত মেয়ে প্রতিমার ভাবনা খুব বেশী।

এই লক্ষ্মীকান্ত বোসের সহিত তাঁহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। লক্ষ্মীকান্ত জীবিত থাকিলে কোন ভাবনাই ছিল না। যাই হউক নানাদিক দিয়া ভাবিবার পর তিনি স্থির করিলেন, এই লক্ষ্মীকান্তের বিধবার দ্বারস্থ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। একটু বিশেষ করিয়া চেষ্টা করিলে হয়ত এটি হইতেও পারে।

তাঁহার দারুণ চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়, ইহাতে যেন অনেকটা লঘু হইয়া পড়িল। পাঁজিখানা খুলিয়া দেখিলেন, প্রথম দুইদিন কোন শুভকর্ম্মের পক্ষে একটুও ভাল নয়। পাঁজিতে যাত্রা শুভ, মাহেন্দ্রযোগ থাকিলে, নক্ষত্র বিরূপ। সেদিন সোমবার! মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি দিন ভাল নয়। এজন্য তিনি শুক্রবার প্রাতেই লক্ষ্মীকান্তের দ্বারস্থ হইবার সঙ্কল্প করিলেন।

(৪)

ভবিতব্য কিরূপে ভবিষ্যৎ ঘটনাচক্রের বীজ রোপণ করে, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনাতেই প্রমাণিত হইবে।

যে লক্ষ্মীকান্তের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ জন্য রমেশচন্দ্র শুক্রবার পাত্র দেখিবার জন্য দিন স্থির করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ঘরে বসিয়াই তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল।

তাঁহার প্রতিবাসী এক আত্মীয়ের বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে, লক্ষ্মীকান্তের পত্নী ও পুত্র কুটুম্বরূপে আসিয়াছিলেন। সর্ব্ব প্রথমে এই সংবাদ কল্যাণীর কাণে পৌছিল।

ভোজের দিনে কল্যাণী তাহার কন্যা স্বর্ণ-প্রতিমাকে যথাসম্ভব সাজাইয়া গুজাইয়া, ক্রিয়াবাড়ীতে লইয়া গেলেন।

প্রতিমা অতি রূপবতী। সাক্ষাৎ গৌরীর মত তার মূর্ত্তি-খানি। কাঁচা হলুদের মত তার গায়ের রং। চোখদুটী পটল চেরা। শ্যামা ঠাকরুণের মত একরাশ কালো চুল। যেন এক জীবন্ত স্বর্ণ-প্রতিমা।

কল্যাণীর প্রতিবেশিনী, যাহাকে তিনি ক্ষান্ত মাসিমা বলিতেন তিনিই মেয়েটীকে লইয়া লক্ষ্মীকান্তের পত্নীর কাছে গিয়া বলিলেন—"হাঁ গা! নরেশের মা, তোমরা ত আমাদের পর নয়। তুমিত আমাদের এই গাঁয়েরই মেয়ে। আমাদের টুক্-টুকে এই স্বর্ণ-প্রতিমাটিকে তোমায় বৌ কর্‌বে?"

নরেশের মা, মেয়েটীর রূপ দেখিয়া বড়ই প্রীতা হইলেন। তিনি সহাস্যমুখে বলিলেন—"আমার কপাল কি তেমন বোন্, যে এমন সুন্দর বৌ আমার হবে?"

প্রতিমার গাত্র সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কার-শূন্য। হাতে কেবল কয়েক গাছি চুড়ী। আর পরিধানে একখানি নীলাম্বরী ডুরে। কিন্তু তাহাতেই যেন, সোণার চাঁপার রং ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

মেয়েলী কথাবার্ত্তার ও পরিচয় আদানপ্রদানের পর, মোটা-মোটী একটা কথা হইয়া গেল। তাহাতে বোঝা গেল, আটশত খানি টাকার কমে এ বিবাহ হইতে পারে না।

কল্যাণী, মনে মনে ইহাতে বড়ই সুখী হইল। তখন তাহার গায়ে যে দুই তিন খানি ভারি গহনা ছিল, তা

বেচিলে নিশ্চয়ই পাঁচ ছয়শো টাকা হইবে। আর এ দিকের খরচ খরচা, আরও দুই তিন শো টাকা যোগাড় হইলেই, কাজটা একরকমে চলিয়া যাইবে।

বলা বাহুল্য, কল্যাণী তাহার স্বামীকেও, কৌশলক্রমে এই নরেশকে দেখাইতে ত্রুটি করিল না। আর রমেশেরও নরেশকে দেখিয়া খুবই পছন্দ হইল। রমেশ যতটুকু নরেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন—তাহাতে বুঝিলেন, ছেলেটী বেশ ঠাণ্ডা। আজ কাল কার মত উদ্ধত প্রকৃতির ছেলে নয়। আর এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, সুপারিশের অভাবে চাকরীর জোগাড় না হওয়ায়, সে ঘরে বসিয়া আছে।

ইতিপূর্ব্বে রমেশচন্দ্র আর একটী এণ্ট্রান্স ফেল ছেলে পাইয়াছিলেন। তাহাদের অবস্থা একটু উন্নত। তাহারা আঠার-শো টাকা চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত তুলনায় রমেশচন্দ্র বুঝিলেন, এই ছেলেটী সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অবস্থার উপযুক্ত।

যে কাজে বিধাতার হাত প্রচ্ছন্নভাবে লুকানো থাকে, সে কাজটা আপনি আপনিই অগ্রসর হইয়া যায়। তবে আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে, লক্ষ বাক্যব্যয় না হইলে, একটা বিয়ের ব্যাপারের মীমাংসা হয় না। কার্য্যক্ষেত্রে আমরা যে ইহা লক্ষ্য না করিয়াছি, তাহা নয়।

রমেশচন্দ্র ভাবিলেন, পাত্র পক্ষ টাকাটা কম চাহিতেছে বটে কিন্তু টাকাটা পাওয়াই বা যায় কোথায়? ভরসার মধ্যে তাঁহার

পত্নীর তিন চারি খানি অলঙ্কার। এ পর্য্যন্ত দুই একখানি বিক্রয় করিয়া তিনি সংসার চালাইয়াছেন। আর সে অন্ন, যেন তিনি বিষান্নের মত খাইয়াছেন। সুতরাং তিনি মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যে পত্নীর অলঙ্কার সাধ্যমত লইবেন না।

তাহা হইলে তাঁহাকে এই বিবাহের দরুণ আটশত ও লোকজন খাওয়াইবার জন্য আর দুইশত, মোটের উপর হাজার খানেক টাকা ঋণ করিতে হইবে। আর এই গ্রামের মধ্যে এক মাত্র ঋণদাতা, কালীকিশোর চৌধুরী! কিন্তু তাহার পূর্ব্বকার প্রাপ্য টাকার তাগাদারজ্বালায় তাঁহার গ্রামে তিষ্ঠান ভার হইয়াছে! যে তাঁহার কাছে পাঁচ হাজার টাকা পাইবে, সে যে তাঁহাকে আবার হাজার টাকা ধার দিবে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

এই দুইটী উপায় ছাড়া, তাঁহার আর যে কোন উপায়ই নাই। অন্য গ্রামে দুই একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক তেজারতির কারবার করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় নাই। আর তাঁহারা যে একবারে হাজার টাকা ধার দেন, এমন বোধ হয় না!

তাঁহার থাকিবার মধ্যে আছে, বাস্তুভিটা ও তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র বাগান খানি। এ গুলি বাধা দিলে, অবশ্য তিনি টাকাটা পাইতে পারেন। কিন্তু কালীকিশোর অতি ভয়ানক লোক। তিনি কাণাঘুষায় শুনিয়াছিলেন যে সে প্রকারান্তরে তাঁহার বাড়িটী দখল করিবার জন্য উপযুক্ত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহা হইলে তাঁহার যে দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না!

রমেশচন্দ্রের মাথাটা এই সব কথা ভাবিতে ভাবিতে বড়ই গরম

হইয়া উঠিল। নানা দিক দিয়া ভাবিয়াও তিনি তাঁহার চিন্তা মহাসমুদ্রের কুলকিনারা পাইলেন না। মনে মনে কেবল বলিতে লাগিলেন—"নারায়ণ! মধুসূদন! এ বিপদে রক্ষা কর।"

তিনি চোখ্ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে হাস্যমুখী ভার্য্যা কল্যাণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "ঘুমুলে না কি?"

রমেশচন্দ্র চোখ্ চাহিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমার মত হতভাগার কি নিদ্রা আছে কল্যাণি? আমি আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলাম।"

কল্যাণী। আর ভাবনা কেন? ছেলে ত পাইয়াছ। বেশ ছেলে, খাসা ছেলে।

রমেশ। তা বটে! কিন্তু এদিকে যে হাজার টাকা চাই।

কল্যাণী। এই আগুনলাগা বাজারে, আটশো টাকা দিয়ে পাশ করা জামাই পাচ্ছো! একি তত বেশী?

রমেশ। তা নয় বটে! কিন্তু আমার যে একটি পয়সাও নেই!

কল্যাণী। আমার গায়ের এখনও তিনখানা ভারী গয়না রয়েছে ত?

রমেশ। তোমার গহনা আমি নোব কেন?

কল্যাণী আমিই বা তাহ'লে তোমার দান নোব কেন?

রমেশ। আমি তোমার স্বামী, তোমাকে দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য!

কল্যাণী যে চিরদিন দিয়ে এসেছে, সে এক দিন নিতে

পারে। ও সব পাগ্‌লামো ছাড়। প্রতিমা এত বেড়ে উঠেছে, যে তার মুখের দিকে চাইলে, আর অন্ন মুখে দিতে ইচ্ছা হয় না। আমার দান বলে না নাও, এখন ধার বলে নাও। আমার বোধ হয় এই গহনাগুলো বিক্রী কল্লে, তুমি সাতশো আটশো টাকা পাবে।

এই কথা লইয়া স্বামী ও স্ত্রীতে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। শেষ রমেশচন্দ্রই কল্যাণীর যুক্তিবলে হারিলেন। তাঁহার টাকার ভাবনা অনেকটা কমিয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"এই কল্যাণীর মত স্ত্রী যার হয়, সে কত ভাগ্যবান! দারুণ দুঃখ, আমাকে চারিদিক হইতে নিপীড়িত করিতেছে। অন্য কেউ হইলে, হয়তো এই দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করিত। কিন্তু আমার প্রচণ্ড দুঃখের শান্তি, যে এই কল্যাণী করিয়া দিতেছে! মলিন দুঃখভার পীড়িত তাহার সুন্দর মুখখানিতে হাসি দেখিলে আমি যে সকল দুঃখ ভুলিয়া যাই।"

কল্যাণী একদৃষ্টে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তার পর সে বলিল, এখন বাকী দুশো টাকার জোগাড়ের ভাবনা তুমি ভাব। দেখ! আর একটা নূতন খবর তোমাকে জানাতে এসেছিলুম।

রমেশ। আবার কি খবর?

কল্যাণী। তাঁরা বলে পাঠিয়েছেন, এই মাসের আটুই ভাল দিন আছে। সেই দিনে বিবাহ দিতে হবে। আরও দুই এক জায়গা থেকে খুব সুপারিশওয়ালা সম্বন্ধ এসেছে। কিন্তু এ বিবাহটা ঠিক করে ফেলতে পারলে, আর কেউ তাহাদের

কাছে এগুতে পারবে না। নরেশের মা তোমার প্রতিমাকে খুব পছন্দ করেছেন। সেইজন্য ক্ষান্ত মাসীকে দিয়ে, এই খবর পাঠিয়েছেন।

রমেশ চিন্তিতভাবে বলিলেন—"তা হলে ত মোটে আর পনর দিন বাকী। গয়নাই বা গড়াই কখন? বাজার হাটের সময় বা কই!

কল্যাণী। সে জন্য তোমার ভাবনা নেই। আমাদের গ্রামে যে সেকরা আছে সে না পারে কি? বের গহনা তিন চার দিনেই সে দেয়। তারা কি কি চেয়েছে, তার ফর্দ্দ আমি পেয়েছি। তুমি একবার তামাক খেয়ে, আমার গয়নাগুলো নিয়ে সেকরাবাড়ী যাও। তাহ'লে আর বেশী কষ্ট কর্ত্তে হবে না।

রমেশচন্দ্র পত্নীর কথাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া ভাবিল। সে তাহার ইচ্ছানুসারে সকল কাজই সুসম্পন্ন করিয়া আসিল বটে, কিন্তু গহনা বিক্রয়ে পুরাপুরী ছয় শত টাকা পাইল না।

ফর্দ্দে ছিল, নগদ দুইশত এক টাকা দিতে হইবে, আর বাকী টাকা গহনা ও বরাভরণে যাইবে। কিন্তু এই বিক্রয় ব্যাপারে পঞ্চাশ ষাট্ টাকার কম্‌তি হওয়ায়, রমেশচন্দ্র একটু গোলে পড়িলেন। বিক্রয়ে বাণীর দরুণ টাকাটা যেমন মারা গেল, তেমনি নূতন গহনা গড়িবার জন্য বাণীর টাকাও লাগিল। দুই দিকেই ক্ষতি, কিন্তু এরূপ করা ভিন্ন তো উপায় নাই, গত্যন্তর নাই।

রমেশচন্দ্র বিষন্নমুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া পত্নীকে সমস্ত কথাই বলিলেন। কল্যাণী সকল কথা মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিল—এ সব ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপারে এইরূপ হয়েই থাকে।

তার জন্য ভাবনা কি? প্রয়োজন মতে যখন তোমায় দুই শত টাকা কর্জ্জ করিতে হইবে, তখন সে স্থলে না হয় আরও একশত টাকা বেশী হইল।"

রমেশচন্দ্র এই বিপদের সময় একটু হাসিলেন। কল্যাণী সে হাসি দেখিতে পাইল। সে বলিল,—"হাসিলে যে?"

রমেশ। হাসিলাম তোমার কথা শুনিয়া। টাকা কর্জ্জ করিতে ত হইবে তা জানি। কিন্তু কর্জ্জ পাই কোথায়?

কল্যাণী। কেন কালীকিশোর বাবুর কাছে! জমীদার লোক তিনি, তোমার সঙ্গে এক সময়ে খুব দহরম মহরম ছিল। তোমার এই বিপদের সময় তিনি কি আর তিনশত টাকা ধার দিবেন না?

রমেশ। তুমি কি জাননা কল্যাণী! তাঁহার কাছে আমি পাঁচটী হাজার টাকার জন্য ঋণী। আর সে টাকা স্ুদে স্ুদে বাড়িতেছে।

কল্যাণী। হোক্‌না তোমার বাড়ীখানাত এখনও আছে, বাগানখানাও এখন তোমার দখলে। আজ কালকার বাজারের মেয়ের বিয়ে দিতে হলে, এসব বাঁধাদিয়ে কাজ করিতে হয়।

বাড়ী-বাঁধার কথা শুনিয়া, রমেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিল। সে চিন্তিতভাবে তাহার কেশ-গুচ্ছ মধ্যে অঙ্গুলিপ্রবেশ করাইয়া দিয়া স্থিরভাবে কি ভাবিল। তারপর বলিল,—পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়া থাকিব কোথায় কল্যাণি! চিরদিন কোঠাঘরে বাস করিয়া আসিয়া শেষ কিনা মেটে ঘরে থাকিব!

কল্যাণীর চোখে একথা শুনিয়া জল আসিল। সে বলিল,—"ও সব কথা এখন ভুলিয়া যাও। ভগবানের ইচ্ছায় সবই হয়। তিনি তোমায় কোঠা দিয়াছিলেন, আবার কখনও তাঁর কৃপা হয় তিনি বালাখানা করিয়া দিবেন। মান-সম্ভ্রম আগে, তারপর নিজেদের সুখ-দুঃখ। তোমার শত্রুরা তোমার আইবুড়ো কন্যার বিবাহ হইতেছে না ভাবিয়া যখন মুখ মুচ্‌কাইয়া হাসিবে, নিষ্ঠুর প্রাণহীন সমাজ, তোমাকে করুণা না করিয়া আরও পীড়ন করিবে, তখন তুমি যে মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তার চেয়ে কি পর্ণকুটীরে বা মেটেঘরে বাস বেশী কষ্টকর? একটা মেয়ে আমাদের! সে যাহাতে সুপাত্রে পড়ে, তাহার জন্য আমাদের সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে।"

রমেশচন্দ্র এতক্ষণ এ সোজা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া যাতনায় ছটফট্ করিতেছিল। কল্যাণীর কথা শুনিয়া তাহার সে যাতনাটা যেন কমিয়া গেল। সে ভাবিল, কল্যাণী যা বলিতেছে, তাই ঠিক। চিরদিন যে এই দুঃখের দিন থাকিবে তা তো নয়। আবার ভগবান আমার দিকে একদিন না একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন। আমি আমার নিজের কর্ম্মফলে কষ্ট পাইতেছি। ভগবানের দোষ দিই বা কেন? এই কল্যাণী অশিক্ষিতা রমণী হইয়া যাহা বুঝিয়াছে, আমি শিক্ষিত পুরুষ হইয়া তাহা এতক্ষণ বুঝি নাই! তবে সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া দেখিব, যাহাতে বাস্তুটা রক্ষা পায়। কালই কালীকিশোর চৌধুরীর কাছে গিয়া, আগে বাগানখানা বাঁধা দিবার প্রস্তাব করিব। তাহাতে যদি কাজ উদ্ধার হইয়া যায় ভালই। না হয় শেষ ভরসা—এই পিতৃপুরুষের বাস্তু।

মধ্যাহ্নকাল। দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। পত্নী কল্যাণী পতিকে বলিল,—"এখন ত ভাবনা কমিল। যাও—স্নান করে এস। পেটে ছুটো অন্ন দাও। হায়! এই মেয়েটা যদি আমার পেটে না জন্মাইত।"

কন্যা প্রতিমা, দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পিতামাতার কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। সে বুঝিল, তাহার জন্যই পিতামাতার এত কষ্ট।

প্রতিমা বড় সুবোধ মেয়ে। ভগবান তাহাকে যেমন রূপ সম্পদ দিয়াছেন, সেই হিসাবে মনের সৌন্দর্য্যও দিয়াছেন। সে মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া বলিল,—"ঠাকুর! আমার বাপ-মার দুশ্চিন্তা নাশ করিয়া দাও। বাবার মনের সঙ্কল্প যেন সফল হয়। আমাদের বাস্তুখানি যেন না যায়।"

রমেশচন্দ্রের আহার হইয়া গিয়াছে। তিনি আচমনাদি করিয়া একটী পান মুখে গুঁজিয়া, বাহিরের বৈঠকখানার কক্ষে বসিয়া তাঁহার সাধের গড়গড়ায় ধীরে ধীরে টান মারিতেছেন, এমন সময় কে বাহির হইতে বলিল—"জয় রাধেকৃষ্ণ!"

বৈঠকখানার দরোজাটা খোলা ছিল। রমেশচন্দ্র উঁকি মারিয়া দেখিলেন, ভগা-পাগলা। রমেশ সহাস্যমুখে বলিল—"এস ভগবান! ভিতরে এস।"

ভগবান ভিতরে গেল বটে, কিন্তু রমেশচন্দ্র তাহাকে ইঙ্গিত করাতেও, সে তাঁহার পার্শ্বে বিছানায় বসিল না। সে বলিল, "আমার পা'টা ময়লা। আর আপনার মত লোকের সঙ্গে একত্রে বসবার যোগ্য লোক আমি নই।"

রমেশচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন—"ভগবান! তুমি এই তক্ত-পোষের উপরেই বসো। নইলে আমি বড়ই দুঃখিত হবো। পা'টা ঝুলিয়ে বসলেই চল্‌বে।"

ভগবান অগত্যা রমেশের পাশে গিয়া বসিল। রমেশ বলিল—"অনেকদিন এ দিকে এস নাইতো ভগবান!"

ভগবান। ফুরসুত কই বড়বাবু! এ গাঁয়ে এলে আপনার-বাড়ীতে আগে আসি। আপনাকে আমি বাপের মত দেখি। আপনার পূজা-পার্ব্বণের দিনে পেট ভ'রে কত খেয়েছি। যাক্—আমার মা, আমার স্বর্ণ দিদি, সবাই ভাল আছে ত?"

রমেশচন্দ্র এই সরলহৃদয় মুক্তপ্রাণ ভগবান—ওরফে ভগা পাগলার কথা শুনিয়া, মনে মনে বড়ই প্রীত হইলেন। তারপর সহাস্যমুখে বলিলেন—"হাঁ তাহারা সব ভাল আছে! তবে স্বর্ণের বের জন্যে আমার মনটা বড় খারাপ! ভগবান! এই দুনিয়ার মানুষগুলো যদি তোমার মত সরলচিত্ত হতো, তাহ'লে জগতটা কি সুখের হতো বল দেখি? যাক্ তুমি ভাল আছ ত?"

ভগবান সহাস্যে বলিল—"আমার আর ভাল থাকাথাকি কি বড়বাবু! আমার অবস্থা সেই "বসুধৈব কুটুম্বকম্" গোছ। চিরদিনই "ভোজনং যত্র তত্রঞ্চ শয়নং হট্টমন্দিরে।"

রমেশচন্দ্র ভগবানের মুখে তাহার অবস্থার এই ভাবের ব্যুৎপত্তি শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"ভগবান! আমি যতদূর জানি তাতে তোমার মত পরোপকারী মহৎচরিত্র লোক খুব কম দেখেছি। আমাদের এই সংসার একজন দু'জন লোক নিয়ে। তোমার

সংসার এই বঙ্গের প্রত্যেক পল্লী। তুমিই ত দরিদ্র বিধবার দ্বাদশীর পারণ ব্যবস্থা করে দাও। তুমিই ত বিপন্ন অবস্থাহীনের বাড়ী থেকে মড়া ব'য়ে নিয়ে যাও। তুমিই ত নিজে ভিক্ষে করে পরকে খাওয়াও। ভিখারী হয়ে ভিক্ষে দাও। তুমিই ত অনাথকে বিপদ থেকে মুক্ত কর। ওপাড়ার মতি বাগদিনীর উপযুক্ত ছেলেটা তিন দিনের জ্বরে মলো। পুত্রশোককাতরা বিধবার চোখের জল কেউ মোছাতে গেল না। তুমি নিজের গাঁট থেকে টাকা দিয়ে ঘাড়ে করে মড়া নিয়ে, তার সদ্গতি করে এলে! করিম মুসল-মানের চালাখানায় আগুন ধরে গেল। তার আশ্রয়স্থান লোপ হল। তুমি ঘরামী হয়ে তার ঘর বেঁধে দিলে। তর্করত্নের বিধবার অবস্থা বড় হীন। তার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবার অর্থ পর্য্যন্ত ছিল না। আমি শুনেছি, তুমিই নিজের পয়সা খরচ করে, তাকে পালকী চড়িয়ে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসেছ।"

ভগবান আশপাশের গ্রামের সকলের নিকট "ভগা পাগলা" বলিয়া পরিচিত। কিন্তু রমেশচন্দ্র তাহাকে "ভগবান" বলিয়াই ডাকিতেন।

ভগা বলিল—"বড়বাবু! আপনার কথা শুনে খুব হাসি এলো। দেখুন! ভগবানের রাজত্বে যারা মানুষ হয়ে জন্মায়, তারা অনেক কাজ করে। আর অনেকে কাজ কর্ত্তে পারে না বলে, আপশোষ করে। যাদের মগজ ভাল, শক্তি আছে, তারাই যখন সংসারের কোন ভাল কাজ ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কর্ত্তে পারে না, তখন আমি পাগল মানুষ, আমার দ্বারা যে কিছুই

হতে পারে না, সেটাও আমি বুঝি? তা বড়বাবু! আপনি একটু আরাম করুন। আমি চল্লুম।

রমেশ। চল্লে কি ভগবান! তোমার মুখ শুক্‌নো। স্নান কর নি দেখ্‌ছি। তোমার আহার হয়েছে কি?

ভগবান্ বাবু! অন্নপূর্ণা বেটী বড় খামখেয়ালী। সে পাগলের পরিবার কিনা! আজ ভুলে গেছে, যে আমায় চারটী ভাত দিতে হবে।

রমেশ। ওঃ সর্ব্বনাশ! বসো এইখানে। আমি এখনি বাড়ীর ভিতর থেকে আস্‌ছি!

রমেশ বাড়ীর ভিতরে গিয়া, রান্নাঘরের দ্বারসমীপস্থ হইয়া ডাকিলেন—কল্যাণি!

কল্যাণী তখন সকলকে খাওয়াইয়া, হেঁসেল নিকাইয়া, নিজের ভাতটী বাড়িয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। স্বামীর আহ্বানে, সে রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল,—"কেন গা! এমন ব্যস্ত হয়ে এলে কেন?"

রমেশ তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?

কল্যাণী। কেন বল দেখি!

রমেশ। সেই ভগা পাগলা এসেছে। এত বেলা, তবু তার পেটে চারটী ভাত নেই।

কল্যাণী। তার জন্য ভাবনা কি? আজ আমি হাঁড়িতে বেশী চাল দিয়েছিলুম। ঠিক আন্দাজ কর্ত্তে পারিনি। আর যা তরকারী ও বেলার জন্য রেখেছি, তা থেকে দিলেই চল্‌বে যাবে।

তুমি তাকে বাড়ীর ভেতর ডেকে দাও। সে আমাকে মা বলে, স্বর্ণকে দিদি বলে। আহা! এত জ্ঞানের কথা ঐ পাগলের মুখে!

রমেশ বাহিরে চলিয়া গেল। তৎপরে ভগবানকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতরে আসিয়া কল্যাণীকে বলিল—"তা হ'লে আর দেরী কর না। একটু তেল দাও আগে। ও নেয়ে আসুক। আর এদিকে—তুমিও ভাতটা বেড়ে ফেল।"

ভগবান হাসিমুখে বলিল—"ওমা! কেমন আছ গো?"

কল্যাণী। তুমিতো অনেক দিন আমায় ভুলে ছিলে বাবা! তুমি বড় নিষ্ঠুর ছেলে।

ভগবান। আমার দিদিমণি কোথায়!

কল্যাণী। সে পাশের বাড়ীতে খেলাতে গেছে। যাক্—এখন তুমি নেয়ে এসো। বড্ডো বেলা হয়েছে।

ভগবান তেল মাখিয়া, স্নান করিতে গেল। বাড়ীর বাহিরেই রমেশচন্দ্রের বাঁধা ঘাটওয়ালা, কাকচক্ষুর ন্যায় সলিলপূর্ণ পুষ্করিণী। রমেশের যখন সময় ভাল ছিল, তখন তিনি সাধারণের স্নানের ও জল ব্যবহারের জন্য এই পুকুরটি কাটাইয়া দেন।

এদিকে কল্যাণী একখানি থালে ভাত বাড়িয়া, তাহার চারিদিকে দুই তিনটি তরকারী সাজাইয়া দিয়া, প্রস্তুত হইয়া থাকিল। বলা বাহুল্য, সে তাহার নিজের জন্য সঞ্চিত অন্নগুলি এইরূপে বাড়িয়া দিয়া, সেই অন্নের থালার পাশে বসিয়া রহিল।

ভগবান আহারে বসিলে, কল্যাণী বলিল—"এত বেলা হয়ে গেছে, খেপা ছেলে! ওঁর সঙ্গে বসে কি কথা হচ্ছিল? আগে চারটি

খেয়ে গেলেই হ'তো। ভাতগুলো একেবারে শুকিয়ে গেছে! আহা! খাবার বড় কষ্ট হল।"

এই কথা বলিয়া কল্যাণী রান্নাঘরের ভিতর গিয়া একটি ছোট বাটী করিয়া একটু দুধ ও গুড় লইয়া আসিল। তাহা ভগা পাগলার পাতের কাছে রাখিয়া বলিল,—"ভগবান! আজ আর আমাদের সে অবস্থা নেই। এই টুকু দুধ তোমার পাতে দিতে বড় লজ্জা বোধ হচ্ছে।"

ভগবান হাসিয়া বলিল—"তার জন্য লজ্জা কি মা? আমি ত তোমার ছেলে বই তো নয়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, গোপন করবে না ত মা!

কল্যাণী। কি কথা?

ভগবান। তুমি ত নিজের ভাত গুলি আমায় দাও নি! আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

কল্যাণী। না—না অ দোব কেন? হাঁড়ীতে এখনও অনেক ভাত আছে।

ভগবান ভাতগুলি শেষ করিয়া বলিল—"মা! আজ বড় তৃপ্তি হলো।"

কল্যাণী। আর চারটী ভাত দোবো কি?

ভগবান কি ভাবিয়া একটু মুচ্ কিয়া হাসিল। সে হাসি কল্যাণী দেখিতে পাইল না। ভগবান বলিল—"দাও! মুটো খানেক?"

এ ভাত চাহিবার ব্যাপারে, ভগবানের একটু নষ্টামি ছিল :-

সে স্থিরনিশ্চয় বুঝিয়াছিল, যে কল্যাণী তাহাকে নিজের ভাতগুলি ধরিয়া দিয়াছেন। অন্ন ছুঁইবার পূর্ব্বে সে একথা বুঝিতে পারিলে, হয়ত খাইতে বসিত না। অনেক বেলা অবধি উপোষ করিয়া থাকিলে, মুখের যে একটা শুক্‌নো ভাব আসে, আহারাদি করিলে সেটা থাকে না। ভগবান যখন কল্যাণীর সহিত কথোপকথন কালে এ টুকু লক্ষ্য করিল—তখন সে বড়ই অপ্রতিভ হইল। আর কল্যাণীর কথা, অর্থাৎ "হাঁড়ীতে এখনও অনেক ভাত আছে" এই কথাটা সত্য কিনা, তাহা পরীক্ষার জন্য চারিটী ভাত চাহিয়া বসিল।

কল্যাণী তখন ধরা পড়িয়া গেলেন। হাঁড়ীতে সত্যসত্যই ভাত ছিল না। ভগবান যে আবার ভাত চাহিয়া বসিবে, তাহাও তিনি জানিতেন না।

কল্যাণীর এই ব্যতিব্যস্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া ভগবান বলিল,—"মা! ছেলের কাছে কি কিছু গোপন করিতে আছে! আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, যে তুমি তোমার নিজের ভোজ্য অন্নগুলি, আমাকে দিয়াছ। আর এর ফলে আজ তোমাকে উপোষ করিতে হইবে! সতীলক্ষ্মী মা আমার! তোমাদের মত ধর্ম্মশীলা নারীর জন্য আজও হিন্দুর সংসার টিকিয়া আছে। সত্যসত্যই তৃপ্তির সহিত আমার আহার হইয়াছে। তোমাকে পরীক্ষার জন্য, এরূপ বলিয়াছিলাম।"

কল্যাণী দেখিলেন—মিথ্যাকথাটা বলিয়া তিনি বড়ই অন্যায় কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এরূপ স্থলে সত্য কথা বলিলে

ভগবান, হয়তো মনক্ষুণ্ণ হইয়া আহার করিবে, না হয় অন্ন ছাড়িয়া "একটা খেয়ালের বশে উঠিয়া দাঁড়াইবে। এজন্য তিনি মনে মনে বলিলেন, আজ দেখিলাম, ভগবান সত্য সত্যই লোককে পরীক্ষা করেন, আর সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, মানুষের মনে একটা পবিত্র তেজের আবির্ভাব হয়।" কল্যাণীর সেদিন তাহাই ঘটিয়াছিল।

ভগবান ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল—"মা! তাহলে কি তুমি আজ উপোস করে থাকবে।"

কল্যাণী হাসিয়া বলিল—"ভগবানের কৃপায়, ঘরে মুড়ি ও গুড় আছে। তাতেই এ বেলা কেটে যাবে।"

ভগবান বলিল—"মা! তুমি চিরায়তী হয়ে থাক। কখনও যেন তোমার কোন অভাব উপস্থিত না হয়।"

কল্যাণী বলিল—"বাবা! সেই আশীর্ব্বাদই কর।"

আহারান্তে ভগবান বাহিরে চলিয়া গেল। দেখিল, রমেশচন্দ্র তখন শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়াছেন। চোখ বুজিয়া ঘুমাইতেছেন। সে তাঁহাকে না ডাকিয়া অতি সন্তর্পণে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

তারপর বাড়ীর দরোজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অস্ফুটস্বরে বলিল "তোকে মা বলিয়াছি। আজ তোর মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইয়াছি—জননী। জানিস্ মা! হৃদয়ের এই সামান্য মহত্ত্ব দেখাইয়া তুই আজ ভগবানকে কিনিয়া রাখিলি।"

এই ভগবান ওরফে ভগা-পাগলা যে কে, তাহার একটু পরিচয় দিব। সেটুকু না বলিলে ভগবানকে বুঝিবার সুবিধা হইবে না।

ভগবান—যে সব গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত, সে সব গ্রামের কোনটিরই অধিবাসী সে নয়। সে যে কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় তার আদিনিবাস, তাও কেহ জানে না, বা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে না। কিম্বা জিজ্ঞাসা করিলেও, তাহার সদুত্তর পায় না।

ভগবান সাধারণ শ্রেণীর পাগল নহে। তাহার কাপড় চোপড় আধময়লা বটে, কিন্তু তাহার মন বড় পরিষ্কার। তাহার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্যই হইতেছে—পরোপকার। যে কোন দায়ে পড়িয়া তাহার সাহায্যভিক্ষা করিত, সেই সাহায্য পাইত। গরীব দুঃখী সে। এজন্য দরিদ্র নারায়ণের সেবায়, সে তাহার চিত্তসমর্পণ করিয়াছিল।

ভগবান যার তার বাড়ীতে ভিক্ষা করিত না। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভিন্ন আর কাহারও বাড়ীতে সে অন্নভোজন করিত না। এজন্য অনেকে অনুমান করিত, সে কায়স্থ। তাহার নীচের বর্ণ পর্য্যায়ে অন্নগ্রহণ করিতে সে রাজি নয়।

যে গ্রামে রমেশচন্দ্রের বাস, সে গ্রামে সে রমেশচন্দ্রের এবং তাঁহার প্রতিবাসী তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বাড়ীতে, কেবল পাত পাড়িত। সকল বাড়িতে যাইত না। কারণ অর্থ বা চাউল ভিক্ষা তাহার উপজীবিকা নয়।

ভগবানের কথাবার্ত্তা বড়ই মার্জ্জিত। গ্রামের প্রবীণ-ব্যক্তিরা তাহার সহিত কথা কহিয়া, তাহার অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তিগুলির পরিচয় পাইতেন। শ্যামা ও শ্যাম সঙ্গীতে তাহার বিশেষ অনুরাগ

ছিল। লোকে তাহা অতি আগ্রহের সহিত শুনিত। কেননা তাহার সঙ্গীত সংগ্রহ প্রশংসার যোগ্য। রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, প্রভৃতি সাধকগণের ও বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের মধুর পদাবলীও তাহার কণ্ঠস্থ ছিল।

এক এক সময়ে সে এমন স্থির ও শান্তভাবে কথাবার্ত্তা কহিত, যে তাহা হইতে কেহই বুঝিতে পারিত না, যে সে পাগল। আবার এক এক সময়ে সে আবোল তাবোল বকিত।

আর কথন কথনও সে গ্রামস্থ নির্জ্জন বটবৃক্ষতলে বসিয়া এক মনে কি ভাবিত। গ্রামের মধ্যে একটী কালীবাড়ী ছিল। গ্রামের প্রধান ধনী কালীকিশোরের প্রতিষ্ঠিত, এক শ্যামসুন্দরের মন্দির ছিল। সে এই সব দেবমন্দিরে অনেক সময়ে রাত্রি অতিবাহিত করিত।

যাহা হউক, এই অদ্ভুত চরিত্র পাগলের পূর্ব্বপরিচয় লোকে না জানিলেও, সকলেই তাহাকে যথেষ্ট আদরযত্ন করিত, মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিত। ছেলেরা এরূপ একটা পাগল পাইলে তাহাকে খেপাইয়া তুলে। কিন্তু ভগবানকে দেখিলে, তাহারা তাহার চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইত। ভগবান তাহাদের কাহাকেও পয়সা দিত, কাহাকেও বা হরির লুটের বাতাসা দিত, কাহাকে বা আম পাড়িয়া দিত।

এ ভগবানের বা ভগা পাগলার সহিত, পাঠক পাঠিকার ভবিষ্যতে বহুবার সাক্ষাৎ হইবে।

(৬)

সেই দিন রমেশচন্দ্র নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া বুঝিলেন, যে কালীকিশোরের কাছে তাঁহাকে এই তিনশো টাকার জন্য হাত পাতিতেই হইবে। চেষ্টা করিলে, গ্রামান্তরে অন্য মহাজন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কালীকিশোর তাহা শুনিলে তাঁহার উপর আন্তরিক চটিয়া যাইবে, হয়তো ডিক্রীজারী করিয়া বসিবে।

কিন্তু দিনের বেলা কালীকিশোরের কাছে যাওয়া ঠিক নয়। কারণ অনেক রকমের লোক তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে। কালীকিশোর, প্রতিদিন বেলা বারটা একটার সময় আহার করে। তারপর দুই তিন ঘণ্টা নিদ্রা দেয়। অপরাহ্ণে তিনটা চারিটার সময় একবার তাহার বৈঠকখানায় বসে। সে সময়ে খাতক মহাজনের ও অন্যান্য বাজেলোকের ভিড় বেশী। এ সময়ে এই ঋণপ্রস্তাব করিলে সকলেই জানিতে পারিবে। সুতরাং একটু রাত করিয়া যাওয়াই ঠিক!

কিন্তু এই কালীকিশোর,তাহার কশাইবৃত্তি এই তেজারতি কারবারে মায়া মমতা শূন্য হইলেও, তাহার কৃষ্ণভক্তি বড় প্রখর ছিল। তাহার ঠাকুরবাড়ীতে প্রতি বুধবারে হরিসংকীর্ত্তন হইত। আর স্বয়ং কালীকিশোর, তাহার নিজ প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর-বাড়ীতে, সাধারণ লোকের মত মাটীতে বসিয়া কীর্ত্তন শুনিত।

কালীকিশোর লোকটা অতি ভাগ্যবান। কেননা, সে অনেক টাকার মালিক। নগদ টাকা কত যে তাহার সিন্দুকে

আছে, তাহা কেহ সঠিক জানিতে পারে নাই। তবে লোকে আঁচা আঁচি করিত, লক্ষটাকার উপর তাহার সম্পত্তি।

কুসীদবৃত্তি সাহায্যে কালীকিশোর এই টাকা জমাইয়াছে। জনরব এই, তাহার পিতা যত্নকিশোর, তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী হুতমপুরের বাবুদের পাঁচ-আনির সদর-নায়েব ছিল। জনরব আরও একটা দুর্ণাম রটনা করিয়াছিল, যে সদর নায়েব যত্নকিশোরের সময়ে অনেকগুলা দেওয়ানী ফৌজদারী ঘটায়, যত্নকিশোর তাহাতে বেশ দুপয়সা উপায় করিয়াছিল।

জমিদার বাবুদের উচ্ছন্ন দিয়া, যত্নকিশোর এই গ্রামে আসিয়া বাস করে। তাহার পূর্ব্ব নিবাস পূর্ব্বদেশ। এজন্য সে "যত্নবাঙ্গাল" বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত ছিল।

এক বিঘা ভদ্রাসনের উপর একতালা বাড়ী করিয়া, যত্নকিশোর এই কালিকাপুর গ্রামে বসবাস আরম্ভ করে। লোকটা খুব মামলাবাজ ও মতলববাজ বলিয়া, অনেকে তাহাকে ভয় করিয়া চলিত।

ইহার পর প্রকাশ পায়, সে যত্ন বাঙ্গাল, পাঁচ আনির বাবুদের একখানি তালুক নিলাম করাইয়া তাহার বেনাম দখলীকার হইয়াছে। কালিকাপুর গ্রামে আসিয়া, যত্নকিশোর সে বেনামী খারিজ করিয়া, মুখোস খুলিয়া জমীদার রূপে পরিচিত হইল। যত্নকিশোর জীবনে কোন সৎকর্ম্ম করে নাই, তবে শ্যামসুন্দরের মন্দিরের পত্তনটা সে আরম্ভ করিয়া যায়। আর কালীকিশোর তাহার পরিসমাপ্তি করে।

কালীকিশোর পিতার উপযুক্ত পুত্র। তাহার কূটবুদ্ধি ও বদমায়েসী

চালের মধ্যে প্রবেশ করা বড়ই শক্ত কাজ। যদুকিশোর যাহা করিতে পারে নাই, কালীকিশোর তাহা করিল। গ্রামের বিধবা, নাবালক ও দায়যুক্ত অধমর্ণের অনেক জমীজমা সে কিনিয়া লইল। কালিকাপুরের অর্দ্ধেক জমাজমি তাহার স্বোপার্জ্জিত।

জমীদারীর আয় হইতে বার্ষিক তিন কি চারি হাজার টাকা মনুফা ছিল। কিন্তু এ আয় সামান্য হইলেও, সুবুদ্ধিমান বিষয়ী লোক কালীকিশোর হিসাব করিয়া চলিয়া, নগদ টাকাটা খুব বাড়াইয়া ছিল। সে উর্ণনাভের ন্যায় জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকিত। আর নাতান, ঋণদায়গ্রস্ত খাতক, কন্যাদায় ও পিতৃদায়যুক্ত মক্ষিকার দল, তাহার জালের মধ্যে একবার পড়িলে, তাহাদের উদ্ধারের আর কোন উপায়ই ছিল না।

কালীকিশোর ভয়ানক কৃপণ। তাহার হাত দিয়া জল গলিত না। কেহ কখনও তাহাকে গরীবদুঃখী ভিখারিকে একটী পয়সা দান করিতে দেখে নাই। সে কায়স্থ হইলেও, এ পর্য্যন্ত এমন কোন জাঁকালো ক্রিয়াকলাপ করে নাই, যে তাহার বাড়ীতে দুই তিনশত পাত পড়িয়াছে। আর কেহ কখনও তাহাকে সুদের একটী পয়সা ছাড়িতে দেখে নাই। যদি সুদ ছাড়িবার জন্য তাহাকে কেহ অনুরোধ করিত, তাহা হইলে কালীকিশোর বলিয়া উঠিত, "রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ! ওকথা বলিতে আছে কি! আসল না দাও, তাতেও রাজি, কিন্তু সুদ ছাড়িতে পারিব না।"

একখানি নেহাতি ধুতি ভিন্ন, সে বাড়ীতে কিছুই পরিত না। সমাজে তাহার গতিবিধি খুব কমই ছিল। "জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমাই

চৈত্রমাসের রাস" বলিয়া যে এ অঞ্চলে একটা প্রবচন আছে, তাহা কালীকিশোরের সম্বন্ধেই খুব খাটে। কারণ বৎসরান্তে তাহার ঠাকুর-বাড়ীতে একবার মাত্র চৈত্রমাসে রাসের অনুষ্ঠান হইত। তাহাও অতি সংক্ষেপে।

এই কালীকিশোরের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অন্নদাকিশোর। অন্নদার সহিত পাঠকের পরে পরিচয় হইবে। তবে পাঠক এই টুকু জানিয়া রাখুন, যে লেখা পড়া শিখাইতে গেলে, পাছে বেশী পয়সা খরচ হয়—কেননা, অন্নদা যে ধরণের ছেলে, তাহার ফেল হওয়ার সম্ভাবনাই আঠারো আনা—আর সে পয়সাটা জলে পড়ে, এই ভাবিয়া কালীকিশোর তাহাকে বেশী লেখা পড়া শেখায় নাই। এজন্য অন্নদার মাতা যখন স্বামীর কাছে অনুযোগ করিত, তখন কালী বলিত—"বি-এ, এম-এ, রাস্তায় গড়াগড়ি যাইতেছে। অন্নদাকে আমি কেবল সুদকষাটা শিখাইয়া যাইতে পারিলে, কার সাধ্য তাহার মোহাড়া নেয়!"

আমরা শুনিয়াছি, অন্নদাকিশোরের জন্য তাহার পিতা একজন প্রাইভেট্-টিচার রাখিয়াছিল। আর সেই সঙ্গে এ কথাও শুনিয়াছি, যে মাষ্টার মহাশয়কে অনেক সময়ে "ডবলডিউটী" করিতে হইত। অর্থাৎ তিনি বাজার সরকারের কাজও করিতেন।

তাঁহার সহিত মাসিক তনখাফুরণ হইয়াছিল, চারিটাকা আর খোরাক। কালীকিশোরের বাড়ীর খোরাকে, মাষ্টার মহাশয়ের শীঘ্র যে আমাশয় হইয়া পড়িল, তাহা বলা বাহুল্য। আর কর্ত্তার জমাখরচের খাতা গুপ্ত ভাবে দেখিয়া আমরাও এটুকু জানিয়াছি,

যে বারমাস চাকরীর মধ্যে, তাঁহার নামে দুই মাসের মাহিনা খালি খরচ লেখা আছে। ইহা হইতেই পাঠক বুঝিয়া লউন, অন্নদার বিদ্যার দৌড় কতদূর। এই অন্নদার সম্বন্ধে যখন পরে আমাদের অনেক কথা বলিতে হইবে, তখন এক্ষেত্রে বেশী বলিতে চাহি না।

মোটের উপর কালীকিশোর একজন জমিদার ও মহাজন। ব্যয়কুণ্ঠাই তাহার প্রধান গুণ। মৌখিক সহৃদয়তা ও শিষ্টতাই তাহার ব্যবসার প্রধান মোহিনীমন্ত্র। কেননা, যে একবার তাহার চত্বরে পড়িত, সে সম্পূর্ণরূপে তাহার শিষ্টতার প্রশংসা করিত।

আমাদের রমেশ, এহেন কালীকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। তাহার ফলাফল পরেই ব্যক্ত হইবে।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। পল্লীপথ অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। কেননা কৃষ্ণপক্ষ।

রমেশচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন—বৈঠক-খানাতেই কালীকিশোরের সাক্ষাৎ পাইবেন। কিন্তু তিনি শুনিলেন যে, কালীকিশোর সে দিন অর্থাৎ বুধবারে, দেবমন্দিরে বসিয়া সংকীর্ত্তন শুনিতেছেন। বামনদাস বাবাজীর কীর্ত্তন-গান, সে অঞ্চলে অনেকটা প্রসিদ্ধ ছিল। সে দিন এই বামনদাসের গানই হইতেছিল।

সেস্থানে গেলে, এই ভণ্ড কুসীদজীবীর সহিত কোনরূপ কাজের কথা হইবে না ভাবিয়া, রমেশচন্দ্র বৈঠকখানাতেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কালীকিশোরের জনৈক কর্ম্মচারী, ইহার নাম নবকিশোর রায়—রমেশচন্দ্রকে চিনিত ও তাঁহার মনিবের সহিত রমেশের

যে দেনাপাওনা আছে তাহাও সে জানিত। উপরন্তু সে রমেশকে একটু শ্রদ্ধাভক্তিও করিত। কেননা এক সময়ে যখন রমেশচন্দ্রের সুখের দিন ছিল, তখন তাঁহার বাড়ীতে সে বহুবার নিমন্ত্রিত হইয়াছিল।

এজন্য তিনি রমেশচন্দ্র ও কালীকিশোরের মধ্যে যে একটা মন কসাকসি যাইতেছে—তৎসম্বন্ধে সমস্ত কথাই জানিতেন। টাকার জন্য, মধ্যে মধ্যে যে জোর তাগাদা চলিতেছিল, এ কথাটাও তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি ভাবিলেন, রমেশচন্দ্র হয়ত এই সব ব্যাপারের মীমাংসার জন্য, এই রাত্রে আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি যথেষ্ট খাতির করিয়া, রমেশচন্দ্রকে বৈঠকখানায় বসাইয়া চাকরকে তামাকু দিতে বলিয়া, নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

একটী ছিলিম তামাকু ভস্মসাৎ করিয়া, রমেশচন্দ্র সেই বৈঠকখানায় বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে কালীকিশোর সেই স্থানে দেখা দিল এবং রমেশচন্দ্রকে সেই রাত্রে তাহার বৈঠকখানার মধ্যে দেখিয়া, একটু বিস্মিতভাবে বলিল—"কি ভাগ্য! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম— রমেশবাবু! তাই আপনার দেখা পেলুম!"

হরিনামের কুঁড়োজালিটী তিনবার কপালে স্পর্শ করিয়া, "রাধেকৃষ্ণ" শব্দটী তিনবার উচ্চারণ করিয়া, কালীকিশোর পাটাতনের উপর আসিয়া বসিল। দেয়ালের গায়ে একটী হুক্ ছিল, কুঁড়োজালিটী তাহাতে টাঙ্গাইয়া রাখিবামাত্রই, জানালার আড়াল হইতে একটা টিক্‌টিকি, টিক্-টিক্ করিয়া উঠিল। আর ভণ্ডধার্ম্মিক কালী-

কিশোর সেই তালে তুড়ি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—“সত্য—সত্য—সত্য।”

তারপর—তিনি চাকরকে তামাকু আনিতে বলিয়া—সহাস্য-মুখে রমেশচন্দ্রকে বলিলেন—“ভাল, রমেশবাবু! সহসা এ রাত্রে কি মনে করে ভাই।”

এই কালীকিশোর সম্বন্ধে রমেশের ইদানীং একটা বিকৃত ধারণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই কপট শিষ্টতামূলক সম্বোধনে, তিনি অনেকটা সাহস পাইলেন। হায়! ভ্রান্ত রমেশচন্দ্র!

চাকর তামাকু দিয়া গেল। কালীকিশোর হুঁকাটী হাতে লইয়া রমেশের সম্মুখে ধরিয়া বলিল—“তামাক ইচ্ছা করুন রমেশবাবু!”

রমেশ বিনয়ের সহিত বলিলেন—“তা কি হয়! মশাই আগে খান।”

কালীকিশোর অগত্যা হুঁকাটী হাতে লইয়া বলিল—“কতক্ষণ এসেছেন?”

“প্রায় আধঘণ্টার উপর হোল।”

“বটে! তাই তো, অনেকক্ষণ বসে থাকৃতে হয়েছে ত? তা আমায় একটু খবর দিলেই ত হতো।”

“আপনি সংকীর্ত্তন শুনছিলেন। সেখানে বিষয় কর্ম্মের ব্যাপার নিয়ে, আপনাকে ত্যক্ত করা উচিত নয়—তাই কোন সংবাদ দিই নি।”

তামাকুর ধুঁয়া ছাড়িয়া, কালীকিশোর সহাস্যমুখে বলিল—"আর বলেন কেন রমেশবাবু! দিনরাতই বিষয় বিষে জ্বলে মরছি। ইহকাল ত সংসারের দাসত্বে গেল। এখন একটু পরকালের ভাবনাতো ভাবতে হবে। এই যে, কামিনী-কাঞ্চন আর মায়াময় কায়া, এসব ত ছায়ার কাণ্ড!"

রমেশচন্দ্র, ভণ্ড কালীকিশোরের এই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ কথায়, মনে মনে হাসিলেন। আর তাহার কথার সমর্থন করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন—"সেটা ত ঠিক কিশোরবাবু! আপনি ধার্ম্মিক, পরোপকারী। ভগবান যখন মহাপাষণ্ডদের দয়া করেন, তখন আপনাকে যে করবেন না তার আর আশ্চর্য্য কি?"

কালীকিশোর রমেশচন্দ্রের এই শ্রুতিরুচিকর কথায়, একটু তৃপ্ত হইয়া বলিল—"তা এত রাত্রে কি মনে করে ভাই!"

রমেশ। আমি আপনার কাছে বড়ই লজ্জিত। সাবেক টাকাটা—

কালীকিশোর। শোধ কর্ত্তে একটুকু বেশী দেরী হয়ে গেছে এই তো। তা হোক্ গে। এখন এসব ব্যাপারে আমার নিজের কোন হাত নেই। অন্নদাই সব করে। তারা একালের ছেলে, বোধ হয় সেই আপনাকে এজন্য তাগাদা করে থাকবে।

রমেশ। তা দেনাপাওনা থাকলেই তাগাদা কর্ত্তে হয়। এখন কথা হচ্ছে কি—

কালী। কিছু সুদ ছাড়তে হবে, এই তো। তা আপনি যখন নিজে টাকাটা বয়ে নিয়ে এসেছেন, তখন আপনার খাতিরে কিছু কর্ত্তে হবে বই কি।

রমেশচন্দ্র কম্পিত হৃদয়ে বলিলেন—"আজ্ঞে—সে টাকা এখন শোধ কর্ত্তে পারবো না। আমি এসেছি অন্য প্রয়োজনে।"

কালীকিশোর মনে ভাবিয়াছিল, রমেশচন্দ্র গায় সুদ চার হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ তাহার জমী ও বাস্তু বন্ধকী ঋণের সমস্ত টাকাটা লইয়া, তাঁহার বৈঠকখানায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। এই জন্য আশার সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, সে রমেশের সহিত খুব সৌজন্যতা দেখাইতেছিল। কিন্তু যখন বুঝিল, যে রমেশচন্দ্র ঋণশোধ করিতে আসেন নাই, এবং অপর প্রয়োজনে আসিয়াছেন, তখন সে একটু দমিয়া গেল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া বলিল—"রাত অনেক হয়েছে—রমেশবাবু! আপনার কথাটা কি সাফ্ বলে ফেলুন।"

রমেশচন্দ্র, কালীকিশোরের এ ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। একটু থতমত খাইয়া বলিলেন—"কালীকিশোর বাবু! আমি আর তিনশো টাকা ঋণ চাই!"

কালীকিশোর। এর উপর আবার তিনশো! কেন, সহসা টাকার দরকার হলো কেন? আবার কি পূজো আশ্রয় করবেন নাকি?

এটা বিদ্রূপ! শিষ্টতার আবরণে রহস্যের একটা তীক্ষ্ণবাণ। কথাটা গিয়া তীব্রবেগে রমেশের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কিন্তু তখন তিনি ঘটনার দাস। তাঁহার টাকা চাই। এজন্য সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"যদি ভগবান কৃপা করেন, তা হ'লে পূজা আশ্রয় আবার কর্‌বো বই কি? কিন্তু এখন এসেছি, কন্যাদায়গ্রস্ত

হয়ে। মেয়ের বের একটী পাত্র স্থির হয়েছে। আর আজকাল দিনের ফর্দ্দাফর্দ্দির তুলনায়, খুব সুবিধাতেই হয়ে গেছে।”

কালীকিশোর। কতটাকায় শেষ হলো?

রমেশ। আট্‌শো টাকা।

কালী। রমেশবাবু! শুনেছি, আপনার মেয়েত খুব সুন্দরী তবুও এত টাকা দিতে হল?

রমেশ। এ আর আজকালকার বাজারের তুলনায় বেশীই বা কি? আমি এজন্য অনেক ঘুরেছি। আড়াই হাজার, তিন হাজারের কমে, কেউ কথা কয় না।

কালী। সব ঠিক্‌ঠাক্‌ হয়ে গেছে?

রমেশ। আজ্ঞে হাঁ। আর পনর দিন বাদে বিয়ে।

কালী। কত টাকা আপনি চান?

রমেশ। মোটে তিনশো

কালী। বাকী পাঁচশো কোথায় পাবেন?

রমেশ। পরিবারের কিছু গয়না আছে। সে গুলো মেয়েকে দিলেই চলবে।

কূটবুদ্ধি কালীকিশোর, মনে মনে কি ভাবিতে লাগিল। কলিকার তামাকু পুড়িয়া পুড়িয়া, বহুক্ষণ ছাই হইয়া গিয়াছিল। এ জন্য টানের সঙ্গে তাহাতে ধোঁয়া বাহির হইতে ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিবার পর, কালীকিশোর বলিল “পাত্র কোথাকার?”

“মহেশপুরের?”

"কার ছেলে ?"

"লক্ষ্মীকান্ত ঘোষের।"

"ওঃ ! সেই লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ, যে কলকেতায় ট্রাম চাপা পড়ে, হাঁসপাতালে মরে।"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তা কি দেখে, এই টাকাটা খরচ করে মেয়েটা সেখানে দিচ্ছেন ? এ যে জলে ফেলে দোয়া হচ্ছে ! এই ভদোর খপ্পরে না আসেন এমন লোক ত এ চত্বরে নেই। জানেন ত মহেশপুরে আমার কিছু জমীজমা আছে। এখনও যে এই লক্ষ্মীঘোষের ভিটে আমার কাছে বাঁধা।"

"বলেন কি ?"

"আর বলি কি ? যা সত্য—তাই বলছি রমেশবাবু। আমার কথা শুনে আশ্চর্য্য হবেন না। তমসুক দেখ্‌তে চান ?"

কালীকিশোর হুঁকাটি জানালায় রাখিয়া, তখনই কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে, সেই কক্ষে আসিয়া বলিল "এই দেখুন।"

রমেশচন্দ্র সেই রেজিষ্টারি করা দলিলখানি দেখিয়া বুঝিলেন, কালীকিশোর মিথ্যা কথা বলে নাই। কিন্তু তাহাহইলেও, এই পাত্রে কন্যা দান করিতে তিনি অনিচ্ছুক নহেন। পাত্রের পিতার যে কিছুই নাই, তিনি তাহা পূর্ব্বেও শুনিয়াছিলেন। তিনি বরাবর একশত টাকার চাকরী করিয়া আসিয়াছেন, একটা নামজাদা অফিসের বড়বাবু ছিলেন। দুই একজন বন্ধুর সঙ্গে তাঁহার তখনও একটা প্রীতির বন্ধন ছিল। সে বন্ধুরা ইচ্ছা করিলেই, তাঁহার

জামাতার একটা ভাল চাকরি করিয়া দিতে পারেন। এ সম্বন্ধে তিনি তাহাদের একজনের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিয়াও অনুকূল উত্তর পাইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি বলিলেন—"চৌধুরী মহাশয়! ছেলের স্বভাব চরিত্র দেখিয়াই মেয়েটাকে দিতেছি। তার যে কিছুই নাই, তা আমি জানি। যাই হোক্, আপনি আমাকে এ প্রয়োজনের সময়, তিনশত টাকা দিয়া সাহায্য করিতে পারেন কিনা, সেটা আমি জানিতে চাই।"

কালীকিশোর কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"রমেশবাবু! আমি আপনার কন্যাদায় উদ্ধারের সহায়তা করিব।"

রমেশ। আপনি অতি মহাত্মা লোক!

কালী। না—ওসব বড় বড় বিশেষণের যোগ্য আমি নই। আজ কাল পথে ঘাটে মহাত্মা দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মনের মতলব এই, যে আমি আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চাই!

রমেশ কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"সে কি রকম?"

কালী। আমিও একটি খুব সুন্দরী মেয়ে খুঁজিতেছিলাম। শুনিয়াছি, আপনার মেয়েটী পরমা সুন্দরী। আমি তাহাকে পুত্রবধূ করিতে চাই।

যদি সেই ঘরটা তখনই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিত, বা একটা কাল-কেউটে রমেশের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িত, তাহাহইলেও তিনি অতটা বিস্মিত হইতেন না।

রমেশ ঘামিতে লাগিলেন। একটা ভয়ানক উত্তেজনা, তাঁহার

হৃৎপিণ্ডকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তিনি একটু সামলাইয়া লইয়া বলিলেন,—"আপনাদের সহিত আমাদের এক থাক নয়। আপনি পূর্ব্ব বঙ্গের লোক। এস্থলে এরূপ বিবাহপ্রস্তাব অসঙ্গত।"

কালীকিশোর বলিল—"আমিই এই অসঙ্গতকে সঙ্গত করিব। গ্রামের লোকগুলি লইয়াই ত সমাজ। কিন্তু এই গ্রামে ও এর আশে পাশে এমন কোন বর্দ্ধিষ্ণু লোক নাই, যে আমার কাছে টাকা ধার না করিয়াছে। আর কৌলিক-পর্য্যায়ের কথায় বলিতেছেন। তাহা আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না। আমরা বাঙ্গাল-কায়েত। আমাদের জেদ্ অতি মাত্রায় ভয়ানক। বেশী তকরারে কাজ নাই রমেশবাবু। আমার ঐ একমাত্র ছেলে অন্নদা। অন্নদার বৌ হইলে, আপনার মেয়ে রাজরাণী হইবে।"

রমেশচন্দ্র এবার দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না তাহা হইতে পারে না। আপনি টাকার জোরে, টাকার দর্পে, সমাজকে উপেক্ষা করিতে পারেন। গরীব লোক আমি—তাহা পারিব না। তাহা ছাড়া আপনার ছেলেটী—"

রমেশচন্দ্র কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু পারিলেন না। কথাটা যেন জিহ্বার কাছে আসিয়া আট্‌কাইয়া গেল!

কালীকিশোর ছাড়িবার পাত্র নয়। সে বলিল—"রমেশ বাবু! কি বলিতেছিলেন? আমার ছেলে লেখা পড়া শেখে নাই এই ত! লেখাপড়া শেখার দরকার কি তার! সুদের হিসাব করিতে পারিলে তার ভাবনা কি? এই ত সব বিএ, এমে, চাকরীর জন্যে চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে।"

রমেশ। তা নয়—আপনার ছেলের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলে।

কালী। বলে বটে, কিন্তু কারুর এত বড় বুকের পাটা হয় না যে আমার সুমুখে এক কথা বল্‌তে পারে। তা যার বাপের জমীদারী আছে, তার ছেলে যদি দুই একটা দুষ্টামির কাজ করে তাতে বেশী কিছু আসে যায় না। তবে যারা এ অপবাদ রটনা করে, তারা আমার শত্রু বই আর কিছুই নয়। আর দুনিয়ায় কেমন একটা মজা দেখতে পাই, যার উপকার করি, সেই শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। লোকগুলো দায়দড়ার সময় আমার কাছে এসে, জোড় হাত করে টাকা নেয়। আর সেই টাকাটা আদায় কর্ত্তে গেলেই তাঁদের সে জোড় হাতটা খুলে গিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হয়। যাই হোক ও সব বাজে আপত্তি আমি শুন্‌তে চাইনি। আপনার কন্যাকে আমি পুত্রবধূ কর্ত্তে ইচ্ছুক। এতে ত আপনার জাত যাবে না, তবে বঙ্গজকায়স্থের সঙ্গে করণকারণ কল্লেন বলে, পূর্ব্বের একটা চলিত নিয়মের অন্যথা করা হবে। তার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধই নেই। এই যে আজকাল কল্‌কেতার অনেক কায়েতে পইতে নিচ্ছে। কলকেতার কথা ছেড়ে দিই। এই পাড়াগেঁয়ের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম সমূহেও কায়েতে ক্ষত্রিয় হয়ে উঠ্‌ছে। আপনার ভালর জন্যই বল্‌ছি। কথায় বলে "দায়মুদ্দোয়াজি কি করবে কাজি।" আপনি আর আমি রাজি হলে, কারও সাধ্য নেই, এতে একটা কথা বল্‌তে পারে।

রমেশচন্দ্র বিপদগ্রস্ত হইয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া, ঋণ করিতে

আসিয়াছিলেন। এখন দেখিলেন, আর এক নূতন বিপদ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত।

এই কালীকিশোরের একমাত্র পুত্র অন্নদাকিশোরকে তিনি খুব ভালরূপই জানিতেন। এক পল্লী না হয় নাই হইল, এক গ্রামে ত তাঁহাদের বাস। অন্নদাকিশোর মদ্যপায়ী, থিয়েটারের আকড়াধারী। তার পর তাহার নামে আরও একটা দোষের কথা শুনা যাইত। যৌবনের প্রারম্ভেই যাহার এইরূপ রুচি ও মতিগতি, তাহার ত আরও দিন কাল আছে।

এ সম্বন্ধে স্থির মীমাংসা করিতে রমেশচন্দ্রের বেশী দেরী হইল না। এরূপ চরিত্রহীন ধনীসন্তানের হস্তে, কন্যা সমর্পণ করিয়া তাহাকে জন্মের মত জলে ফেলিয়া দেওয়াও তিনি ঠিক কাজ বিবেচনা করিলেন না। রমেশচন্দ্র চিরদিনই দৃঢ়চেতা। তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর বলিলেন—"কালীকিশোর বাবু! আমায় মার্জ্জনা করিবেন। আপনার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে আমি একেবারে অনিচ্ছুক।"

কালীকিশোর ভীষণ ভ্রুকুটিভঙ্গী করিয়া, রমেশের মুখের দিকে চাহিল। তৎপরে বলিল—"রমেশবাবু! এখন যে প্রত্যাখ্যানটা অত সহজ বলিয়া ভাবিতেছ, ভবিষ্যতে সেটা অতি বাঁকা হইয়া দাঁড়াইবে।"

রমেশ। তা আপনি যদি দেনার জন্য নালিশ করেন; আর তাহাতে আমাকে পথের ভিখারী হইতে হয়, তাহাও স্বীকার!

কালীকিশোর রাগতভাবে বলিল—"বেশ তাহাই হইবে। এর পরে

আমাকে দোষ দিও না। একবার মনে ভাবিয়া দেখ রমেশবাবু! তুমিও আমার খাতক। আর যে তোমার জামাই হইবে; সেও তাই। যদি একদিনেই দুই জনের নামে আদালত হইতে ক্রোকী পরোয়ানা বাহির করি, তাহাহইলে তোমার মেয়ের বিবাহটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে বল দেখি?”

এতক্ষণের পর রমেশচন্দ্রের চেতনা হইল। তিনি প্রথমে মনে ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার একার উপর দিয়াই ঝড়টা বহিয়া যাইবে! আর সে ঝড়ের বেগ সহ্য করিতে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যে কোন উপায়ে হোক, তাঁহার স্নেহের যত্নের আদরের একমাত্র কন্যাকে সুপাত্রস্থ করিয়া, তার পর যদি তাঁহাকে গাছতলায় দাঁড়াইতে হয়, তাহাতেও তিনি সম্মত।

কিন্তু এই বিষয়টা অন্য দিক দিয়া ভাবিয়া রমেশচন্দ্র দেখিলেন,— “যদি এই কালীকিশোর তাঁহার ভাবী বেহানীর সম্পত্তি-ক্রোকের পরোয়ানা, বিবাহের আগে বাহির করিতে পারে, আর তাঁহাকে ভিটাচ্যুত করিবার ভয় দেখায়, তাহা হইলে সেই বৃদ্ধা ভয় পাইয়া তখনই এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।”

রমেশচন্দ্র এ পর্য্যন্ত তেজের সহিত চলিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু এইবার তাঁহার সেই তেজ দমিয়া পড়িল। তিনি কালীকিশোরের হাত দুখানি ধরিয়া বলিলেন—“কালী বাবু! আপনি ধনী। ধার্ম্মিক বলিয়াও একটা সুনাম আপনার আছে। কন্যাদায়ের চেয়ে মহাদায় আর লোকের নাই। আমার জাতকুল নষ্ট হইবে—সমাজে আমার মান ডুবিবে একাজ আপনি সত্যসত্যই করিবেন কি?”

কালীকিশোর দেখিল, যে শক্ত বাঁশ একটু নুইয়া আসিয়াছে। সুতরাং সে যো পাইয়া বলিল—"বিষয় কর্ম্ম করিতে গেলে, ধর্ম্মের দিকে একটু নেক্‌নজর করিতে হয়। বিষয় কর্ম্মের পদ্ধতি, আর ধর্ম্মাচরণ পদ্ধতি, দুইটা আলাদা জিনিস। কেন ছেলেমানুষী করিতেছ রমেশবাবু! ইচ্ছা করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিও না। আমার পুত্র অন্নদাকিশোরের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দাও। জাত্যংশে আমি ত তোমার ছোট নই ভাই। তবে থাক্‌টা আলাদা। তা আজ কালকার বাজারে এ সব লোকে খুব কমই দেখে! একটা কথা তোমায় সাফ্ বলে রাখি রমেশবাবু—আমার বেই হলে, কার সাধ্য তোমায় একটা কথা বল্‌তে সাহস করবে! যদি করে, তার মুখ বন্ধ করবার উপায়ও আমি জানি।"

রমেশচন্দ্র দেখিলেন—তিনি এক তুলসীতলার বাঘের পাল্লায় পড়িয়াছেন। বনের বাঘেরও বরঞ্চ একটু মায়া দয়া থাকিতে পারে। এর সে সব কিছুই নাই। দিন রাত হরিনামের ছাপ কাটিয়া, কুঁড়োজালির মধ্যে জপের মালা ফিরাইলেও, ইহার মনে ষড়রিপুর পূর্ণ আবির্ভাব। এখন কৌশল করিয়া ত এখান হইতে সরিয়া পড়া যাক্। তারপর যা হবার তাই হবে।"

রমেশচন্দ্রকে চিন্তানিমগ্ন দেখিয়া, কালীকিশোর সহাস্যমুখে বলিল—"কেমন এতক্ষণ পরে ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছ তো।"

রমেশ। আজ্ঞে হাঁ।

কালী। তাহ'লে কি কর্ত্তে চাও?

রমেশ। বাড়ীতে ফিরে গিয়ে, সকল দিক দিয়ে বিচার করে

এই বিষয়টা আমাকে একবার ভাব্‌তে দিন। আমি তিন দিন পরে আবার আপনার কাছে আস্‌বো।

কালী। বলি, এর ভিতর কোনও চালাকির মতলব নেই তো?

রমেশ। আমি যখন ষোল-আনা ভাবেই আপনার হাতের ভিতর গিয়ে পড়েছি, তখন চালাকি কল্লেই বা আমার পরিত্রাণের উপায় কই?

কালীকিশোর রমেশের একথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—তা হলে আজ থেকে তিন দিন পরে। আজ হলো সোম। অর্থাৎ বুধবারের রাত্রে আবার তোমার সঙ্গে এই বৈঠকখানায় সাক্ষাৎ হবে। কেমন ঠিকতো?

ঘটনার দাস রমেশচন্দ্র, সুবিদ্বান রমেশচন্দ্র, একটা বড় আপিসের এক সময়ের বড়বাবু রমেশচন্দ্র, এই অশিক্ষিত, নিষ্ঠুর কাণ্ডজ্ঞানহীন, বর্ব্বরের ছলনাচক্রজালে পড়িয়া, যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এ জন্য তিনি তখনিই সপ্রতিভ-ভাবে উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে! সে কথা আর বল্‌তে। বুধবার ঠিক এই সময়েই আবার আমরা দুজনে একত্রিত হবো।"

কালীকিশোর রমেশের এই কথায়, কোনরূপ কপটতার গন্ধ না পাইয়া বলিল—"এই ত ভদ্রলোকের কথা! ওরে হরে! আমাদের রমেশবাবুকে এক ছিলিম তামাক চট্ করে দিয়ে যা।"

রমেশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আর তামাক খাবো না। রাত এগারোটা বেজে গেছে।" তারপর তিনি ধীরে ধীরে সেই বাটীর বাহির হইয়া গেলেন।

আর ঠিক এই সময়ে, আর একটা লোক, অন্ধকারে মিশাইয়া তাঁহার পশ্চাদানুসরণ করিল। রমেশচন্দ্র, তাহা টেরই পাইলেন না।

এক সসেমিরে অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, রমেশচন্দ্র ধীরে ধীরে পথ চলিতেছেন। তিনি জানিতে পারেন নাই, যে একজন গুপ্ত ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল।

রমেশচন্দ্র বড়ই তেজস্বী পুরুষ। এই তেজের জন্যই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। রমেশচন্দ্রের মাতুল একজন খুব ধনী লোক। কিন্তু নানা কারণে রমেশচন্দ্রের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ বন্ধ হইয়াছিল। সে বহু দিনের কথা। আর তার মধ্যে অনেক ব্যাপার জড়ানো ছিল। সে কথা প্রকাশ করিবার সময় এখনও হয় নাই। হইলেই আপনারা জানিতে পারিবেন।

রমেশচন্দ্র ভাবিতেছেন, "এমন একদিন আমার ছিল, যেদিন পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার হাত দিয়া দুই শত টাকা চলিয়া গিয়াছে। আর আজ আমি এই সামান্য টাকার জন্য, একজন পিশাচাধম লোকের কাছে অপমানিত হইয়া আসিলাম।"

"তবে কি আমি এই টাকার অভাবে, আমি আমার স্নেহ পালিতা আদরিণী কন্যাকে, এক লম্পট বদমায়েসের সঙ্গে বিবাহ দিব? না—না—তাহা হইতেই পারে না। আমার মেয়ে এ ঘটনায় দুখানা সোনাদানা পরিবে বটে, দাসীচাকরে তার হুকুম খাটিবে বটে, দোতালার ঘরে সে শুইবে বটে, কিন্তু তাহার স্ত্রীজীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ, জন্মের মত নষ্ট হইবে। অন্নদার এখন যেমন

মতিগতি দাঁড়াইয়াছে, তাহা হইতেই তাহার অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ অতি স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। এই দুশ্চরিত্র ধনীসন্তানের হাতে, আমার স্নেহময়ী স্বর্ণ-প্রতিমাকে দিলে, সে চিরজন্মের মত অসুখী হইবে। না—না, তার চেয়ে মেয়েটার গলায় পাথর বাঁধিয়া, জলে ফেলিয়া দেওয়া, বা হত্যা করাই উচিত।”

“আমার যখন সুদিন ছিল, তখন যাহার কাছে যত টাকার জন্য হাত পাতিয়াছি, তাহাই পাইয়াছি। আর এই দুর্দ্দিনে জমীজারাত বাঁধা রাখিয়াও টাকা পাইতেছি না। একেই বলে ভাগ্য পরিবর্ত্তন।”

“তবে কি এই বিপদের সময় মাতুলের দ্বারস্থ হইব? না—না, সেটা ঠিক নয়! আত্মীয়স্বজনের উপেক্ষার চেয়ে, পরের উপেক্ষায় মনোকষ্ট অনেক অল্প। এত দিনের পর তাঁহার দ্বারস্থ হইলে, তিনি হয়তো ঘৃণায় মুখ ফিরাইবেন। তাহাহইলে আমিও ঘৃণায় লজ্জায় মরিয়া যাইব। তবে এ বিপত্তি উদ্ধারের উপায় কই?” রমেশচন্দ্র একবার সেই তারকাখচিত আকাশের দিকে চাহিলেন। মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন “উপায় ঐ ভগবান!”

এমন সময়ে কে যেন পিছন হইতে বলিল—“সত্যই তাই রমেশবাবু!”

যে এই কথা বলিল, সে অন্ধকার ভেদ করিয়া রমেশের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রমেশচন্দ্র সে মূর্ত্তি চিনিলেন। সে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ভগবান!

রমেশ বিস্মিতভাবে বলিলেন—"এতরাত্রে তুমি কোথা হইতে আসিলে ভগবান!"

"ভগবানের আবার রাত্রি দিন কি? সমস্ত দিনরাত জাগিয়া থাকিয়াই ত তাঁহাকে এই দুনিয়ার লোকের কাণ্ড কারখানা দেখিতে হয়।"

"সেটা ঠিক। কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে?"

"আপনি যেখানে ছিলেন!"

"কালীকিশোরের বাড়ীতে?"

"আজ্ঞে তাই বই কি! ব্যাটা বড় ধার্ম্মিক, রোজ সন্ধ্যার পর হরিনাম শোনে, তা জানেন ত? কিন্তু কাণবন্ধ করে হরিনাম শোনায় যে কোন ফল নেই, আজ তা বুঝলুম!"

"কেন?"

"জানেন ত—হরিনামে মনের ময়লা কাটে। এর দেখ্ছি হারনামের ফলে, মনের ময়লা বাড়্তেই চলেছে।"

"তুমি আমাদের সবকথা শুনেছ?"

"শুনেছি বই কি?"

"বড় বিপদে আমি পড়েছি ভগবান! উপায় কি বল দেখি?

"উপায় সেই অনাথের নাথ, ভগবান!"

"কিন্তু আমি মহাপাপী।"

"রাম! রাম! ও কথা বল্তে আছে বড়বাবু! কেবল দুর্গোৎসবটাই বাকি রেখেছেন! তারপর আর না করেছেন কি? তবু যদি আপনি আপনাকে পাপী মনে করেন, তাহলে দেখ্ছি

ঐ চামার কালীকিশোরটা মহা পুণ্যবান! কেননা, ব্রহ্মস্বহরণ, বিধবার সর্ব্বনাশ, নাবালককে ফাঁকি, মানীকে অপমান, সবই ও কর্চ্ছে! আপনার জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা পূজার চেয়েও এতে ওর বেশী ফল হবে। কেন না কলিতে সবই উল্টো হয়।"

রমেশচন্দ্র ভগবানের কথাগুলি তন্ময়চিত্তে শুনিতেছিলেন। সহসা মৌনভঙ্গ করিয়া বলিলেন—"ভগবান! সত্যই কি তুমি পাগল?"

ভগবান হাসিয়া বলিল—"সকলের মুখে মুখে যে কথাটা রটে, সেইটেই প্রায় সত্য হয়। সবাই আমায় পাগল বলে, কাজেই আমি তাই। আর তাতে আমার একটুও কষ্ট হয় না। কেন না, আমার ভগবানের এই সংসারে আমি দেখ্‌ছি, চারিদিকে অনেক পাগল আছে। কেউ রূপের জন্য পাগল, কেউ রূপেয়ার জন্য পাগল। যাক্‌—ওসব কথা। এখন ঠিক কল্লেন কি!'

রমেশচন্দ্র একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"ঠিক কিছুই করি নি। যে বিশ বাঁও জলে ডুবছে, তার উপরে ভাসবার কোন উপায় নেই।"

ভগবান। আবার ঐ কথা! এই না বল্লেন, ভগবান উদ্ধার কর্ত্তা!

ঠিক এই সময়ে, কথায় কথায় দুজনে রমেশের বাড়ীর দরোজার কাছে আসিয়া উপস্থিত। রমেশ বলিলেন—"তবে এস ভগবান! তোমার সঙ্গে আজ রাত্‌টা কাটানো যাক্‌। আমি তোমায় বড় পছন্দ করি।"

"সেটা আপনার অনুগ্রহ।" এইকথা বলিয়া ভগবান রমেশচন্দ্রের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। রমেশচন্দ্র দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, ভগবানকে লইয়া বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

(৭)

রমেশ মুখে হাতে জল দিয়া, গামছা দিয়া বেশ করিয়া গাটী মুছিলেন। তারপর ভগবানকে বলিলেন—ঐ বাল্‌তীতে জল আছে। তুমিও মুখহাত ধুইয়া লও। কিছু আহার করিতে হইবে!"

ভগবান জোড় করে বলিল—"না হুজুর! ঐটে মাপ্‌ কর্ব্বেন। হাত পা মুখ ধুতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আহারের দফা আজ একেবারে বন্ধ।"

রমেশ। কেন?

ভগবান। আজ দুপুর বেলা আপনার বাড়ীতে অত্যন্ত আহার হয়েছে। তারপর অপরাহ্নে একবার গৌরদাস বাবাজীর আথড়ায় গিয়েছিলুম। বাবাজী আমায় বড় স্নেহ করেন। সেখানে খানদুই মালপো খেয়ে, খিদে একেবারে মরে গেছে।

রমেশ। রাত-উপোসী কি থাক্‌তে আছে?

রমেশচন্দ্র পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া, যখন ভগবানকে জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করাইতে রাজী করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অগত্যা বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ভগবান, তামাকু সাজিল। নিজে দুই এক টান খাইয়া কলিকা রাখিয়া দিল। তারপর আঙ্গুলের তুড়ী দিয়া বলিল—"ঠাকুর! তুমি নিজে যা করলে, এই দুনিয়াটাকে তেমনি করে সৃষ্টি করেছ! যাক্

তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ প্রভু! তবে দুনিয়াটা সোজা করে সৃষ্টি কল্লে তোমার এত ঝক্কি সামলাতে হতো না! হরিবোল! হরিবোল!"

এই সময়ে রমেশচন্দ্র বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, ভগবান কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহার জন্য একটী তাওয়া সাঁজিয়া রাখিয়াছে, আর নিজের জন্য একটী সুলফা সাজিয়াছে।

রমেশচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন—"তামাক খেলে না!"

ভগবান। খেয়েছি! আপনি বসুন—তামাকু খান!

রমেশচন্দ্র বিছানার উপর বসিলেন। ভগবান তাঁহার পার্শে বসিল। ভগবান বলিল—"বড়বাবু! মনে ঠাওরাচ্ছেন কি বলুন দেখি?"

রমেশ। কিসের জন্য বল দেখি?

ভগবান। দিদিমণির বিয়ের জন্য! তা ছাড়া আর আপনার কিসের ভাবনা?

রমেশ। ঠাওরাচ্ছি অনেক। ভাব্ছি অনেক। কিন্তু কোন একটা স্থির মীমাংসায় আস্তে পাচ্ছিনি!

ভগবান। পাচ্ছিনি বল্লেতো হবে না। একটা হাঁ কি না, এস্পার কি ওস্পার, করে ফেল্তে হবে! আগে ঠিক্ করুন, কোথায় বিয়ে দেবেন? সেই গরীবের ছেলেকে, না এই আবাগের ব্যাটা ভুতের পোলার সঙ্গে।

রমেশ। আমার জীবন থাকতে আমি অন্নদার সঙ্গে বে দেব না।

ভগবান। ভাল কথা। তাহ'লে ত সব মিটে গেল।

রমেশ। মিট্‌লো কই ভগবান! তুমি ওখানে কতক্ষণ ছিলে বল দেখি?

ভগবান। আপনি যতক্ষণ ছিলেন!

রমেশ। কোথায় বসে ছিলে!

ভগবান। রামা চাকর ব্যাটার কাছে চুপ্‌ করে শুয়েছিলুম। যেন—ঘুমুচ্ছি।

রমেশ। তাহ'লে সব কথা শুনেছ?

ভগবান। শুনেছি বই কি! আর যা শুনেছি তার চেয়ে বেশী ভয়ানক যে কিছু হতে পারে, এমন ত বোধ হয় না। সাপ ও বাঘ শুনেছি, অনেক সময়ে মানুষকে ধরে ছেড়ে দেয়। কিন্তু এই কালীকিশোরের মত মানুষ তাদের চেয়েও ক্রূড়, তাদের চেয়েও ভয়ানক।

রমেশ। ভগবান! তাহলে করা যায় কি?

ভগবান। যদি আমার কথা শোনেন বড়বাবু! আর সেটাকে পাগলের কথা মনে করে হেসে উড়িয়ে না দেন, তাহলে কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করি।

রমেশ। বল। তুমি যা বলবে আমি তাই কোরবো।

ভগবান। তিনশো খানেক টাকার জন্য আপনার মেয়ের বিয়ের এই কাজটা আটকাচ্ছে ত?

রমেশ। হাঁ—

ভগবান। তিনশো কেন—চারশো টাকা আমি আপনাকে কাল এনে দোব।

রমেশচন্দ্র বলিলেন—"কালীকিশোর বাবু! আমায় মার্জ্জনা করিবেন।
আপনার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে
আমি একেবারে অনিচ্ছুক।"

এই পরোপকারী অদ্ভুত চরিত্র ভগবান, রমেশচন্দ্রকে কখনও 'বড়বাবু' কখনও 'হুজুর' সম্বোধন করিত। কখনও তুমি বলিত কখনও আপনি বলিত। রমেশচন্দ্র তাহার পরোপকার বৃত্তির অনেক পরিচয় ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, এই ভগবান মূর্খতার ভাণ করিলেও পরম পণ্ডিত—পাগলামির ভাণ করিলেও অতি স্থির, সংযতচিত্ত এবং সত্যবাদী। যাহার গুণগ্রাহিতা শক্তি আছে, সে ভগবানের এই এলোমেলো বকুনীর ভিতর হইতে, সার কথা সংগ্রহ করিতে পারে। আর ভগবানের প্রধান গুণ এই, সে কখনই কথার খেলাপ করে না।

অন্য কেহ হইলে, হয়তো ভগবানের এই চারশো টাকা যোগাড়ের কথাটা, হাসিয়া উড়াইয়া দিত। ভাবিত, এটা পাগলের—পাগলামি। কিন্তু ভগবান চরিত্রের সূক্ষ্ম রহস্যাভিজ্ঞ রমেশচন্দ্র তাহা ভাবিলেন না। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন—"ভগবান! টাকা না হয় তুমি যোগাড় করিয়া দিলে, কিন্তু আমি শোধ করিব কিরূপে?"

ভগবান। কালই যে আপনাকে শোধ করিতে হইবে, তাতো নয়। আমার করার এই, যত দিন আপনার পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া না আসিবে, সুদিন উপস্থিত না হইবে, তত দিন আমি টাকা লইব না।

রমেশ। হা! অদৃষ্ট! তাহারও যে কোন সম্ভাবনা নাই! শয়তানের মতলবটা শুনিয়াছ ত? সে আমার ও আমার ভাবি জামাতার মাতার অর্থাৎ উভয়েরই খাতক। দুজনের নামেই সে

নালিশ করিবে। আর বিবাহের দিনেই সে উভয় পক্ষের উপর ডিক্রীজারী করিয়া বিবাহ পণ্ড করিবে।

ভগবান। বড়বাবু! আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি ভাল রকম লেখা পড়া জানো। একটা বড় আপিসের বড়বাবু ছিলে তুমি; তাতে বিদ্যার খুব দরকার। এখন দেখিতেছি, সব ভূয়ো। মানুষের প্রধান দোষ এই, সে কেবল আমি আর আমিত্ব লইয়াই ফাঁপিয়া উঠে। ব্যক্তিগত সেই আমি আর আমিত্বকে যদি তাহারা ছোট করিয়া দিয়া, ভগবানের "আমিত্বটা'র" বিরাটভাবের দিকে আত্ম সমর্পণের চক্ষে দৃষ্টিপাত করে, তাহাহইলে তাহাদের একটুও কষ্ট পাইতে হয় না। যে ভগবান বিনাচেষ্টায় এই তিন চার শো টাকা আপনাকে যোগাড় করিয়া দিলেন, তাঁর অসাধ্য কি আছে? হয়ত তিনি সেই বিবাহের দিনে এমন কোন উপায়ে সাহায্য করিবেন, কিম্বা এই শয়তান কালীকিশোরের মনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন, যাহাতে সমস্ত ঘটনা উল্‌টাইয়া যাইবে। সেই সঙ্গে শয়তানের ঐ শয়তানী মতলবটাও ফাঁসিয়া যাইবে।"

রমেশচন্দ্রের প্রাণ, ভগবানের এই বহুমূল্য কথায় বড়ই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। রমেশ ভগবানের হাত দু'খানি ধরিয়া বলিলেন—"ভগবান! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই ঠিক। আমি আমিত্বে বিভোর হইয়া নিজের শক্তিতেই অধীর হইয়াছিলাম। আমি এটা করিব, সেটা আমার দ্বারা হইবে, আমার অসাধ্য কি আছে, এই রূপ একটা মদগর্ব্বের শক্তির অধীন হইয়া, আমার জীবন পথ অতিবাহিত করিয়া আসিতেছি। ভগবান! ভগবান!

আজ তুমি গুরুর কাজ করিলে। বন্ধুর কাজ করিলে। পিতার কাজ করিলে। অজ্ঞ অবোধ মোহাচ্ছন্ন আমি। আজ তুমি আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া দিলে।"

এই সময়ে রমেশচন্দ্রের দেয়ালের ঘড়িতে, রাত্রি দুইটা বাজিয়া গেল। রমেশ সচকিত ভাবে বলিলেন—"ওঃ এত রাত হয়েছে! ভগবান এসো আমরা শুয়ে পড়ি।"

ভগবান সহাস্যে বলিল—"আর একবার তামাক সাজ্‌বো?"

রমেশ, ভগবানের হাতখানি ধরিয়া বলিলেন—"না—বাবা! আর তোমায় কষ্ট কত্তে হবে না। দেখ্‌ আজ আমিও কিছু খেতে পারিনি। বাড়ীর ভিতরে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু দুই গ্রাস খেয়েই ইতি কর্ত্তে হয়েছে। একে এই সব কাণ্ড! তার উপর তুমি কিছু খেলে না। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।"

সেগুণ কাঠের দুইখানি পাটাতন, সেই কক্ষে পাতা। তাহার উপর এক খানি সতরঞ্চ বিছানো। সতরঞ্চের উপর একখানি লম্বা তোষক। আর দুই তিনটী বালিস।

রমেশ বলিল—"আমার কাছে এসে শোও।"

ভগবান সহাস্যে বলিল,—"আমি বড় আপ্‌সোহাগী লোক। কারোর কাছে পাশাপাশি শোওয়া, আমার কখনও অভ্যাস, নেই—বড় বাবু। আমি একপাশে বেশ আরামে থাকবো।"

রমেশ, ভগবানের স্বভাব জানিতেন। এজন্য তিনি তাহার কথায় কোন আপত্তি করিলেন না।

সেই সতরঞ্চের উপর লম্ববান হইয়া, ভগবান বলিল—"তা হলে ঐ চামার ব্যাটাকে একটা জবাব দেওয়া ত চাই।"

রমেশ। চাই বই কি? কিন্তু জবাব নিয়ে যায় কে?

ভগবান। সে জন্য ভাবনা নেই। আমিই হুজুরের বরকন্দাজ হবো। কিন্তু কি জবাব দেবেন?

রমেশ। জবাব দোবো—তোমার পুত্র অন্নদার সঙ্গে, কন্যার বিবাহ দিতে আমি নানা কারণে অনিচ্ছুক। আমায় মার্জ্জনা করো।

ভগবান। বেশ কথা। কাল সকালে আপনি চিঠিখানা লিখে আমায় দেবেন। আর তিন দিনের মাথায় যে দিন জবাব দেবার করার আছে, অর্থাৎ পরশু দিন আমি চিঠিখানা ওর ওখানে পৌঁছে দিয়ে, ওর মনোভাবটা জেনে, তার পর আপনার জন্য এই চারশো টাকার জোগাড়ে যাবো।"

রমেশ। বেশ কথা! নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।

এই সব কথাবার্ত্তার পর, রমেশ নীরব হইলেন। এই সময়ে নিদ্রা আসিয়া দুই জনের চোখেই মোহের অঞ্জন দিয়া গেল। রাত কাটিল। পরদিন প্রভাতে শয্যাতাগ করিয়া, রমেশচন্দ্র সর্ব্বাগ্রে কালীকিশোরের উদ্দেশে লিখিত পত্রখানি শেষ করিয়া, তাহা ভগবা কে পড়িয়া শুনাইলেন।

ভগবান, তখন একটী সুল্‌ফা কলিকা প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই লিকাটি গড়গড়ার নলিচার উপর বসাইয়া দিয়া বলিল—"বেশ জবাব হয়েছে। মিঠে মোলায়েম, অথচ বেশ স্পষ্ট। তা আজ

অশ্লেষা মঘা, কাল দিকশূল। পরশু "মঙ্গলের উষা বুধে পা"। পরশু সকালেই চিঠিখানা পৌঁছে দোব কি বলেন ?"

রমেশচন্দ্র বলিলেন, "এইরূপ করার করেছি। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে। এই স্বার্থপর দুনিয়ায়, আমি আর কিছু শিখিনি, তবে মানুষ চিনিতে শিখেছি।"

ভগবান পত্রখানি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রমেশকে প্রণাম করিল। রমেশ বলিলেন—"কাল রাত্রে আমার বাড়ীতে জল স্পর্শ কর নাই। আজ সকালে চারিটী খাইয়া গেলে হয় না ?"

ভগবান বলিল—"চার বৎসর ধ'রে অন্নপূর্ণা ও জগদ্ধাত্রী পূজো করেছেন রমেশবাবু! দমভোর করে আমায় খাইয়েছেন। তার পর, যখন এ গ্রামে আসি তখনই আপনার বাড়ীতে এসে পাত পাড়ি। আমার খাওয়া ত তোলা আছে। ইচ্ছে কল্লেই হবে।"

রমেশ হাসিয়া বলিলেন—"ভগবান! তোমার সবই গুণ কিন্তু একটা দোষ বড় সাংঘাতিক!"

ভগবান হাস্যমুখে বলিল—"কি দোষ বড় বাবু?"

রমেশ। তুমি যা ধর তা ছাড় না! আচ্ছা একটা কথা আজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো। রোজই এ কথাটা আমি জিজ্ঞাসা করবো করবো মনে করে ভুলে যাই। সাহসে কুলোয় না। আচ্ছা ভগবান! তুমি কি জাত? বামন বাড়ী ভিন্ন কোথাও ত পাত পাত না। আর কায়েতের মধ্যে আমি।

ভগবান হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর বলিল—"ওই ত বড় বাবু! একটা বাজে কথা বল্লেন, ভগবানের কি জাত

আছে!" এই বলিয়া সেই পরোপকারী ভগবান, সে স্থান ত্যাগ করিল।

(৮)

পাঠক! পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে কালীকিশোরের পুত্র অন্নদার নাম মাত্র শুনিয়াছেন। এখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহার সহিত আপনার একবার পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

অন্নদার সহিত তাহার ইয়ার-বন্ধুর একটা আন্তরিক সদ্ভাব থাকিলেও. দেবী বাক্‌বাদিনীর সহিত তাহার চিরবিবাদ। তাহার বিদ্যা শিক্ষা গ্রামে এক মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত।

কালীকিশোরের কাছে টাকা ধার না করিয়াছে, এমন লোক নাই। উক্ত মাইনর-স্কুলের হেডপণ্ডিত ও হেড্‌মাষ্টার উভয়েই এক সময়ে তাহার কাছে কিছু টাকা ধার করেন। এই জন্য কালী কিশোর, হরিনামের ঝুলির মধ্যে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে. যখন মাষ্টারের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"কি মাষ্টার! আমার অন্নদা কি পাশ হবে? পড়ছে কেমন?"

অমনি হেড্‌মাষ্টার বলিয়া উঠিতেন আপনি এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করে কষ্ট পাচ্ছেন! অন্য সব ছেলে square বটে, কিন্তু আপনার ছেলেটী যেন একটী circle.

কালীকিশোরের উর্দ্ধতম সাতপুরুষে, কেহ কখন ইংরাজী পুস্তক পড়ে নাই। আহেলে বাঙ্গালা আমলের লোক তিনি। আর মাষ্টারও নিজের ইংরাজি বিদ্যার প্রাখর্য্য দেখাইবার জন্য, কালী কিশোরের কাছে খুব ইংরাজী ঝাড়িতেন।

কালীকিশোর সার্কেলের মাথা মুণ্ড বুঝিতেন না। সুতরাং তিনি বলিলেন—"সরখেল্, শিকদার এ সব ত উপাধি! আমার অন্নদা উপাধি পাবে নাকি?"

পণ্ডিত মহাশয়ও সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বস্থা আবার মাষ্টারের চেয়ে বেশী। তিনিও কর্ত্তার কাছে কিছু টাকা ধারেন। সুতরাং কর্ত্তার মনতুষ্টির জন্য তিনি বলিলেন—"সার্কেল কিনা বৃত্ত। বৃত্ত কিনা বৃত্তি পাইবার উপযুক্ত। অর্থাৎ আপনার পুত্র ঐ অন্নদাটী দেখ্‌তেও যেমন কার্ত্তিকের মত, আর বিদ্যাতেই সেইরূপ "গজভূক্ত কপিত্থবৎ।" শাস্ত্রে আছে "আপন্নিকষো পাষাণে নরো জানাতি সারতাম্।" অর্থাৎ আপনার মত কষ্টি পাথরের ছেলে তাতে যদি সার না থাকৃবে, তা হলে আর থাকৃবে কার?"

বলা বাহুল্য, অন্নদা তাহার এই সব প্রশংসাবাদ শুনিয়া পণ্ডিত-মহাশয়কে মনে মনে তারিফ্ করিতেছিল। আর তাঁহার পশ্চাৎ-দিকে ফরফরায়মান শিখাটি দেখিয়া ভাবিতেছিল, একখানি কাঁচি লইয়া ঐ টিকিটির পরমায়ু শেষ করায় কি একটা অপার্থিব সুখ।

এই ভাবেই অন্নদার বিদ্যাশিক্ষা হইতেছিল। মা স্বরস্বতী পণ্ডিত মাষ্টারদের অত্যধিক প্রশংসাবাদে বুঝিলেন, "যখন ত্র্যহস্পর্শ উপস্থিত, অর্থাৎ স্কুলের মাষ্টার—পণ্ডিত আর পিতা, তিনজনে মিলিয়া এক অকালকুষ্মাণ্ডের মাথা খাইতেছে, তখন ঐ কালী-কিশোর-কুলপাংশুল, অন্নদার সাহচর্য্য ত্যাগ করাই আমার শ্রেয়ঃ।"

মোটের উপর কথা হইতেছে, এই ভাবে মাষ্টার-পণ্ডিতের কাছে অযাচিত ভাবে ডিপ্লোমা পাইয়া, অন্নদা মনে মনে বড়ই

গর্ব্বিত হইল। আর এই জন্য সে তাহার পিতাকে একদিন বলিল "পাড়াগাঁয়ের স্কুলে, আমার পাশের—পড়ার বিশেষ সুবিধা হবে না। আমায় কল্‌কেতায় পাঠিয়ে দাও বাবা!"

তখন কালীকিশোর মহা প্রমাদ গণিলেন। কারণ দেশে পাঁচসিকা মাহিনায় চলিয়া যাইত। আর মাষ্টার পণ্ডিত কম সুদে টাকা ধার লওয়ায়, রোজ এক বার করিয়া তামাকু পুড়াইতে ও ছেলে পড়াইতে আসিত। কলিকাতায় পাঠাইলে খরচ খুবই বাড়িয়া যাইবে।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, কালীকিশোর তাহার কলিকাতার এক আত্মীয়ের নিকট অন্নদার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আর পাঁচ ছয় মাস কলিকাতা বাসের পর, অন্নদা একেবারে পুরা দস্তুর সহুরে ছোক্‌রা হইয়া উঠিল।

কালীকিশোর মাসে বারটী করিয়া টাকা সেই দুঃস্থ আত্মীয়কে পাঠাইতেন। মণিঅর্ডারটা অন্নদাকিশোরের নামেই আসিত। অন্নদা তাহা হইতে দশটী টাকা খোরাকী হিসাবে দিয়া, সেই আত্মীয়কে সাহায্য করিত। আর তাহার মাতার নিকট হইতে লুকাইয়া সে যে একশত টাকা আনিয়াছিল, তাহা হইতে তাহার কলিকাতার বিবিধ সখ মিটাইত।

এই সুবুদ্ধিমান অন্নদা দেখিল, তাহারা পিতা, অল্প টাকায় কলিকাতার খরচ চালাইবার জন্য, তাহাকে যে ভদ্রলোকের কাছে রাখিয়াছেন, সে লোকটী মোটে ত্রিশটী টাকা বেতন পান। অতি-কষ্টে তাঁর সংসার চলে। তাহা ছাড়া তিনি কালীকিশোরের কাছে

কন্যাদায় উদ্ধারের জন্য কিছু ঋণ করিয়াছিলেন। খোরাকী বাবত দশটী টাকা মাসে মাসে পাওয়ায় বেচারির কিছু সাহায্য হইতেছিল। কিন্তু অন্নদার চালচলন দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, কলিকাতা চুলোয় যাক্, এ ছেলেকে অক্সফোর্ডে পাঠাইলেও ইহার রাসভত্ব দূর হইবে না।

অন্নদার এই আত্মীয়ের নাম ভোলানাথ। এই ভোলানাথকে অন্নদা কাকা বলিত। ভোলানাথবাবু, কালীকিশোরের স্বদেশী লোক। অন্নদা প্রায়ই রাত করিয়া বাড়ী ফিরিত, শনিবারে রবিবারে থিয়েটার ফাঁক দিত না। একদিন ভোলানাথ এই বিষয়ে অনুযোগ করায়, অন্নদা তাঁহাকে বলিল—"ভোলা কাকা! মনের অগোচর পাপ নাই। যে ক'টা দিন আমি তোমার এখানে থাকি, তোমারই লাভ। লেখা পড়া শিখবার দরকারই বা আমার কি? আর বাবাও বুড়ো হয়েছে, কতদিন বাঁচবে। তুমি বাবার কাছে দুশোটাকা ধারো, তাও আমি জানি। আমি তোমায় স্পষ্ট বলছি, ভোলাকাকা! যদি তুমি আমার কথায় না থাকো, তা হলে ঐ দুশোটাকার একটী পয়সা তোমায় শোধ কর্ত্তে হবে না। আমার বাবা আমার মার আঁচলধরা। আমি মাকে ধরে তোমার ঐ ঋণের টাকা মাপ করিয়ে দোব। আর সেই সঙ্গে দুশোটাকার হ্যাণ্ডনোট খানা তোমায় ফিরিয়ে দোব।

ভোলানাথ, অন্নদার এই সব কথা শুনিয়া অবাক! কিন্তু বেচারি হুঁসিয়ার লোক। অন্নদাকে ঘাঁটাইলে কোন ফলই হইবে না। এই জন্য ভোলানাথ মনে মনে ভাবিলেন "অই অকাল

কুষ্মাণ্ডের বিদ্যা যতদূর হইবে, তা ত বুঝিতেছি। তা শত্রু বৃদ্ধি করায় ত আমার লাভ নাই, বরঞ্চ তাঁহাকে হাতে রাখায় ফল আছে। এজন্য তিনি বলিলেন—"বাবু! তুমি সোমত্ত ছেলে। লেখা পড়া শিখ্ছো। তোমাদের কথা শুনেই আমাদের এখন কাজ কত্তে হবে। তা যা বলবে, তাতেই আমি প্রস্তুত।"

কিন্তু এ ভাবে আপোষ মীমাংসা করিবার পরও, অন্নদা কলিকাতায় টিকিতে পারিল না। একদিন এই সহরের কোন কুস্থানে গিয়া সে একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া আসিল।

ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না। অন্নদাকে পুলিশকোর্টে আসামীরূপে দাঁড়াইতে হইল। পঁচিশটী টাকা আক্কেলসেলামী বা জরিমানা রূপে দিয়া, অন্নদা গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করিল।

ছুটী শেষ হইলে, অন্নদা আর কলিকাতায় গেল না। সে তাহার মার কাছে আরজী করিল—"কলিকাতায় ভয়ানক প্লেগ হইতেছে! কোম্পানীও ধরপাকড় করিতেছে। নিমতলা ও কাশী মিত্রের ঘাটে বড় বড় গাদিতে মড়া পুড়িতেছে। আর একটু জ্বর হইলেই সর্ব্বনাশ! অমনি হাঁসপাতালে টানিয়া লইয়া যায়। মা! এ সব দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছে। এই রোগে এক ঘণ্টায় লোক মারা যায়। ডাক্তার ডাকিতে দেরী সহে না। যদি তোমাদের নির্বংশ হইবার সাধ না থাকে, তাহাহইলে আমার এখন কলিকাতায় যাইতে দিও না।"

গৃহিণী তখনই বলিয়া উঠিলেন—"ষাট্! ষাট্! ষেটের

বাছা! কিসের অভাব তোমার! তোমার বাপের দেহখানি যেমন ও বুদ্ধিটীও তেমনি। তোমার পড়াশুনার দরকার কি বাবা?"

গৃহিণী ডাল পালা দিয়া ঘটনাটা সাজাইয়া, স্বামীকে বলিলেন। সত্যই সেই সময়ে কলিকাতায় প্লেগ প্রথম দেখা দেয়। কালী-কিশোর মনে মনে ভাবিলেন "মাসে বারো টাকা! কত টাকার সুদ একবার ভাব দেখি! কল্‌কেতায় ছেলে রেখে পড়ান, এ সব রাজা রাজড়ার কাজ। তার পর এই মড়ক! কাজ নেই অন্নদার এই পড়া শুনায়। এই ত আমি ইংরাজীর "ই" ও জানিনি। আর ওত পাশের পড়া অবধি পড়েছে। অই ঢের।"

এই সব ভাবিয়া কালীকিশোর অন্নদার কলিকাতায় যাওয়া বন্ধ করিল। অন্নদা ও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কিন্তু অন্নদার ক্রিয়াশীল মস্তিষ্ক, ক্রিয়াহীন হইয়া থাকিবার নহে। সে তাহাদের বাগান-বাড়ীতে একটা আখড়া বসাইল। সে, কলিকাতায় সখের বেসখের অনেক রকম থিয়েটার দেখিয়া তাহার মাথার মধ্যে থিয়েটারের একটা 'আইডিয়া' লইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং তাহার দুই দশজন সহতীর্থ বন্ধুদের সাহায্যে তাহার বাগান বাড়ীতে এক নাটকাভিনয়ের আখড়া করিল। সমাজের নাম হইল—"অন্নদা নাট্যসমাজ।"

একদিন সে তাহার মাতার নিকট হইতে "আফিং খাইব" বলিয়া ভয় দেখাইয়া, আবার এক শত টাকা সংগ্রহ করিল। ইহাই হইল অন্নদা-নাট্যসমাজের মূলধন। একটা হারমোনিয়ম, একজোড়া বাঁয়া-তবলা, দুখানা বেহালা, একজোড়া মন্দিরা একটা

ক্লারিওনেট ইত্যাদি কিনিয়া সর্ব্ব প্রথমে "ঐক্যতান-বাদন" অর্থাৎ কন্‌সার্টের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার মতলব করিল। কিন্তু তাহা ত এই একশো টাকায় কুলায় না। শেষ সে তাহার হাতের আংটীটি বেচিয়া, পূর্ব্বোক্ত একশত টাকায় যোগ করিয়া, তাহার প্রাণের সখ মিটাইল।

কালীকিশোরের বসতবাটী হইতে, এই বাগান প্রায় আধ ক্রোশ। বাঁকা নদীর ধারে ধারেই এই বাগান বাটী। চারি দিকে মাঠ, বাগান, জঙ্গল। বসতি বড় কম! খুব দূরে দূরে। সুতরাং আখড়ার কাজে অন্য কোনরূপ বাধা উপস্থিত হইল না।

কালীকিশোর একদিন এই সব কথা শুনিল। কিন্তু গৃহিণীর মুখঝাপ্‌টা খাইবার ভয়ে কথাটী পর্য্যন্ত কহিল না। সে যখন দেখিল, কলিকাতার খরচা মাসিক বারটা টাকা বাঁচিয়া গেল, অন্নদার প্লেগে মরিবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল, তখন এসব বিষয়ে কথা কহিবার কোন প্রয়োজনই সে দেখিল না।

অন্নদা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মা স্বরস্বতীর সহিত একবারে ফারখৎ করিল। ইংরাজী স্কুলের আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনযুক্ত, শিক্ষা বিধানের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, সে মনে মনে ভাবিল আর আমায় পায় কে?

অন্নদা একদিন কালীকিশোরকে বলিল—"বাবা! যদিও আমি রোগের ভয়ে, প্রাণের ভয়ে, আর তোমার পিণ্ড বজায় রাখিবার জন্য, কলিকাতা ছাড়িয়া আসিয়াছি, তাহা হইলেও আমি পড়া শুনা ত্যাগ করিব না। বাঘ যেমন রক্তের আস্বাদ পাইলে

মরিয়া হইয়া উঠে, আমিও সেইরূপ কলিকাতার বিদ্যার আস্বাদ পাইয়া মরিয়া হইয়াছি। অতএব তোমার কাছে request করিতেছি—যে আমার শিক্ষার পথ বন্ধ করিও না।"

অন্নদা এতক্ষণ পৈত্রিক ভাষায় কথা কহিতেছিল। সে মনে ভাবিল, আমার যে ইংরাজী বিদ্যা যথেষ্ট হইয়াছে, সেটা একবার এই মুর্খাধম পিতাকে জানান দরকার। এজন্য বলিল—আমি hope করি তুমি আমার এই applicationটা grant করবে।

কালীকিশোরের কোন্ পুরুষে ইংরাজীর 'এ' পড়ে নাই। ছেলে কি বলিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। আর তুমি কি বলিতেছ তাহার মানে বুঝিতে পারিতেছি না ইহা বলিতে, বা পুত্রের নিকট একটা বোকা মুর্খ সাজিতে তাহার ইচ্ছা হইল না। এজন্য সে একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল—"না হয় ম্যাষ্টোর মশাইকে ডাকি। তোমার মনের কথা তাকেই বলো।"

অন্নদা এবার বসিয়া বলিল—"Nonsense সে মাষ্টার Damn Brute সে। তাকে ডাকবো কি Father তুমিই একটা opinion দাও। আমি চাই, পড়াশুনা একেবারে ছাড়বোনা। ঘরে বসে, অর্থাৎ বাগানবাড়ীতে নির্জ্জনে বোসে পড়াশুনা করবো। আর আমার বই কেনবার খরচ, মাসে পাঁচ টাকা করে দিতে হবে।

কালীকিশোর এইবার ভিতরের কথা বুঝিয়া বলিল—"তার আর কি? বেশতো পাঁচটা টাকার জন্য আসে যায় না। যা বলছো, তাইতেই আমি রাজি।"

কালীকিশোর চলিয়া গেলে, অন্নদা খুব এক চোট হাসিয়া

লইল। তারপর বলিল you old fool কেমন তোমায় বোকা বুঝিয়েছি।

ইহার তিনদিন পরে অন্নদা, বাগানে গিয়া একটা আখড়ার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল। অন্নদার এই আখড়ায় ছিল, হুঁকো-কল্‌কে তামাক-গাঁজা, আর মধ্যে মধ্যে মদ। আর ছিল, হল্লা আর ইয়ারকি। কোন কোন দুষ্ট লোকে রটাইত যে তাহারা অনেকবার গভীর রাত্রে বিধবা হরমণি নাপিতানীকে সেই বাগানবাটীতে গোপনে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে। এই হরমণি যুবতী। আর তাহার নামে একটা অপবাদ ও ছিল। কিন্তু গলাবাজীর চোটে ভুত ভাগাইতে পারিত বলিয়া, কেহ হরমণির বিরুদ্ধে কোন কথা কহিতে পারিত না।

কিন্তু জনরবের মুখে হাত দিয়া চাপিয়া রাখা সহজ কাজ নয়। হাওয়ার উপর ভাসিয়া আসিয়া, হরমণিঘটিত সংবাদটা গৃহিণীর কাণে পৌঁছিল। গৃহিণী কর্ত্তাকে তলব করিলেন। তাহাদের এই সময়ের কথা বার্ত্তার একটু নমুনা পাঠককে দেখাইতে হইবে।

গৃহিণী ঝঙ্কার করিয়া বলিলেন—"বুড়ো হ'লে। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। বলি—তোমার আক্কেল খানা কি বল দেখি?"

কর্ত্তা কালীকিশোর ত অবাক্! তিনি কখনও কুঁড়োজালি ছাড়া থাকিতেন না। সুতরাং কুঁড়োজালির মধ্যে একবার হাতটা ফিরাইয়া, একটা হাই তুলিয়া, বাঁ হাতে ভুড়ি দিয়া বলিলেন "হরি বোল! হরি বোল!"

গৃহিণী পঞ্চমে সুর চড়াইয়া বলিলেন—"রেখে দাও তোমার হরিবোলের মড়াকান্না! কথায় বলে, যে "যার হাতে থাইনি সে বড় রাঁধুনী।" কথায় কথায় হরি বোল বলা আর তুড়ি দেওয়া। যেন কত ধার্ম্মিক। ওতো মালা ফেরান নয়—সুদের হিসেব করা! ওসব ভণ্ডামি তোমার খাতকদের কাছে চলতে পারে। এই বিন্দি-কায়েতনীর কাছে নয়। কেবল লোকের সর্ব্বনাশ করে বেড়াচ্ছো, সুদের উপর সুদ চাপিয়ে, নীলেমে লোকের বাড়ী ঘর কিনে নিচ্ছো। এত নষ্টামি বুদ্ধি তোমার, আর একটা সোজা কথা তুমি বুঝতে পার না।"

ইহাই হইল পত্নীর মধুরালাপের পূর্ব্বরাগ বা পূর্ব্বসূচনা। অন্য কেহ হইলে হয়তো ভয়ে চমকিয়া উঠিত অথবা রণে ভঙ্গ দিত। কিন্তু কালীকিশোর এসব ব্যাপারে খুব অভ্যস্ত ছিলেন। কাজেই তিনি জপের মালাটা বেশী জোরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন, "বলি! ব্যাপারটা কি খুলেই বলনা গিন্নি! গোড়াথেকেই মুগুর ভাঁজতে আরম্ভ কল্লে কেন?"

গৃহিণী। বলি—অন্নদার কি বিয়ে দেবে না মনে করেছ? তোমার কি একটু আক্কেল নেই! সোমত্ত ছেলে হল, ঐ বয়সে কত লোকের ছেলে পুলে হচ্ছে! আমার এমন পোড়া কপাল, এমন হাঘরে কশায়ের হাতে আমি পড়েছিলুম, যে কেবল টাকাই চিনেছে। বৌ নিয়ে ঘর করা বা নাতির মুখ দেখা আর হলো না।"

কালীকিশোর ভণিতার বহর দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন—হয়ত গৃহিণী তাঁহার নিকট কিছু আদায় করিবার জন্য, এই প্রলয়কারী

পূর্ব্বসূচনা আরম্ভ করিয়াছেন ! কিন্তু যখন দেখিলেন, ব্যাপারটা টাকাকড়ি ঘটিত নহে, তখন তাঁহার ধড়ে প্রাণ আসিল !

কালীকিশোর বলিলেন—"দেখ গিন্নি ! তোমারও যেমন একটি বৌ দেখবার সাধ, আমার ও সেইরূপ। কিন্তু এ তল্লাটে ত একটীও-সুন্দর মেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

গৃহিণী। তোমার চোখ্‌ খালি টাকার দিকে, কাজেই মেয়ে দেখ্‌তে পাওনা। এই আমাদের পাড়ায় রমেশ বাবুর কেমন একটী সুন্দরী মেয়ে আছে ! আমাদের পাশের বাড়ীতে সেদিন তারা বেড়াতে এসেছিল। সে মেয়ে আমি নিজের চোখে দেখেছি। আহা যেমন রং, তেমনি গড়ন। অন্নদা সেই সময়ে আমার ডাক্‌তে যায়। সেও মেয়েটিকে দেখে একদৃষ্টে চেয়ে রইলো। এই রমেশ ত তোমার কাছে টাকা ধারে। একটু মোচড় দিলেই ত মেয়েটা আমাদের ঘরে আসে। আমি অন্নদাকে বলেছিলুম, কেমন ফুটফুটে মেয়েটী দেখেছিস্‌ অন্নদা ! আমার ইচ্ছা, ওটিকে বৌ করি ! কিন্তু সে কথার জবাব না দিয়ে মুখ মুচ্‌কে একটু হাস্‌লে। ছেলে ত নয় হেন লজ্জাবতী লতা। অন্নদা আমার বেঁচে থাক্‌লে দেখবে ও কি ছেলে। ওগো ! তুমি ঐ মেয়েটীকে আমার বৌ করে দাও। আর আমি তোমার কাছে কিছুই চাই নি।"

কালীকিশোর গৃহিণীর কথাগুলি শুনিয়া, ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিলেন—"এই কথা ! আমি বলি আর না জানি কি ? তা এর জন্য ভাব্‌তে হবে কেন গিন্নি ! ঐ রমেশ কায়েতের মাথাটা যে আমার কাছে বাঁধা। সুতরাং একটু চাপ পেলেই, আমার পায়ের

কাছে নুয়ে পড়বে। জান তুমি, ঐ রমেশ বাবু আমার কাছে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ধার করেছে। আর একমাস বাদে সেই টাকাটা তামাদি হবে। নির্ভয়ে থাক গিন্নি! মনে স্থির করে রেখে দাও, ঐ মেয়েই তোমার বৌ হবে।

আগুণে জল পড়িলে তাহা যেমন তখনি ঠাণ্ডা হয়, তরঙ্গায়িত সমুদ্রে তেল ফেলিলে তাহা যেমন তখনি স্থির ভাবধারণ করে, কালীকিশোরের রুদ্রচণ্ডা গৃহিণী, এই কথায় সেইরূপ শান্তভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, "আমি কি জানিনি, তোমার মত বুদ্ধিমান লোক এ গাঁয়ে আর দ্বিতীয় নেই। তবে তোমার বুদ্ধিটা পাছে ভোঁতা মেরে যায়, এই জন্য আমি তাতে এই ভাবে মাঝে মাঝে শাণ দিয়ে দিই।"

কালীকিশোর জপের মালা ফিরাইতে ফিরাইতে, হাস্যমুখে বাহিরে চলিয়া গেলেন। লোকের ছেলের বিবাহের সম্বন্ধ আপনাপনি চারি দিক হইতে আসিয়া থাকে। কিন্তু কালী-কিশোরের নন্দদুলালের বিবাহের জন্য কোন ঘটক বা ঘটকী, তাহার বাড়ীতে এ পর্য্যন্ত পায়ের ধুলা দেয় নাই। এই জন্য কালী-কিশোর একটী সুন্দরী মেয়ের জন্য নিজেই চারি দিকে লোক পাঠাইয়াছিল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সিদ্ধকাম হয় নাই। এখন পত্নীর নিকট গুরু মন্ত্র পাইয়া, তাঁহার কূটস্থা চৈতন্য জাগরিত হইয়া উঠিল। আর ঘটনাচক্রের এরূপ সমাবেশ, যে এই ব্যাপারের দুই দিন পরেই, রমেশচন্দ্র নূতন ঋণ করিবার জন্য, কালীকিশোরের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ইহার ফল কি হইয়াছিল, পাঠক তাহা জানেন।

যথাসময়ে ভগবান কর্ত্তৃক আনীত, রমেশচন্দ্রের পত্রখানা কালী-কিশোরের হাতে আসিয়া পৌঁছিল।

ভগবানকে সবাই চিনিত। কিন্তু তাহার প্রকৃত স্বভাবটা জানিত খুব কমলোকেই। ভ্রমান্ধ কালীকিশোর, কামিনীকাঞ্চনলুব্ধ কালীকিশোর, ভগবানকে পাগল বলিয়াই ভাবিত।

অতি প্রত্যুষ সময়ে ভগবানকে সহসা উপস্থিত হইতে দেখিয়া, কালীকিশোর বলিল—"কিরে পাগলা! কি খবর!"

ভগবান তাহার উত্তরীয়ে বাঁধা সেই পত্রখানি বাহির করিয়া বলিল—"হুজুরের নামে এক খানা চিঠি আছে।"

"কার চিঠি?"

"আজ্ঞে হুজুর! ঐ ও পাড়ার রমেশ বাবুর। আস্পর্দ্ধাটা একবার দেখুন না। আমায় বল্লে—"ওরে পাগলা! একখানা চিঠি কালীকিশোরের হাতে দিয়ে আস্‌বি! এই নে দুটো পয়সা! আচ্ছা! হুজুর! ভগা পাগলা কি লোকের ডাক-পিয়ন?"

কালীকিশোর একথা শুনিয়া মৃদু হাস্য করিল। তাহার দগ্ধ মুখে হাসি বলিয়া কোন কিছু ছিল না। এজন্য লোকে তাহার মুখে হাসি দেখিলেই ভয় পাইত।

কালীকিশোর সেই চিঠিখানা তাড়াতাড়ি খুলিয়া বলিল—"অইখানে একটু বোস্ পাগলা। এ চিঠির খবর যদি ভাল হয়, তাহ'লে আমিও তোকে একটা পয়সা বক্‌শীস করবো।"

"আজ্ঞে হুজুরেরই ত খাচ্ছি" বলিয়া, ভগবান দেয়াল ঠেস্ দিয়া

দালানে বসিল। ভগবানকে লোকে "তুই-তোকারী" করিলেও, সে লোককে হুজুর ধর্ম্মাবতার ভিন্ন কথা বলিত না।

ভগবানের মনের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য, এই নরাধমটা পত্র পড়িয়া কি রূপ মনোভাব প্রকাশ করে, তাহা একবার শুনিয়া যাওয়া।

পত্রখানি পাঠ শেষ হইলে, কালীকিশোরের মুখ মলিনভাব ধারণ করিল। তার পর সে উত্তেজিত স্বরে সহসা বলিয়া উঠিল—"দেখ্‌লে একবার রমেশ ব্যাটার আস্পর্দ্ধটা! সে আমার কাছে সাড়ে চার হাজার টাকা ধারে, আর সে টাকা শোধ করবারও ক্ষমতা নাই। অক্ষম যোত্রহীন দেনাদার যে, কাল কি খাবে এ সম্ভাবনা যার নেই, তার এত তেজ! দেখা যাক্, আমার এ অপমানের জের কোথায় গিয়ে ম'রে। ঢোল পেটাবো, তবে ছাড়বো।"

মনের উত্তেজনায় এতগুলি কথা সহসা বলিয়া ফেলিয়া, কালীকিশোর একটু ঠাণ্ডা হইল। সোডাওয়াটারের বোতলের জলের ছিপিটা সরাইবার পরে যেমন এক একবার সোঁ সোঁ করিয়া উঠে, আধ পয়সার তুবড়ীতে আগুণ দিলে বারুদটা অগ্নিকণায় পরিবর্ত্তিত হইয়া, যেমন ফর ফর করিয়া উড়িয়া যায় কালীকিশোর সেই ভাবে মনের কথাগুলা হু হু করিয়া ব্যক্ত করিবার পর যখন বুঝিল, তাহার সম্মুখে সেই ভগবান পাগল তখনও বসিয়া আছে, তখন সে একটু সঙ্কুচিত হইল। আর ভগবান তাহার এ উত্তেজিত ভাব দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

কালীকিশোর ভগবানকে হাসিতে দেখিয়া একটু রুষ্ট ভাবে বলিল—"হাস্‌ছিস্ কেন রে পাগলা?"

ভগবান। দুনিয়ার গতিক দেখে হুজুর!

কালীকিশোর। গতিক টা কি দেখলি?

ভগবান। "দেখলুম রমেশ বাবুর কাণ্ড! আপনি একটা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নির্ব্বিরোধী পরম বৈষ্ণবলোক। আপনার সঙ্গে সে কিনা ঝগড়া কর্ত্তে চায়? কি আশ্চর্য্য! হরিবোল হরি?"

কথাটা কালীকিশোরের মনের মত হওয়ায়, সে খুব খুসী হইয়া বলিল—"দেখ দিকি ভগবান! তুমি ত পাগল মানুষ, তোমার যেটা বোঝবার শক্তি আছে, সেটা এই রমেশের নেই! এটা কি কম ধাষ্টমির কথা! জানিস্—আদালত আমার হাতে। আমি যে তোর ভিটে—মাটি উচ্ছন্ন দিতে পারি, তা তুই জানিস্ নি!"

কালীকিশোর এই কথাগুলি বলিয়া স্তব্ধভাব ধারণ করিয়া মনে মনে রাগে ফুলিতে লাগিল। তাহার কুঁড়োজালির ভিতরে, জপের মালাটা খুব জোরে ফিরাইতে ফিরাইতে বলিল—"দেখ ভগবান! তুমি যখন তার চিঠিখানা এনেছ, তখন তার একটা জবাব তোমার মারফৎ দিতেই হবে। সেই নির্ব্বুদ্ধি দাম্ভিক রমেশকে বলো, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নেই। টাকার জোরে আমি তার মেয়ের চেয়ে, সহস্রগুণে সুন্দরী বৌ ঘরে আন্‌তে পারবো। কিন্তু তার এই অহঙ্কারের ফল তাকে নিশ্চয়ই ভুগ্‌তে হবে। আমার অপমান করার ফল যে কি হতে পারে, তা তাকে বেশ করে বুঝিয়ে দোব।"

এই কথা বলিয়া, কালীকিশোর বৈঠকখানা ত্যাগ করিয়া অন্দর মহলে চলিয়া গেল। ভগবানও তাহার গন্তব্যপথ ধরিল। কিন্তু

রমেশের বাড়ীর দিকে সে গেল না। কোথায় গেল—তাহা আমাদের একবার দেখিতে হইবে।

(৯)

ভগবান সরাসর মাঠ পার হইয়া উত্তর দিকে চলিল। প্রায় একক্রোশ পথ চলিবার পর, সে এক ক্ষুদ্রগ্রামে প্রবেশ করিল।

গ্রামের আঁকাবাকা পথ ধরিয়া, সে একখানি মৃৎ কুটীরের নিকটে পৌঁছিল। এই ক্ষুদ্র বাড়ীখানির চারিদিক মাটীর পাঁচিলে ঘেরা। পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্তলোকের বাড়ী যেমন হওয়া উচিত, ঠিক সেই ভাবের।

গ্রাম্যপথে তুই একজন চাষা-ভূষা ও সব্জী-ব্যাপারী ভিন্ন আর কাহারও সহিত ভগবানের সাক্ষাৎ হইল না। ইহারা সকলেই ভগবানের পরিচিত। সকলেই তাহাকে জোড়হাতে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিয়াছিল।

ভগবান একটী বাড়ীর কাছে উপস্থিত হইয়া, দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া ডাকিল—"মাসি!"

এক বর্ষীয়সী আসিয়া, তথনই সদর দ্বার খুলিয়া দিল। ভগবান ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র, সে আবার দ্বারটী ভেজাইয়া দিয়া বলিল "কেমন আছ বাবা? এবার আস্তে এত দেরী হল কেন? আমি আরও কত ভেবে মর্ছি।"

ভগবান দাওয়ায় উঠিয়া একখানি মাদুর সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তাহা পাতিয়া বসিল। তার পর বলিল—"আমি ত তোমায় বলে গেছি মাসী মা! যে ভগবানের জন্য কোন ভাবনা নেই। যার

এ জগতে কোন শত্রু নাই, তার জন্য ভাবনা কিসের? যাক্—তুমি ভাল আছ তো?"

মাসী। আমার আর ভাল থাকাথাকি কি বাবা? তুমি ভিন্ন এ জগতে আমার ত আর কেউ নেই। পেটে একটা ধরিনি। ষোল আনা মায়াটা তোমারই উপর পড়েছে। তুমি ভাল থাকলেই আমারও ভাল থাকা হলো।

ভগবান উত্তরীয় খানি তুলিয়া রাখিয়া, একটু তামাকু সাজিল। তামাকুর সরঞ্জাম যাহা কিছু সে বাটীতে ছিল, তাহা ভগবানের ব্যবহারের জন্য। আর এ সব তাহারই পূর্ব্বসঞ্চিত জিনিস। কারণ সে প্রায়ই এই বাটীতে আসিয়া মাসীকে দেখা দিয়া যাইত।

তামাকু খাইয়া একটু সুস্থ হইয়া, ভগবান বলিল—"মাসী ভাত চড়িয়েছো কি?"

মাসী। কেন তোর কি খুব খিদে পেয়েছে? তা তুই তামাক খেয়ে তেলটেল মাখ, স্নান করে আয়। মুড়ি গুড় নারিকেল খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ। এখনই ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি। ভাতে-ভাত নামাতে কতক্ষণ?

ভগবান। সেই ভাল! একটা কথা বলছিলাম কি, তোমার কাছে যে চারিশো টাকা লুকিয়ে রেখে গিছলুম, সেটা কাকেও ধার টার দাওনি ত?

মাসী। এবার একটু সুজন্মা হয়েছে। চাষালোকের অবস্থা খুব স্বচ্ছল। ধার কর্জ্জে কেউ আসে না ত বাবা! কাজেই টাকাটা তেমনই তোলা আছে।

ভগবান। ভাল ভাল! ভগবানের ইচ্ছায় তাই হোক্ মাসী। আহা! গরীবেরা কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে দুটো পেটে দিয়ে বাঁচুক। আর আমরা ত সুদের লোভে ধার দিই নি। মহাজনের অত্যাচার থেকে গরীবদের বাঁচাবার জন্য আমার দেবতুল্য মনিব এই তাগাবির ব্যবস্থা করেছেন। আহা! অমন লোক কি আর জন্মাবে মাসী! যেন শাপভ্রষ্ট দেবতা!

মাসী। সত্যই বাবা তিনি দেবতা! তুমিতো মর্‌তেই বসেছিলে। সেই দেবতাই ত তোমায় বাঁচিয়েছেন। যাই হোক্ বাবা! আমার অনুরোধটা রাখলি নি!

ভগবান। কি অনুরোধ মাসি-মা?

মাসী-মা। সংসারী হবি নি বাবা? মোটে ত তোর পঁয়ত্রিশ বছর বয়স।

ভগবান। সংসারী হতে আর বাকী কি রেখেছি মাসী-মা! এত বড় একটা মুল্লুক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কত মা, কত বাপ, কত মেয়ে কত ভাই! কেউ বলে—আমার ভগবান বাবা এসেছে। কেউ বলে—ভগবান দাদা এসেছে। কেউ বলে—ঐ আমার পাগলা ছেলে এসেছে। গৌরদাস বাবাজী খুব বাড়িয়ে বলেন, ঐ আমার পাগল নিতাই এসেছে! এই বিশাল উন্মুক্ত সংসারক্ষেত্রে আমি যে একটা খুব বিস্তৃত মোহের সংসার পেতেছি, তার চেয়ে কি এক ক্ষুদ্র সংকীর্ণ সংসারে আবদ্ধ হয়ে বেশী আনন্দ পাবো মাসী-মা? যে মহাত্মা মৃত্যুমুখ থেকে উদ্ধার করে আমাকে জীবনের সীমায় ফিরিয়ে এনেছেন, তাঁর হুকুম আমায় আগে তামিল কর্ত্তে হবে।

মাসী-মা। তিনি কি তোমায় বলেছেন, সংসারী হয়ো না! তোমার মাসীমার কথার অবাধ্য হয়ো।

ভগবান। না—তা বলেন নি বটে। কিন্তু সংসারী হলে, আমার এভাবে কাজ করা ত চল্‌বে না। তিনি আমাকে গরীবের দুঃখ মোচনের জন্য নিযুক্ত করেছেন। এর জন্য আমি কর্ম্মচারী হিসেবে তাঁর কাছে মাসে মাসে মাইনে পাই। তবে সে মাইনের একটী পয়সাও এখন আমি নিইনি। তিনি যে প্রতিমাসে গরীবের দুঃখ দূর করবার জন্য দু তিনশো টাকা আমার হাতে দেন,তার সদ্ব্যবহার করবার জন্যে, আমায় পাগল সাজ্‌তে হয়েছে। তাঁর নিষেধ—"খবরদার! আমার নাম করোনা। কাজ তুমিই করে যাও। এই জন্য কেউ কিছু টের পায় না যে তিনি এর মধ্যে আছেন। ভাবে আমিই সব কচ্ছি।

মাসী-মা। তা বাবা! তুই যা ভাল বুঝিস্ তাই কর। জিজ্ঞাসা করি, আজ আবার যেতে হবে কোথায়?

ভগবান। আজ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে কলকেতায় যাবো।

মাসী-মা। কেন—এমন কি জরুরী দরকার?

ভগবান তখন রমেশ ও কালীকিশোরের সম্বন্ধে সকল কথা মাসীকে খুলিয়া বলিল। এই জগতে তাহাকে স্নেহ করিবার জন্য এই মাসী-মা ভিন্ন আর কেউ নাই। এই মাসীমা, তাহার মাতার কনিষ্ঠা ভগিনী। ভগবান জাতিতে কায়স্থ। আর রমেশচন্দ্র যে গ্রামে বাস করেন, সেখান হইতে ভগবানের বাসস্থানের দূরত্ব প্রায় দুই ক্রোশ।

ভগবান কলিকাটী শেষ করিয়া, তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আসিল। তার পর তাহার ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিল। তাহার বাটীতে শালগ্রাম নাই, কোন প্রতিমা নাই। এই পাগল ভগবানের পূজা, ঊর্দ্ধনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকা। আর চোখ বুজিয়া অস্ফুটস্বরে "হরিবোল" বলা। এরূপ করিতে করিতে যখন তাহার চোখে ভক্তি অশ্রুধারা বহিত—তখন সে বুঝিত, তাহার পূজা শেষ হইয়াছে।

সে দিনও ভগবান সেইরূপ করিল। তারপর সে মাসীমার সাদরে প্রদত্ত গুড়-মুড়ি খাইয়া, টিনের তোরঙ্গের ভিতর হইতে একটী সাদা জামা ও একখানি চাদর বাহির করিল। তাহার পর কুলুঙ্গীর উপরে রক্ষিত এক জোড়া চটি জুতা বেশ করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া লইল। বলা বাহুল্য, ভগবান যখন গ্রামের মধ্যে দরিদ্র নারায়ণের কাজে ঘুরিত, তখন সে সুধু পায়েই থাকিত।

যথাসময়ে ভাত বাড়িয়া, মাসিমা ঠাকুরাণী তাহাকে আহার করিতে ডাকিলেন। সেই ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে অভাব বলিয়া কোন কিছুই ছিল না। উঠানের ক্ষুদ্র মরাইটীতে সম্বৎসরের ধান সঞ্চিত থাকিত। ক্ষেতের জমি ভাগে দেওয়া ছিল, এজন্য ধান ছাড়া, কিছু কড়াই ও আলু পাওয়া যাইত। উঠানের আঙ্গিনার মধ্যে একটী মাচা, আর তার পাশে ক্ষুদ্র ক্ষেত ছিল। —সে মাচায় যখনকার যা অর্থাৎ লাউ কুমড়া সীম ইত্যাদি ফলিত। আঙ্গিনার এই ক্ষেত হইতে যে সময়ের যা, সেইরূপ চারটী শাক ও তরকারী পাওয়া যাইত। ভগবান নিজে নিরামিষাশী। মাসিমাও বিধবা।

সুতরাং সে বাড়ীতে আমিষ বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্বই ছিল না।

নিরামিষ ঝোলভাত, আলুভাতে ও শেষ পাতে একটু দুধ ও গুড়, এই মাসিমার স্নেহের আয়োজন। বাড়ীতে একটী গাভী ছিল, গাভিটা মাসিমার ও ভগবানের জীবনধারণের উপযোগী দুগ্ধ যোগাইত। ভগবান মাসিমাতার কাছে পাঁচ দিন পরে আহার করিতে আসিয়াছে, কাজেই সে তৎপ্রদত্ত স্নেহমাখা অন্ন খুব তৃপ্তির সহিত আহার করিল।

ভগবান সপ্তাহে দুই তিন বার বাড়ী আসিত। তারপর বাকি কয়দিন সে এ গ্রামে সে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইত। অনেক ব্রাহ্মণ বাড়ীতে গেলে, গৃহস্বামী তাহাকে খুব আদর যত্নের সহিত প্রসাদ দিতেন। আর দুই এক ঘর কায়স্থ-বাড়ীতেও সে পাত পাড়িত, কারণ সেখানে খুব যত্ন আদর ছিল। এই ভাগ্যবান কায়স্থদের একজন রমেশবাবু। যখন বামুনের প্রসাদ, কায়েতের ভাত না জুটিত, তখন সে বাজার হইতে কিছু চিড়া-মুড়কি ও দই কিনিয়া লইয়া আহারাদি করিত। এইরূপ কষ্টস্বীকারেই সে চির অভ্যস্ত।

মাসিমা বলিলেন—"হপ্তায় তিন চার দিন একাদিক্রমে গাঁয়েগাঁয়ে ঘুরে বেড়াস্ বাবা! আর হঠাৎ বাড়ীতে এসে পড়িস্। দুটো ভাল মন্দ তরকারী রেঁধে যে খাওয়াব, তার আর সুযোগ হয় না!"

ভগবান বলিল—"মাসীমা! জিনিষের ভাল মন্দ কিছুই নেই।

জিনিষ ভাল মন্দ হয় দাতার আদর ও যত্নের গুণে। তোমার স্নেহের অঞ্চলের আড়ালে বসে, এই যে আমি ঝোল ভাত খেলুম, এতে আমার কত তৃপ্তি। কোথায় লাগে মাসিমা! লুচি-কচুরি ও পোলাও কালিয়া।

মাসিমা। আর চারটী ভাত আর একটু দুধ দোব?

ভগবান। না মাসীমা, পেট ভরে গেছে। আমি দু তিন দিনের মধ্যেই কল্‌কেতা থেকে ফিরে আস্‌ছি। তখন যত পার খাইও। যে কাজের জন্য আমি আজ কলকেতায় যাচ্ছি, সেটা যাতে সুসম্পন্ন করতে পারি, সেই আশীর্ব্বাদ কর মাসীমা।”

এই কথা বলিয়া ভগবান উঠিয়া পড়িল। তারপর আচমনাদি করিয়া, একখানি চেটাই পাতিয়া দাওয়ায় শুইল। আন্দাজ এক-ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিয়া, সে উঠিয়া বসিল। তার পর কাপড় চোপড় পরিয়া, মাসীমার কাছ হইতে চারি শত খানি টাকার নোট লইয়া, দুর্গা শ্রীহরি বলিয়া বাটীর বাহির হইল।

যতক্ষণ ভগবানকে দেখা যায়, স্নেহময়ী মাসীমা ততক্ষণ একদৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ভগবান যে কে, সে যে প্রকৃত পাগল নয়, সে যে ভিক্ষুক নয়, তাহার পরিচয় পাঠক এইবারে পাইলেন। এখনও ভগবান সম্বন্ধে সব কথা বলা হইল না। এর পর তাহার প্রকৃত স্বরূপ, তাঁহার কার্য্যকলাপ হইতে প্রকাশ পাইবেন।

(১০)

ভবানীপুর বেলতলার মোড়ে, ভগবান ট্রাম-কার হইতে নামিয়া এক পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কতকগুলি রাস্তার মোড় ফিরিয়া, সে একটী সুন্দর ত্রিতল বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন অপরাহ্ণ।

বাড়িটী যে কোন সঙ্গতিপন্ন লোকের, তাহা তাহার বাহ্যদৃশ্যেই প্রমাণ হয়। সুন্দর ত্রিতল বাড়ীখানি। বামে দক্ষিণে তৃণপূর্ণ ফাঁকা জায়গা যথেষ্ট। চারিদিকে রেলিং করা। এই রেলিংএর মধ্যস্থানে লোহার ফটক। ফটকের পার্শ্বেই দ্বারবানের ঘর।

ভগবান ফটকের সন্নিহিত হইবামাত্রই দরোয়ানের সহিত তাহার চোখা-চোখি হইল। দরোয়ান, তাহাকে দেখিবামাত্র সম্মানের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "খপর আচ্ছা দাদাজী ?"

ভগবান সহাস্যে বলিল—"হাঁ রামপাল। খবর ভাল। বাবু কোথায় ?"

দারোয়ান বলিল—"বাবু তাঁর কিতাব ঘরে আছেন !"

ভগবান। আজ আর বেড়াতে যাননি ?

দারোয়ান। না—তাঁর তবিয়ৎ আজ বড় ভাল নাই।

সেই বাটীর সকল স্থানই ভগবানের পরিচিত, সুতরাং সে চিরপরিচিতের মত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভগবান একটী বৈঠকখানা কক্ষের সন্নিহিত হইয়া, জুতা জোড়াটী বাহিরে রাখিয়া, অতি সন্তর্পণে দ্বার ঠেলিয়া, সেই কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

এক গৌরকান্তি প্রৌঢ় ব্যক্তি সেই গালিচা-মণ্ডিত কক্ষমধ্যে টেবিলের পার্শ্বে ইজি-চেয়ারে লম্ববান হইয়া, একখানি বাঙ্গলা শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িতে ছিলেন!

সহসা ভগবানকে তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বাবুটী বইখানি টেবিলের উপর রাখিয়া, সস্মিতবদনে বলিলেন "এস—ভগবান! ব্যাপার কি বল দেখি? কোন সংবাদ আমি এই সাত দিন তোমার পাই নি। এজন্য বড়ই ভাবছিলুম্।"

ভগবান সম্মানের সহিত যুক্তকরে প্রণামান্তে, তাঁহাকে বলিল—"আজ্ঞে! হুজুরকে যে এই সাত দিন কোন খপর দিই নেই তার একটা কারণ ছিল। একটা মস্ত হাঙ্গামায় আমি জড়িয়ে পড়েছি। আর সেটা থেকে উদ্ধার হবার জন্যই, আজ আপনার কাছে এসেছি। আপনার শরীরটা ভাল নয় শুনে, বড় দুঃখিত হলুম।"

তখন গ্রীষ্মকাল। উপরে বিজলীর পাখা চলিতেছিল। ঘরটী বেশ ঠাণ্ডা। সেই বাবুটী বলিলেন,—"ভিতরে গিয়ে একবার দেখা করে এস। তোমার মা'ও তোমার জন্যে ভাবছিল।"

ভগবান সহাস্যে বলিল—"তা মা আমার এমনি করুণাময়ী বটে। আমার জীবনদাতা আশ্রয়দাতা আপনি। আর গর্ভধারিণী না হয়েও মার চেয়ে বেশী তিনি আমার। আপনাদের ঋণ কি আমি শোধ করতে পারবো প্রভু।"

বাবুটী স্নেহের সহিত ভগবানের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "হাঁ—হাঁ—তা পারবে। আমি আগে তোমার ঋণের এই জমা

খরচটা ঠিক করে সেরেস্তা দোরস্ত করি, তার পর দেনা-পাওনার হিসেব হবে। এখন বাড়ীর ভিতরে গিয়ে, জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এসো।"

ভগবান অন্তঃপুরের মধ্যে চলিয়া গেল। বাবুটী, ইজিচেয়ার ছাড়িয়া, টেবিলের পার্শ্বে আসিয়া একটী টানা খুলিলেন। সেই টানার মধ্য হইতে একখানি ফটোগ্রাফ্ বাহির করিয়া এক দৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। তারপর সেখানি আবার টানার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"হায়! হতভাগ্য উদ্ধত যুবক! তুমি আজও বুঝিলে না, জগতের এক নিভৃত কোণে কতটা প্রাণ ভরা স্নেহ, তোমার জন্য লুকানো আছে।"

বাবুটীর নাম, মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী। মৃত্যুঞ্জয় বাবু ওকালতী করিয়া বড় মানুষ হইয়াছেন। জমীদারীও কিনিয়াছেন। কিন্তু তিনি অপুত্রক। ভগবান তাঁহাকে একটী কন্যা সন্তান দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা কাড়িয়া লইয়াছেন। সেজন্য তিনি একটুও দুঃখিত নহেন। তবে আর একটা দুঃখ তাঁহার অন্তরকে মধ্যেমধ্যে বড়ই আন্দোলিত করিত। আর সে আন্দোলনে তিনি এক এক সময়ে বড়ই কাতর হইয়া পড়িতেন। কি যে সে দুঃখ, যথাসময়ে তাহা প্রকাশ হইবে। মৃত্যুঞ্জয় বাবু, ফটোখানি টানার মধ্যে রাখিয়া, আবার সেই ইজিচেয়ারে লম্বমান হইলেন। এমন সময়ে ভগবান সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ভগবানকে একখানি চেয়ারে বসিতে বলিলেন।

তারপর তিনি, তাহাকে একটু চিন্তিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—“ব্যাপার কি ? তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল !”

ভগবান। আজ্ঞে হাঁ—এবার একবার নয় বহুবার।

মৃত্যুঞ্জয়। একটুও নুয়েছে বলে বোধ হয় কি ?

ভগবান। মিথ্যা কথা ত আপনার কাছে বলবো না হুজুর ! তবে এইবার বোধ হয়, নুইতে হবে।”

মৃত্যুঞ্জয়বাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—“ব্যাপারটা কি শুনি ?”

ভগবান তখন রমেশচন্দ্র ঘটিত সমস্ত সংবাদগুলি গুছাইয়া এই মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে বলিল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন—“সে যাই হোক না কেন, তাহাকে রক্ষা করা আমার প্রধান কর্ত্তব্য। যাতে তার মেয়ের বেতে কোন বাধা উপস্থিত না হয়, তাই কর্ত্তে হবে। সেই হতভাগা অভিমান ত্যাগ করে, যদি একবার এসে আমার কাছে দাঁড়ায়, তা হ'লে ত সব মিটে যায়। ভগবান ! তা হলে যে রাজার হালে, আমি এই বাড়ীতেই তার মেয়ের বিবাহ দিতে পারি।”

ভগবান। ভবিতব্য ! হুজুর ভবিতব্য আর কর্ম্মফলই মানুষের বুদ্ধিকে উলটো পথে নিয়ে যায়, আর সেই জন্য সে কষ্ট ভোগ করে। দেখুন—আপনার হুকুমে আমি এক বৎসর তাঁর সঙ্গে মেশামেশি কচ্ছি। কিন্তু আমি যে আপনার সঙ্গে পরিচিত, আপনারই লোক, সেকথা তাঁকে এখনও জানতে দিই নি। আর আপনার অনুমতি না পেলে, সেটা করতেও সাহস করিনি।

লোকটার প্রাণ খুব সরল। কিন্তু ঘোর অভিমানী। বড় তেজী। যে আপিসে তিনি চাকরী কর্ত্তেন, সেখানকার সাহেবের কাছে একবার গেলেই তাঁর আবার চাকরী হয়। এত কষ্ট পাচ্ছেন তবু যেতে চান না।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ভগবানের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"কর্ম্মফলই বটে! তোমার প্রকৃত পরিচয় তাকে দিও না। তোমার এখন পাগলামী ভাবটাই আমার কার্য্যসাধনের প্রধান উপায়। কেবল রমেশ নয়, আমার জমীদারীর মধ্যে প্রজাদের কারুর যাতে কোন কষ্ট না থাকে, আমি তাই চাই। যে গুরুর কৃপায়, আজ আমার এই ঐশ্বর্য্য তাঁর একমাত্র আদেশ—"জীবে দয়া, পরে প্রীতি—আর্ত্তের উদ্ধার"। দেখ ভগবান! আমার ছেলে পুলে একটাও হলো না। এ বয়সে হ'বার আশাও নেই। আইনমতে ঐ রমেশই আমার বিষয়ের উত্তরাধিকারী। তার পিতা হলে হয় তো, তার দোষের জন্য মার্জ্জনা কর্ত্তো। কিন্তু মামা বলে আমি সেটা কর্ত্তে পারিনি। ভেবেছিলুম, সে আবার ফিরে এলে তাকে বুকে তুলে নেবো। কেননা আমিই তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিই। আশ্চর্য্য যে সেই অপমান এই দীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে ভুলতে পারলে না। ভাব দিকি ভগবান! কি ভয়ানক দাম্ভিক সেই রমেশ। তাকে আমি আগে আগে পত্র লিখতুম। সে তার জবাব পর্য্যন্ত দেয়নি। লোক পাঠিয়েছি, তাকে আসতে বলেছি, তবুও সে আসেনি। তাকে ছেলে বেলা থেকে আমি সন্তানের স্নেহে কোলে, পিঠে করে মানুষ করেছি। আমার স্ত্রী তার জন্যে যে দিন না

চোখের জল ফেলে—সে দিন দিনই নয়। কিন্তু এর চেয়ে আমি আর কি করতে পারি ভগবান! আমিতো তার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াতে পারবো না! স্নেহের অপরাধের পাপে অতটা নীচু হতে গেলে, আমার গর্ব্বের আর থাকবে কি? তবে সময়ের মত চিকিৎসক আর নেই। দুঃখের মত শিক্ষাদাতা আর নেই। সময়ের শিক্ষায় আর জ্বালায় পড়ে, এখনও যদি তার চৈতন্য হয়, আমি সেইটেরই অপেক্ষা কর্চ্ছি।"

ভগবান—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হুজুর! আপনাকে বিধাতা যে কি উপাদানে গড়েছেন, তাকি আমার জানতে বাকি আছে? কিন্তু আমার বোধ হয়, গ্রহের ফেরে এই সব হচ্ছে। আপনি হচ্ছেন মাতুল। বাল্যকাল থেকে তাঁকে মানুষ করেছেন, লেখা পড়া শিখিয়েছেন। আপনার সন্তানাদি হল না দেখে, মা আমার তাঁকেই সন্তানের মত মানুষ করেছেন। আপনিই তাঁর বিবাহ দিয়েছেন। এদিকে তাঁর কন্যার বিবাহ নিয়ে জাত যাবার জোগাড় হয়েছে, তিনি বাস্তু বাঁধা দিয়ে পথের ভিখারী হতে বসেছেন। আমি আর কি বলবো হুজুর। আপনাকে কোন কথা বলতে—আমার ক্ষমতা নেই। তবে এ বিপদে তাঁকে বাঁচাতেই হবে। সব কথা ত আপনাকে খুলে বল্লুম।"

মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন—"তা হলে আর দেরী করা উচিত নয়। সে যে ছেলেটীকে কন্যার পাত্র বলে ঠিক করেছে, সে ছেলেটী কেমন?"

"ছেলেটী মন্দ নয়। এণ্টেস্ পাশ করেছে। সামান্য কিছু

ধানজমী আছে। আর শুনতে পাই, সে কলকেতাতেই বাসা ক'রে চাকরী কচ্ছে।"

"তা মন্দ কি। কিন্তু পাছে বিবাহের দিনে ঐ নরাধম কালী-কিশোরটী কোনরূপ কেলেঙ্কারি কর্ত্তে না পারে, তার ব্যবস্থা আমায় কর্ত্তে হবে।"

ভগবান। কিন্তু সে ব্যবস্থা কর্ত্তে গেলে উপস্থিত পাঁচ হাজার টাকার দরকার।

মৃত্যুঞ্জয়। টাকার জন্যে ত কিছু আট্‌কাচ্ছে না। আমি যখন আমার যা কিছু সবই তার নামে লিখে দোব মনে করেছি, তখন টাকার জন্য—আটকাবে না। কিন্তু যদি সে জান্‌তে পারে সে আমিই তাকে এ টাকাটা দিচ্ছি, তা হলে সে হয়তো তা নেবেনা। অতবড় একগুঁয়ে ছেলে আমি আর জীবনে কখনও দেখিনি।"

ভগবান। আমি ত আপনারই বুদ্ধিতেই চালিত হুজুর! আর আপনারই হুকুমের চাকর। আমায় যা করতে বলবেন্, আমি তাইতেই প্রস্তুত।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু প্রায় তিন চারি মিনিট কাল চিন্তার পর বলিলেন, "আমার এই শেষ চেষ্টা। বোধ হয় সে এবার নুয়ে আসতে পারে। তুমি তাকে সাফ্ গিয়ে বল, যে কালীকিশোর তাঁর নামে ডিক্রিজারি করে বিবাহের দিনই তার ভিটা ক্রোক কর্ব্বে। আর তার জামাতারও সেই দশা করবে।"

"কালীকিশোর শুনেছি ভয়ানক লোক! আর তার পুত্রের সঙ্গে রমেশ তার কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করায়, সে যে ভাবে

মরিয়া হয়ে উঠেছে, তাতে সে সবই কর্ত্তে পারে। এরূপ স্থলে রমেশের জাত মান রক্ষা করা আমার খুব কর্ত্তব্য। তবে তুমি প্রসঙ্গক্রমে কৌশলের সহিত আমার কথাটা একবার তুলে দেখো। কি বলে সে, আমি একবার শুনতে চাই। তুমি ফিরে এলে, আমি তার রক্ষার বন্দোবস্ত করবো।"

এই কথা বলিয়া মৃত্যুঞ্জয় বাবু, ভগবানকে তাহার করণীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, সমস্ত কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

পরদিন আহারান্তে ভগবান ভবানীপুর ত্যাগ করিল। বর্দ্ধমানের টিকিট কিনিয়া বাড়ীতে পৌছিল। বলা বাহুল্য, মাসীমাও সেদিন দুই চারিখানা মনের মত তরকারী রাঁধিয়া পরিতোষের সহিত তাহাকে খাওয়াইলেন।

কালীকিশোর রমেশের সেই পত্রখানি পাওয়া অবধি, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। ভগবান চলিয়া গেলে, সে তাহার ভৃত্য রামচন্দ্রকে আদেশ করিল, "একবার দেওয়ানজিকে ডেকে আন্‌তো রামা।"

বলা বাহুল্য, এই তেজারতি কারবার ছাড়া কালীকিশোর একটি ছোট মহল কিনিয়াছিল। কেননা জমিদার হইবার সাধটা তাহার খুবই বেশী ছিল। আর জমিদার হইবার পূর্ব্ব হইতেই, সে "রায় চৌধুরী" এই খেতাবটী ব্যবহার করিত। কিন্তু কালীকিশোর কোন নবাবের আমলে এই খেতাবটী পাইয়াছিলেন, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা গভীর গবেষণা করিলেও তাহার সন্ধান পাইতেন কিনা সন্দেহ!

এই কালীকিশোরের বাড়ীঘরের অবস্থার পরিচয় দিবার অবসর

এ পর্য্যন্ত হয় নাই। পরিচয়টা দিয়া রাখা ভাল। তাহাতে পাঠকের মনের একটা ধোঁকা কাটিয়া যাইবে।

তাহার বাড়ীটি, সদর অন্দর দুইভাগে বিভক্ত। বাহিরের মহলে একটি দপ্তরখানা। দপ্তরখানার পার্শ্বেই, খোদ কালীকিশোরের বৈঠকখানা। উত্তর দিকে আরও দুইটি ছোট ছোট বৈঠকখানা গোছের ঘর। এ দুটী তাহার পুত্র অন্নদাকিশোরই প্রায় ব্যবহার করিত।

ভিতরের মহলে ছয়টি ঘর। ভিতর মহলের এক দিকটা দোতালা। কর্ত্তা দোতালাতেই থাকিতেন। সেই ঘরে খুব বড় একটা "চব্‌সের তালা" লাগান লোহার সিন্দূক। পরের সর্ব্বনাশ করিয়া যে সব টাকা আদায় হইত, তাহা এই সিন্দুকেই থাকিত। ইহা ছাড়া দেওয়ালের গায়ে আর একটি গুপ্ত সিন্দুক ছিল। বোধ হয়, তাহাতেই কালীকিশোরের যথাসর্ব্বস্ব লুকানো থাকিত।

পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁর দুর্দ্দান্তপত্নী তারাময়ী, আর এক বিধবা ভগ্নী। ভগ্নী সেই বাড়ীর সকলেরই "পিসিমা"। অন্নদা তাঁহার চোখের পুতলী। কারণ পিসিমা বালবিধবা। সন্তানাদি না থাকায়, তিনি এই অন্নদাকেই কোলে পীঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। অনেকে এ জন্য বলে, তিনি অন্নদার পরকালটী মাটী করিবার প্রধান উদ্যোগী।

বদ্‌খেয়ালীর জন্য, শ্রীমান অন্নদার যখন টাকার দরকার হইত, তখন এই পিসিমাকে সে মাতার নিকট দৌত্য-কার্য্যে প্রেরণ করিত। অন্নদা "আফিং খাইয়া মরিব" বলিয়া ভয় দেখাইলেই,

পিসিমা তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার কাছে গিয়া, মরা কান্নার,সুর তুলিতেন। কালীকিশোরের পত্নী তারাময়ী, শ্যামাঙ্গী ও স্থূলদেহা। কোন রোগ যে তাঁহার শরীরে আছে বা কখনও হইবার সম্ভাবনা, তাহা ষোল টাকা ভিজিটওয়ালা সিবিলসার্জ্জনেও স্থির করিতে পারিত না। আহারের সময় তিনি পুরাদস্তর আহার করিলেও, ননদিনী 'পিসিমা' আদর জানাইয়া বলিতেন "আ! পোড়া কপাল! অই কি খাবার ছিরি বৌ! ক'দিন তা'হলে টিকবে। অন্নদার বৌ নিয়ে, দুদিন আমোদ-আহ্লাদ করবার সাধ তোমার নেই কি?

পিসিমার এই প্রকারের অযাচিত সহানুভূতিতে তারাময়ী তাঁহার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইতেন। তারাময়ীর সকল কথায় "ডিটো" দিতে সে সংসারে পিসিমা ভিন্ন আর কেহই ছিল না। এজন্য দুজনে বড় ভাব। তার উপর দুজনের মনই জিলিপির প্যাঁচের মত পাকানো। এজন্য বনিয়া ছিলও বেশ।

অন্য পরিবারবর্গের মধ্যে ছিল—দুজন ঝি। তাদের একজন বৃদ্ধা। বহুদিন হইতে সে এই সংসারে আছে। মাসিক বেতন দুইটী টাকা। আর খোরাক পোষাক। তাহার কোন চুলায় স্থান নাই, দুকুলে কেউ নাই, কাজেই সে এই সংসারেই আধপেটা খাইয়া পড়িয়াছিল।

দ্বিতীয় ঝি ক্ষেমঙ্করী। ক্ষেমঙ্করী শ্যামাঙ্গী, যুবতী। কালো হইলে কি হয়, তার চেহারাটী বড় সুডৌল। ক্ষেমঙ্করীর পিতা কালীকিশোরের একজন খাতক। ক্ষেমঙ্করী গতর খাটাইয়া মাহিনার টাকা মাসে মাসে ওয়াশীল দিয়া, ঋণদায়গ্রস্ত পিতাকে ঋণমুক্ত করিতেছে। বলা বাহুল্য, ক্ষেমঙ্করী অন্নদাবাবুর ঘরের

কাজকর্ম্মই বেশী করে। এজন্য তাহার নাম "খোকাবাবুর ঝি।"

বাহিরের মধ্যে একজন দেওয়ান। তাহার নাম রামসদয় পাল। এ ছাড়া ছিল একজন দরোয়ান, দুইজন হিসাবনবীশ ও রামচন্দ্র ওরফে রামা চাকর!

কালীকিশোর বড় মানুষী চাল দেখাইবার জন্য, রামসদয়কে "দেওয়ানজী" বলিয়া সম্বোধন করিত। এই রামসদয় জাতিতে গোয়ালা। বাঙ্গালা সেরেস্তার হিসাব নিকাশি কাজ, সে খুব ভাল বুঝে। তাহা ছাড়া তাহার একটা বদ্‌রোগ, যে সে খাতকের বা প্রজার তহশীলের টাকা জমা করিতে অনেক সময় ভুলিয়া যায়। এ ছাড়া সুঁদের সুদ কসিতে, আদালতের কাজ কর্ম্ম করিতে, আর কেহ কেহ বলে জাল জালিয়তি কার্য্যে সে খুব সিদ্ধ হস্ত। সে বেতন পায় মাসে দশ টাকা। কিন্তু লোকে বলে, দেশে সে পাকা-কোঠা ও জমী জারাত করিয়াছে।

যাক্‌—এ সব কথায় আমাদের কাজ নাই। মনিবের ডাক পড়ায় সদয় পাল তখনই কালীকিশোরের সম্মুখে আসিয়া গরুড়ের মত জোড় হস্তে দাঁড়াইল।

কালীকিশোর তাহাকে কোনরূপ প্রশ্নের অবসর না দিয়া সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল—"দেখ্‌লে রম্‌শা ব্যাটার আস্পর্দ্ধা! ব্যাটার ভিটেমাটি চাটি করবো, তবে আমার নাম কালীকিশোর। আমার বাপের নাম রামকিশোর। আর তস্য পিতা দুর্গাকিশোর।"

এই কথা বলিয়া কালীকিশোর রমেশের সেই পত্রখানি

দেওয়ানজীর হাতে দিয়া বলিল—"পড়ে দেখ এখানি! আর রমেশের বন্ধকীখতের দরুণ, সুদেআসলে কত পাওনা হয়েছে, এখনি তার একটা হিসাব তৈরি করে ফেল গে। ওর মেয়ের বে আমি ঘুরিয়ে দিচ্ছি। বে'র দিন সকালে যাতে দস্তকী পরোয়ানাখানা বেরোয়, তার ব্যবস্থা আমাকে কর্ত্তেই হবে।"

ভগবান, বাহিরে দাঁড়াইয়া এই সব কথা শুনিল। সে কোন কিছু না বলিয়া, পাশ কাটাইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

রাস্তায় আসিয়া ভগবান একটী মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"হা! দয়াময় মধুসূদন! তোমার সংসারে এমন নরাধম পিশাচও তুমি সৃষ্টি করেছো! কন্যাদায় আজ কালকার দিনে যে পিতৃমাতৃদায়ের চেয়েও বেশী! এক গ্রামে বাস, অবস্থাপন্ন পড়্শী। সে কোথা এই দায়ে রমেশ বাবুর সাহায্য করবে, তা না হয়ে তাকে জেলে পোরবার চেষ্টা! ভগবান! তুমি যদি সত্যের হও, তোমার নাম যদি বিপদবারণ, লজ্জানিবারণ হয়, তাহলে রমেশের কোন কষ্টই হবে না, কোন অপমানই হবে না! আমার স্বর্ণ দিদিমণির বিয়ে বিনা ব্যাঘাতে হয়ে যাবে। না—এর একটা বন্দোবস্ত আজই আমার কর্ত্তে হলো।"

"রমেশবাবুকে এখনি গিয়ে এ সংবাদটা দিয়ে আস্‌বো কি? না—মিছে মিছে তাঁর ভাবনা বাড়িয়ে কি হবে?" এই কথাগুলি বলিয়া ভগবান অন্য পথ ধরিল। দুই তিন খানি মাঠ পার হইয়া সে নিজ বাটীতে আসিল। মাসীমার নিকট আহারাদি করিয়া সেই দিন অপরাহ্নে সে ভবানীপুরে চলিয়া গেল। ভবানীপুরে

মৃত্যুঞ্জয় বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করার ফল পাঠক পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে জানিয়াছেন।

যে মৃত্যুঞ্জয় বাবু আমাদের উপন্যাসের এই ঘটনার সঙ্গে এতটা বিজড়িত, তাঁহার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

রমেশের মাতুল এই মৃত্যুঞ্জয়বাবু—আগে ভাগলপুরে ওকালতী করিতেন। তাঁহার পশার যথেষ্ট ছিল। ভবানীপুরে তাঁহার আদি-নিবাস। এই ওকালতী কার্য্যে প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করিয়া, তিনি একজন গননীয় ধনী হইয়া উঠেন। এখন তিনি কর্ম্মময় জীবনের অবসানে, ভবানীপুরে আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন।

তাঁহার পৈত্রিকভিটায় অবস্থিত পুরাণো বাড়ী খানি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সম্পূর্ণ নূতন ভাবে তিনি একখানি সাহেবী পছন্দের দ্বিতল বাড়ী তৈয়ারি করিয়াছিলেন। আর সেই বাটীতেই বসবাস করিতে-ছিলেন। জনপ্রবাদ এই, তাঁহার নগদ টাকা যথেষ্ট, জমীদারীর আয়ও প্রচুর। তবে দুঃখের বিষয় এই, তাঁহার পুত্র সন্তানাদি হয় নাই। এক কন্যা জন্মিয়াছিল বটে, কিন্তু সে সুতিকাগৃহেই ইহলীলা সম্বরণ করে।

আমাদের রমেশচন্দ্র, এই মৃত্যুঞ্জয় বাবুর ভাগিনেয়। রমেশের পিতা প্রকারান্তরে ঘরজামাই ছিলেন। তিনি আলিপুরের আদালতে নকল—নবীশের কাজ করিতেন। কাজেই দেশ হইতে কর্ম্মস্থলে নিত্য যাতায়াত, তাঁহার পক্ষে একাবারেই অসম্ভব। এজন্য তিনি ভবানীপুরে শ্বশুর বাড়ীতে থাকিয়াই বিষয়কর্ম্ম করিতেন।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু ওকালতী পাশ করিয়া, দিন কতক আলিপুরে

প্র্যাকটিশ্ করেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন সুবিধা না হওয়ায় তাঁহার এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর প্ররোচনায়, তিনি ভাগলপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করিতে যান। বলাবাহুল্য, তাঁহার এই বন্ধু ভাগলপুর প্রবাসী। মা কমলা, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিলেন। ওকালতী ব্যবসায়ে দিন দিন তাঁহার পসার জমিতে লাগিল। বছর দুই একের মধ্যে তাঁহার নাম মহকুমার চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

রমেশচন্দ্রের তখন পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। মাতুলও বিদেশে। এজন্য তিনি তাঁহার মাতার ও দিদিমার রক্ষকরূপে ভবানীপুরের বাটীতে থাকিতেন ও পড়াশুনা করিতেন।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু, পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থলে বাস করিতে লাগিলেন। সংসার খরচের জন্য, তিনি প্রতিমাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া রমেশের নামে মনিঅর্ডার পাঠাইতেন। আর তার লেখা/পড়ার জন্য আলাহিদা দশটী টাকা তাহার পর সপ্তাহে আসিত।

রমেশচন্দ্র বাল্যকাল হইতেই অবাধ্য ও দুর্দ্দান্ত ছিলেন। মা, দিদিমা কিম্বা পিতা কাহাকেও তিনি ভয় করিতেন না। তবে ভয় করিতেন, কেবল এই মাতুল মৃত্যুঞ্জয়কে।

মৃত্যুঞ্জয় যখন ভাগলপুরে চলিয়া গেলেন, তখন রমেশ বড়ই বাড়াইয়া তুলিল। তাহাদের পাড়ায় একটী জিম্‌নাষ্টিকের আখ্‌ড়া ছিল। সে তাহার সেক্রেটারি হইল। পড়াশুনায় তাহার মন ততটা রহিল না। এই জন্য সেবার সে এণ্ট্রান্স ফেল হইল। তখন ম্যাট্রিকিউলেসানের সৃষ্টি হয় নাই।

এই সময়ে জ্বর-বিকারে রমেশের পিতার মৃত্যু হয়। অশৌচান্ত

না হইতে হইতে, রমেশচন্দ্রের সতীসাধ্বী জননী স্বামীর পশ্চাৎগামিনী হয়েন। ভগ্নি-পতির শ্রাদ্ধাদির জন্য, মৃত্যুঞ্জয়কে সপরিবারে কর্ম্মস্থল ছাড়িয়া দেশে আসিতে হয়।

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইয়া গেলে, মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার মাতা ও ভাগিনেয়কে লইয়া পশ্চিমে চলিয়া যান। ভবানীপুরে বাড়ীখানি নামমাত্র ভাড়ায় এক আত্মীয়ের জিম্মায় থাকিল।

রমেশচন্দ্র একই সময় পিতৃমাতৃহীন হওয়ার, দিদিমার বড়ই আদরের হইয়া উঠিল। মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে ভাগলপুরের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

এই মাতুলের ভয়েই রমেশচন্দ্র এণ্ট্রান্সটা পাশ করিল। কিন্তু পড়াশুনায় তাহার আর তেমন মন রহিল না। সে রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত আড্ডায় থাকিত। সে আড্ডা অবশ্য বদ্‌মায়েসীর আড্ডা নয়, তবে তাহারই মত জিম্‌নাষ্টিক্ করা স্কুলের ছেলেরা মিলিয়া, এই আড্ডাটার পত্তন করিয়াছিল। এ আড্ডায় ভারত সঙ্গীত চলিত, দুর্ব্বল বাঙ্গালীর বাহুবল বৃদ্ধির উপায় কি, এসম্বন্ধে বক্তৃতা চলিত। আর আড্ডাটার নামকরণ হইয়াছিল—"শক্তি-নিকেতন।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি মৃত্যুঞ্জয়ের সন্তানাদি হয় নাই। একমাত্র কন্যা জন্মিয়া সে—সুতিকাগারেই নষ্ট হয়। কাজেই মৃত্যুঞ্জয়ের ষোল আনা স্নেহ, এই ভাগিনেয় রমেশের উপরই ছিল। রমেশ উকীল হইবে—তিনি এইরূপ একটা আশাই করিয়াছিলেন। রমেশের মাতুলানীও তাহাকে খুবই স্নেহ করিতেন। মাতুল ও

যথেষ্ট স্নেহশীল ছিলেন। তবে মাতুলানী ও দিদিমার স্নেহ, তাঁহাদের প্রতিকার্য্যেই একটু অতিরিক্ত ধারায় ফুটিয়া উঠিত। আর মৃত্যু-ঞ্জয়ের বহিঃপ্রকৃতি অতি রুক্ষ। পাহাড়ের বুকের মধ্যে যেমন স্নিগ্ধ ঝরণা লুকানো থাকে, মৃত্যুঞ্জয়ও বাহ্যিক রুক্ষ প্রকৃতির অন্তরালে, সেইরূপ তাঁহার স্নেহকে ঢাকা দিয়া রাখিতেন। এজন্য দুর্দ্দান্ত রমেশ অনেক সময় ভাবিত, তাহার মাতুল তাঁহাকে ততটা স্নেহ করেন না।

রমেশের মাতুলানী একদিন তাঁহার শ্বাশুড়ীকে বলিলেন, "দেখ মা! আমার মনে একটা মতলব এসেছে। সেটা কর্ত্তে পাল্লে' বোধ হয়, রমাটা ঠাণ্ডা হতে পারে।"

মৃত্যুঞ্জয়ের মাতা তাঁহার পুত্রবধূর মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন—"কি মতলব মা? তা—যাই কর ও কি আর ভাল হবে? বাপ-মা খেকো ছেলে। কাজেই আমরা কিছু বলিনি। দেখছি 'ওর লেখাপড়া হবে না। চিরদিনই কষ্ট পাবে। মৃত্যুঞ্জয় চেষ্টা কল্লে' কি হবে বল?"

মাতুলানী বলিলেন—"আমাদেরও ত একটা সন্তান হলো না। ছেলে বেলা থেকে কোলে পিঠে করে ওকে মানুষ করেছি। আমার ষোল আনা সন্তানের মায়া, ওর উপরই পড়েছে। আমার ইচ্ছে যে রমার বে দিয়ে একটী বৌ নিয়ে ঘরকন্না করি।"

দিদিমারও বোধ হয়, নাতবৌ দেখিবার একটা ইচ্ছা হইয়া ছিল। এজন্য তিনি এ কথায় পূর্ণ সম্মতি দিয়া বলিলেন—"কথাটা বেশ কথা। তা—মৃত্যুঞ্জয়কে বল্‌বো কি।"

মাতার অনুরোধ, মৃত্যুঞ্জয় কখনই উপেক্ষা করিতেন না।

তাহার উপর তাঁহার পত্নীর সুপারিশ। মৃত্যুঞ্জয় ইহাতে অসম্মত হইলেন না।

বাঙ্গালীর ছেলের পাশকরা আট্‌কায়, সচ্চরিত্র হওয়া আট্‌কায়, সহজে চাকরীলাভে বাধা পড়ে, কিন্তু বিবাহ আট্‌কায় না। সুতরাং ভাগলপুর প্রবাসী, এক মধ্যবিত্ত কায়স্থের সুন্দরী কন্যা শ্রীমতী কল্যাণীর সহিত রমেশচন্দ্রের শুভ পরিণয় হইয়া গেল।

বিবাহের পর রমেশ, এলে পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার মেজাজ্‌টাও একটু ঠাণ্ডা হইল। দিন কতক বেশ চলিয়া গেল। সে পাশও হইল।

কিন্তু তাহার পরই আবার পূর্ব্বের অবস্থা। রমেশ পুনরায় পড়াশুনায় অমনোযোগী হইল।

পড়াশুনায় অমনোযোগী হওয়ার জন্য, মাতুল মৃত্যুঞ্জয় প্রায়ই রমেশকে বকিতেন। সুতরাং রমেশ মাতুলের ভয়ে আবার দিন কয়েকের জন্য লেখাপড়ায় মনোযোগ দিত।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল। মৃত্যুঞ্জয়ের এক ধনী হিন্দুস্থানী মক্কেলের নাম লালা কংসনারায়ণ। কংসনারায়ণের একমাত্র সন্তান বদ্‌রীনারায়ণ। এই বদরীনারায়ণ রমেশের সহপাঠী। সেও ইহাদের জমায়তের আড্ডা "বেঙ্গলী ক্লাবে" মাঝে মাঝে আসিত।"

একদিন কথায় কথায়, একটা তর্ক-প্রসঙ্গে এই শান্তিময় ক্লাব-গৃহে চায়ের পিয়ালায় তুমুল তুফান উঠিল। তর্কটা হইতেছিল, বাঙ্গালীর বাহুবল লইয়া। বদ্‌রীনারায়ণ বাঙ্গালীকে ভীরু ও কাপুরুষ বলায় রমেশ ও তাহার বাঙ্গালী বন্ধুগণ ভয়ানক উত্তেজিত

হইয়া উঠিল। রমেশচন্দ্র তাহাদের অগ্রণী। সুতরাং রমেশের সহিত বদরীনারায়ণের ভীষণ বাকযুদ্ধ বাধিল। আর তার পরিণামে রমেশচন্দ্র বদরীকে যথেষ্ট প্রহার করিলেন। সে প্রহারের ফলে তাহার দেহ হইতে শোণিতপাত হইল!

লালা কংসনারায়ণ একজন ধনীলোক। তাহার উপর তাহার একমাত্র আদরের ছেলে বদরীর এই দুর্দ্দশা। এজন্য সে রমেশ ও তাহার বন্ধুবর্গের নামে ফৌজদারী কেশ্ করিল।

মৃত্যুঞ্জয় যখন শুনিলেন, যে তাঁহার গুণধর ভাগিনেয় অকারণে, একটা দাঙ্গা বাধাইয়াছে—আর তাহার ফলে, তাহার প্রধান মক্কেলটী হস্তচ্যুত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন তিনি রমেশের উপর বড়ই ক্রুদ্ধ হইলেন।

সেইদিন রমেশকে ডাকিয়া তিনি যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। রমেশ যদি একটু ঠাণ্ডাভাবে কথা কহিত, তাহাহইলে ব্যাপারটী অতি সহজেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু সে তাহা করিল না। মাতুলের মুখে মুখে সমান ভাবে উত্তর করায়, মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে বলিলেন, "তুই জন্মের মত দূর হইয়া যা! আমি আর তোর মুখ দেখিতে চাহি না। এ বাড়ীতে ঢুকিলেই তোরে পয়জার পেটা করিব।"

কথাটা রমেশের প্রাণে বড়ই সাংঘাতিক আঘাত করিল। সে সেই রাত্রেই, কাহাকে কিছু না বলিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। দুই চারিদিন কোন বন্ধুর আবাসে থাকিয়া, সে মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করিল—"জীবন থাকিতে মাতুলের আশ্রয়ে আর যাইব না। পিতা ত যা হয় একটু ভিটা করিয়া গিয়াছেন। সেইখানে পিসিমার

স্নেহাঞ্চলে লুকাইয়া থাকি। অন্নাভাবে মরিতে হয়, পথে পথে ভিক্ষা করিতে হয়, তাহাও স্বীকার। তবু ধনী মাতুলের দ্বারস্থ হইব না।"

এ জগতে সকল লোকই যেমন জীবনে এক একটা মহাভুল করিয়া ফেলে, রমেশ ও সেইরূপ করিল। সে বহুদিন পরে তাহার পৈতৃক ভিটায় পদার্পণ করিল। স্নেহময়ী পিসিমাও, যুগান্ত পরে রমেশকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন।

এদিকে অনুতপ্ত মৃত্যুঞ্জয় বাবু, সহরের নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া যখন রমেশের কোন সন্ধান পাইলেন না, আর তাহার বৃদ্ধমাতা ও পত্নী এজন্য তাহাকে যথেষ্ট অনুযোগ করিলেন, তখন তিনি রমেশের সন্ধানের জন্য স্বতঃপরতঃ বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, রমেশের নামে আনীত সেই ফৌজদারী মোকদ্দমাটী তিনি লালা কংসনারায়ণকে অনেক বুঝাইয়া খারিজ করাইয়া লইয়াছিলেন।

তিন চারি সপ্তাহ পরে মৃত্যুঞ্জয় সংবাদ পাইলেন, রমেশ এখন তাহার পৈত্রিক ভিটায় বাস করিতেছে। সওদাগরী আফিসে সে একটা চাকরী যোগাড় করিয়াছে, আর তাহার পত্নীকে ভাগলপুর হইতে নিজ বাটীতে লইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, মৃত্যুঞ্জয় এ সংবাদটী রমেশচন্দ্রের শ্বশুরের নিকটই পাইয়াছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় মনে ভাবিলেন—রাগ পড়িলেই সে আবার আমার কাছে আসিবে। কিন্তু ভবিতব্য তাহা হইতে দিল না। রমেশের কিছুতেই রাগ পড়িল না।

মৃত্যুঞ্জয় অনুশোচনা পূর্ণ হৃদয়ে, রমেশকে দুই চারি খানি পত্র

লিখিয়াছিলেন কিন্তু রমেশ তাহার জবাব দেন নাই। ভাগিনেয়ের কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন। রমেশ লোককে বলিয়া দিল—"যদি আমার একটুও আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান থাকে, আমি জীবন থাকিতে তাঁহার পদানত হইব না। তবে ভবিষ্যতে যদি কখনও নিজের অন্নসংস্থান করিতে পারিয়া অবস্থার উন্নতি করিতে পারি, তাহা হইলে একদিন গিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া আসিব।"

এ হইতেছে আট বৎসরের পূর্ব্বের কথা। এই আট বৎসরে, পূর্ব্বোক্ত সওদাগরি আফিসের চাকরীতে, রমেশ যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। তাহার স্বভাবচরিত্রও অনেকটা বদ্‌লাইয়া গিয়াছিল। গুণশীলা রূপসী পত্নী কল্যাণী, তাহার মনের সে উগ্রতেজময় ভাবটির ক্রমশঃ সমতা করিয়া আনিতেছিল।

জগতের নিয়মই এই, আর প্রত্যক্ষ ঘটনাক্ষেত্রেও আমরা দেখিয়াছি, অতি দুর্দ্দান্ত যে, সে কোনও ব্যাপারে একটা প্রচণ্ড ঘা খাইলে, অতি শান্ত হইয়া পড়ে।

রমেশের পিতার বড় ইচ্ছা ছিল, যে তিনি অন্নপূর্ণা পূজা করেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার সে ইচ্ছা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। রমেশের বেতন তিন চারি বৎসরে একশত টাকায় দাঁড়াইল। আর এই অফিসের কাজে উপরি পাওনাও কিছু ছিল। তখন রমেশের কন্যা স্বর্ণপ্রতিমা তিন বৎসরের।

অবস্থানুযায়ী জাঁকজমকের সহিত, পিতার অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করিবার জন্য রমেশ চারি বৎসর অন্নপূর্ণাও জগদ্ধাত্রী পূজা করিল। এই সকল ব্যাপারে সে বেশ যোত্রপন্নের মতই খরচপত্র করিতে

লাগিল। অতি পূর্ব্বে সে পৈতৃক বাসভবনটী মেরামত করিয়া তাহা নূতন মূর্ত্তিতে দাঁড় করাইয়াছিল। তারপর এই ব্যয়বাহুল্য কর ক্রিয়া কলাপানুষ্ঠানে সে গ্রামের সকলেরই আদর ও সম্মানের পাত্র হইয়া দাঁড়াইল।

এই সমস্ত ক্রিয়া উপলক্ষে, সে তাহার মাতুলানী ও দিদিমাকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিল, মাতুলকেও বিনয় করিয়া পত্র লিখিয়াছিল। কিন্তু রমেশ নিজে তাঁহাদের বাড়ীতে যান নাই বলিয়া, মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার পরিবারবর্গকে রমেশের বাটীতে পাঠান নাই। বলা বাহুল্য, অভিমানী রমেশ ইহাতে যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল!

যাই হোক, এ সংসারে কাহারও চিরদিন সুখে যায় না। সুখের পরেই দুঃখের দিন আসে। কি ঘটনায় রমেশের চাকরীটি যায় পাঠক তাহা জানেন। তারপর হইতেই তাহার দুঃখের দিন আরম্ভ হইল।

রমেশচন্দ্র লোকমুখে কাণাঘুষায় শুনিলেন, যে কালীকিশোর তাহার উপর ভয়ানক রাগিয়া গিয়াছে ও তাহার নামে নালিশ করিয়া দস্তক করিবার মতলবে আছে।

এ ক্ষেত্রে, রমেশ যে কি ব্যবস্থা করিবেন তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। বিবাহের দিনে যদি এই সব কেলেঙ্কারি ঘটে,তাহাহইলে তখনও তাঁহার যে মান-সম্ভ্রম-টুকু আছে, তাহা একেবারে লোপ পাইবে।

সে দিন রবিবার। রমেশ আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছেন, আর বৈঠকখানার জানালার পার্শ্বে বসিয়া, অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথে লোকজনের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন।

এমন সময়ে তাঁহার আফিসের অদ্বৈতচরণের সহিত তাঁহার চোখাচোখী হইল। অদ্বৈত ইচ্ছা করিয়াই হউক বা নিজের কোন কাজের জন্যই হোক, সেই পথ দিয়া একটু দ্রুত যাইতেছিল।

কালীকিশোরের গুণধর পুত্র অন্নদার সহিত, অদ্বৈতের যে একটা মাখামাখি ভাব আছে, রমেশচন্দ্র একথা পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। অন্নদার বাগান-বাড়ীতে স্থাপিত "অন্নদা ড্রামাটিক" ক্লাবের একজন নিয়মিত সদস্য এই অদ্বৈত। আর এই অদ্বৈতচরণ শনিবার শনিবার বি-হাইভ, একৃসা ইত্যাদি শ্রীমান অন্নদাকিশোরের ক্লাবের জন্য, কলিকাতা হইতে আমদানী করিত।

অবশ্য ভিতরের এসব গুহ্য কথা রমেশ জানিতেন না। রমেশের সহিত অদ্বৈতের চোখাচোখী হইবামাত্র, অদ্বৈত যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া গতি সংযত করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এরূপ অপ্রস্তুত ভাবের কারণ, এই অদ্বৈতচরণ এদানীং আর রমেশের সহিত বড় একটা দেখা শুনা করিত না।

অদ্বৈতকে দেখিয়াই, রমেশচন্দ্র হস্তেঙ্গিতে ভিতরে আসিতে বলিলেন। অদ্বৈত এবার আর পাশ কাটাইতে পারিল না।

রমেশচন্দ্র একটু বিদ্রুপপূর্ণ হাস্যের সহিত বলিলেন—"কি হে অদ্বৈত! আগে আগে তুমি দিনের মধ্যে সাতবার এখানে আসতে এখন যে ডাকিয়া পাঠাইলেও দেখা পাই না। চোখাচোখী হইলেও যে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাও।"

অদ্বৈত তাহার পূর্ব্ব অভ্যাস ক্রমে বলিল—"আর বড়বাবু!

আফিসে আপনার আমলে ছিল রাম রাজত্ব। এখন হেমন্ত বাবু যা করে তুলেছেন, তাতে দেখ্‌ছি আফিসে টেকা ভার!"

এই হেমন্তের ও আফিসের কথাগুলা শুনিতে, রমেশেচন্দ্র বড়ই নারাজ। এ সব কথা তখন যেন তাঁহার বিষের মত লাগে। সুতরাং তিনি একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন—"ওসব বাজে কথা ছাড়িয়া দাও। এখন তুমি কেমন আছ বল? তোমার কিছু মাহিনা বাড়িয়াছে কি?"

অদ্বৈত বলিল—"মাহিনা বাড়া চুলোয় যাক্, এখন চাকরীটা বজায় থাকিলেই বাঁচি। জানেন ত হেমন্ত কেমন ভয়ানক লোক!"

রমেশ ববিলেন—"হেমন্ত যে জগতে বিরাজ করিতেছে, আমি এখন তাহার বাহিরে। ও সব প্রসঙ্গ এখন আমার পক্ষে বিরক্তি-কর। আমি আমার পুরাণো সাহেবকে পত্র লিখিয়াছি। অবশ্য তোমাদের অফিসের সাহেব নয়। আমার প্রথম মনিব ডকৃওয়ার্থ সাহেব। এখন তিনি ট্রেড্‌স্ এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী। তিনি বলিয়াছেন, অফিসিয়াল ইয়ার ক্লোজ হইলেই, আমাকে দেড়শত টাকা মাহিনার চাকরি দিবেন।"

অদ্বৈত একথা শুনিয়া একটু চমকিত হইয়া মনে মনে কি ভাবিল। কিন্তু হেমন্তের জন্য সে যে একটা নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া বড়ই খুসী হইল।

তারপর প্রকাশ্যে বলিল—"শুনে খুব খুসী হলুম বড়বাবু! যাক্—যখন আপনার সঙ্গে দেখা হল, আর আপনি আমার দের

উপকার করেছেন, তখন একটা গোপনীয় সংবাদ আপনাকে জানিয়ে যেতে ইচ্ছা করি।”

রমেশ। কি সংবাদ বল দেখি?

অদ্বৈত। জানেন ত ঐ কালীকিশোরের ছেলে অন্নদার সঙ্গে আমার একটু মাথামাখি ভাব। সে কাল আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল—

রমেশ। কি বল্‌ছিল? আমার নামে পাওনা টাকার জন্য তার বাপ নালিশ করবে! এই তো!

অদ্বৈত। আজ্ঞে খালি তাই নয়। কথাটা আপনি আমার মুখ থেকে শুনেছেন, একথা যদি প্রকাশ না করেন, তাহ'লে আরও কিছু নূতন সংবাদ বলতে পারি।

রমেশ। কি বল দেখি?

অদ্বৈত। কালীকিশোর লোকটা বড়ই সাংঘাতিক। সে আপনার কাছে যে পাঁচহাজার টাকা পাবে, তার জন্য একতরফা ডিক্রী করবে। তার পর ঠিক বিবাহের দিনে দণ্ডক বার করবে। ওর ইচ্ছা আপনার কন্যার বিবাহ পণ্ড করা, আর আপনাকে জেলে দেওয়া।

রমেশচন্দ্র কথাটা শুনিয়া বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার মনে একটু ভয়ও হইল। কিন্তু তিনি মনের ভাব চাপিয়া যথিয়া বলিলেন,—“যদি ইহাই নারায়ণের ইচ্ছা হয়, তাহাহইলে আমি ত তাহাতে বাধা দিতে পারিব না। কথায় বলে—“রাখে কৃষ্ণ মারে কে?” চাকরি যাইবার পর অনেক সাংঘাতিক ব্যাপারই ত এ

জীবনে ঘটিয়া গিয়াছে। কই এখনও ত একবারে রসাতলে যাই নাই। আমার মত গরীবের সহায় সেই দীনবন্ধু ভগবান। তিনিই আমাকে এ বিপদে রক্ষা করিবেন।”

অদ্বৈত মনে ভাবিয়াছিল—রমেশচন্দ্র এই সংবাদে বড়ই দমিয়া পড়িবেন। কিন্তু যখন সে দেখিল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইল না, রমেশের প্রাণে বেদনা দিয়া সে একটু আনন্দভোগ করিতে পারিল না, তখন সে বলিল—“তা বই কি বড়বাবু! আপনি লোকের ভালই করে এসেছেন, আপনার মন্দ কেন হবে? তবে লোকটা বড় বদমায়েস্। এই জন্যই আপনাকে সাবধান করে দিলুম।”

তখন ভরা সন্ধ্যা। অদ্বৈত উঠিয়া দাঁড়াইল। রমেশ মনে মনে অদ্বৈতকে ঘৃণা করিতেন, কেননা পরে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহার চাকরী যাওয়ার মূল কারণ এই অদ্বৈত ও হেমন্তের ঘোর চক্রান্ত।

১১

অদ্বৈত চলিয়া গেলে রমেশচন্দ্র আবার কলিকাটী পাল্‌টিয়া সাজিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—“অদ্বৈত যাহা বলিল তাহা যদি সত্য হয়, তাহাহইলে আত্মরক্ষার উপায় কি? টাকার যোগাড় হইলেই এ সব হাঙ্গাম মিটিয়া যায়। কিন্তু টাকাতো বড় কম নয়? পাঁচ ছয় হাজার টাকা এখন পাই বা কোথায়? তা আমার অদৃষ্টে যা হয় হোক। দেনার দায়ে আমাকে জেলে যাইতে হয়, তাহাও স্বীকার—তবুও আমি শয়তান কালীকিশোরের প্রস্তাবে সম্মত

হইব না। আমার আদরিণী স্বর্ণপ্রতিমাকে এক পিশাচ বর্ব্বরের হাতে দিতে পারিব না।"

"আর কেন অভিমান! পোড়া মনের এত দম্ভ কেন? যিনি আমায় সন্তানের মত মানুষ করিয়াছেন, একদিন আমার হিতের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন, মুখে খালি বলিয়াছিলেন—"আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা" সেই দেবপ্রতিম মামার উপর আমার এত রাগ কেন? তাঁর চরণে ধরিয়া এখনও ত আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে পারি। তাহাহইলে ত আমার এই ভাবনা সমুদ্রের একটা কুল কিনারা হয়।"

"না-না—তা পারিব না! আমার এ উদ্ধত অবাধ্য চিত্ত, আরও হয়রান্ হউক। আরও জব্দ হউক। আজ যদি আমার চাকরী থাকিত, সুখের দিন থাকিত, তাহাহইলে তাঁর কাছে একটা দম্ভভরা বুক লইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম। কিন্তু এখন আমার দুঃখের দিন আসিয়াছে। দারিদ্র আমায় পীড়ন করিতেছে। আমি যোত্রহীন দেনদার। নিষ্ঠুর উত্তমর্ণের করুণার ভিখারী। অতি হতভাগ্য জীব। এ অবস্থায় মলিনবসনে, মলিনবদনে, তাঁহার কাছে দাঁড়াইলে, তিনি ভাবিবেন—দারিদ্র আমার দর্পচূর্ণ করিয়াছে। আমি দুঃখের জ্বালায় মানের দায়ে তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছি। না—না, এ জীবনে তাঁহার কাছে আর আমার যাওয়া হইবে না।"

এমন সময়ে বৈঠকখানার বাহিরের দালানে রমেশচন্দ্র কাহারও পদশব্দ পাইলেন। আর সেই শব্দের বিরামের সঙ্গে সঙ্গে, ভগবান

তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। এখন আর ভগবানের সে জামা জুতা পরা সামাজিক ভদ্রলোকের মুর্ত্তি নাই। তাহার চুল উস্ক খুস্ক। পরিধানে আধময়লা কাপড়। পদদ্বয় পাদুকাবিহীন।

ভগবানকে দেখিয়া রমেশচন্দ্র সহাস্যমুখে বলিলেন—"এস ভগবান। তিন দিন তোমায় দেখি নাই। মনটা বড় চঞ্চল হইয়াছে। আর তোমার হাত দিয়া যে চিঠিখানা পাঠাইয়াছিলাম, তাহার সঠিক সংবাদ জানিবার জন্যও মনটা বড় ব্যাকুল হইয়া আছে।"

ভগবান বলিল—"বড়বাবু! সে চিঠির জবাব, ঐ সয়তান কালীকিশোর লিখিতভাবে দেয় নাই বটে, কিন্তু তার মুখের ভাব আর সে সময়ের কথাবার্তা থেকে যা বুঝেছি, তাতে ব্যাপার বড় ভাল বোধ হচ্ছে না।"

রমেশ। তা আমি আগেই শুনেছি। কিন্তু এখন করা যায় কি?

ভগবান। কিছুই কর্ত্তে হবেনা। কেবল নারায়ণকে ডাকুন। দিদিমণির বিয়ের জন্য যে চারিশত টাকার দরকার, তা আমি জোগাড় করে এনেছি।

রমেশ। কোথা পেলে তুমি এ টাকা?

ভগবান। আমার এক মাসী আছেন, তিনি তেজারতির কাজ করেন, কিন্তু স্থদ নেন না। তাঁর কাছ থেকেই এই টাকাটা ধার করেছি৷ এই করারে এনেছি, যে আপনি আপনার সময় মত শোধ করবেন। তবে মেয়েমানুষ কিনা, তাঁকে একখানা বাঙ্গলায় হ্যাণ্ডনোট লিখে দিবেন।

রমেশচন্দ্র মনে মনে ভগবানের বৃদ্ধা মাসীকে অনেক ধন্যবাদ

দিলেন। এক দরিদ্রা বিধবা স্ত্রীলোক, আর এই কালীকিশোর, এদের দু'জনের মধ্যে কত পার্থক্য তাহাও বুঝিলেন।

তারপর তিনি মনে মনে ভাবিলেন—"যখন ঋণ বলিয়া টাকাটা লইতেছি, তখন তাহা গ্রহণ করায় আপত্তি কি? সত্যই কি নারায়ণ আমাকে এমন শুভ দিন দিবেন না, যেদিন আমি এই ঋণটা শোধ করিতে পারিব? ট্রেডস্ এসোসিয়েসনের বড়সাহেব ত আমায় আশা দিয়াছেন, আর দুইমাস বাদে তাঁহার বৃদ্ধ হেডক্লার্ক অবসর লইলে আমায় সেই চাকরিটি দিবেন। যদি এই চাকরী পাই, তাহা হইলে তিনমাসে যে এই বৃদ্ধার ঋণ শোধ করিয়া ফেলিব।"

তারপর তিনি ভাবিলেন—"এই যে ভগবান, যাহাকে লোকে পাগল বলে, সে আমার হাতে যে টাকাটা আনিয়া দিল, তাহা তার নিজের সঞ্চিত ধন নয় তো? ভগবান ত কখনও মিথ্যাকথা বলে না। তাকে খোলসা ভাবে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিনা কেন? সে কি ব'লে।

রমেশচন্দ্র ধীরভাবে ভগবানের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"ভগবান! তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো! সত্য ক'রে বলবে কি?"

ভগবান। কি কথা বড়বাবু?

রমেশ। বলি এ টাকাটা তোমার নিজের জীবনের সঞ্চয় নয় তো?

ভগবান। বড়বাবু! বুঝেছি আপনার মনের কথা। আচ্ছা আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আগে তার জবাব দেন দেখি।

রমেশ। বল ?

ভগবান। আপনি যখন চাকরী কর্ত্তেন, তখন মাসে কত টাকা রোজগার কর্ত্তেন ?

রমেশ। একশত টাকা মাহিনা পেতুম বটে, কিন্তু সাহেবদের জানিত একটা উপরি আয়ও ছিল। সে আয়টা দালাল আর কণ্ট্রাকটারদের কাছেই হোত। এতে মাসে আমার ত্ব'শো টাকা কখনও বা আড়াইশো পর্য্যন্ত রোজকার হয়েছে।

ভগবান। বেশ কথা বড়বাবু! এখন বলুন দেখি, আপনি এই মোটা মাইনের চাকরী করে কত টাকা জমিয়েছেন ?

রমেশ। জমানো চুলোয় যাক, পাঁচ ছয় হাজার টাকার ঋণ আমার ঘাড়ে চেপে রয়েছে। সবই ত তুমি জান।

ভগবান। তাই যদি হয়, তা হলে একবার ভেবে দেখুন, যে ভগা পাগলার আশ্রয়স্থান নেই, যে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়, অথচ কারুর কাছে একটী পয়সাও ভিক্ষে করে না, সে কি কখন চারশো টাকা জমাতে পারে ? তবে কেন যে এ কাজটা কল্লুম, তা আপনাকে খুলে বলি! আপনি আর আমায় মা কল্যাণী, আমাকে যতটা স্নেহ আদর করেন, এ গ্রামে আর কেউ তেমন করে না। মা সে দিন আমাকে তাঁর নিজের ভাতগুলি ধরে দিয়ে, উপোস করে দিন্ন কাটিয়েছেন। এ মার সন্তান হয়ে আমি যদি তাঁর কোন কাজে না লাগ্‌তে পারি তা হলে আমায় ধিক্, এই ভেবেই মাসীর বাড়ী থেকে এই টাকাটা এনে দিয়েছি। কেন না, আপনার সঙ্গে সেই শয়তান কালীকিশোরের যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, সবই

আমি নিজের কাণে শুনেছি! কথাগুলো আমার প্রাণে বড়ই আঘাত করেছে। বড়বাবু! আমি আপনার সন্তান-তুল্য। কোন দ্বিধা সংকোচ করবেন না। আমি নিশ্চয়ই বল্‌ছি, শীঘ্রই আপনার সু-সময় হবে, এ টাকা আপনি শীঘ্র শোধ করতে পারবেন।

ভগবান চারিশত টাকার নোট গুণিয়া, রমেশচন্দ্রের হাতে দিল। রমেশ সেগুলি তাঁহার জামার পকেটে রাখিয়া বলিলেন—"আজ যদি আমার মাতুল মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, যিনি বাল্যকাল হইতে আমায় সন্তানাধিক স্নেহে পালন করিয়াছেন, এই টাকাটা আমাকে দিতে আসিতেন, তাহাহইলে বোধ হয় আমি লইতাম না! তোমার কাছে আমার কোন মান, অপমান বা অভিমান নাই!"

ভগবান যে কথাটা তুলিবার জন্য উপযুক্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল, সে কথাটা রোগীর মুখে আপনি ব্যক্ত হইয়াছে শুনিয়া, সে বলিল—"বড়বাবু! আপনার মামা আছেন, তা ত একদিনও বলেন নি। কোন মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী? যিনি ভবানীপুরে থাকেন? আর সম্প্রতি ২২নং এর তালুক কিনেছেন।

রমেশ। হাঁ তিনি ভবানীপুরে থাকেন বটে! জমিদারী কিনে-ছেন কিনা তা জানিনি।

ভগবান। তাঁর মত উন্নতপ্রাণ জমিদার খুব কম আছে যে বড়বাবু! আমাদের পাশের গাঁ থেকেই তাঁর জমিদারীর সীমা আরম্ভ। প্রজাদের ভালর জন্য তিনি না করেছেন এমন কাজই নেই। গেজেটে তাঁর নাম না উঠ্‌লে, কিম্বা খপরের কাগজে ঢাক

না বাজলেও, তিনি তাঁর জমিদারীর অনেক গ্রামে বড় বড় পুকুর কাটিয়ে দিয়েছেন, স্কুল করে দিয়েছেন। আহা! প্রাতঃস্মরণীয় লোক যে তিনি! তা আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন না কেন?

রমেশচন্দ্র এ কথার যে কি উত্তর করিবেন, তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। এই দুঃখের দিনে, সেই স্নেহময় মাতুলের কথা সহস্রবার তাঁহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিত। কিন্তু বহুকালের অপমানজনিত ক্ষতটা তখন পনেরো আনা গোছ শুখাইয়া আসিলেও তিনি তাঁহার এই দুর্ভাগ্যের দিনে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে একটুকুও ইচ্ছুক ছিলেন না। আর ভগবানের মত নিঃস্বার্থ পরোপকারী বন্ধুর কাছেও একাবারে গোপন করা ঠিক নয়, এজন্য তিনি বলিলেন,—"ভগবান! তাঁর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ করি, এরূপ পথ আমি রাখি নাই। আর এ দুঃখের দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা করাও আমি যুক্তিযুক্ত বোধ করি না।"

ভগবান এইরূপে ঘা মারিয়া রমেশচন্দ্রের মনের প্রকৃত কথা জানিতে পারিল। সে বলিল,—"তা তিনি যখন আপনাকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছেন, তখন তাঁর কাছে মান অভিমান কি বড় বাবু! যদিও আমি তাঁহাকে চোখে দেখিনি, কিন্তু তাঁর মহৎ গুণের কথা দশের মুখে যা শুনতে পাই, তাতে বোধ হয়, তিনি আদর্শ জমিদার, আদর্শ মানুষ। আমার মতে তাঁর কাছে গেলে কোন অপমানই আপনার হবে না।"

কথায় বার্ত্তায় ক্রমশঃ রাত হইয়া গেল দেখিয়া, রমেশচন্দ্র বলি-

লেন "ভগবান! আজ আর তোমায় ছাড়িতেছি না। এক সঙ্গে আজ আহার করিব।"

ভগবান বলিল,—"বড়বাবু! আপনার বাড়ীতেই ত খাই-তেছি। আজ বড় অবেলায় এক বামুন বাড়ীতে যগ্যির নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছি। কিছুই খাইব না আজ আমি। তবে রাত উপোসী থাকৃতে নেই। আমাকে চারিটী মুড়ি গুড় দিলেই হবে। যান্ আপনি আহার করে আসুন।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন—"তোমার মার সঙ্গে দেখা করবে না?"

ভগবান বলিল—"আজ অনেক রাত হয়েছে। কাল সকালে না হয় দেখা করে চলে যাব।"

ভগবানের ধাতুপ্রকৃতির সহিত রমেশচন্দ্র এদানিং খুব পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এজন্য তিনি এ সম্বন্ধে তাহাকে আর কিছু না বলিয়া, নোটগুলি লইয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি বাহির বাটিতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে এক খানি ছোট কাঁসিতে কতকগুলি মুড়ি ও গুড়। আর তাহার উপর দুইটি সন্দেশ।

ভগবান সে রাত্রের মত সেই মুড়িগুড় ও সন্দেশ কয়েকটী খাইয়া এক ঘটী জল খাইয়া বলিল—"আঃ! খুব তৃপ্ত হলুম। মা আমার এমনি ভাগ্যবান কায়েতের মেয়ে, যে হাতে করে যা দেন তাই যেন অমৃত বলে বোধ হয়।"

ভগবান, রমেশচন্দ্রের পার্শ্বে এক স্বতন্ত্র বিছানায় শয়ন করিল। সে রাত্রে তাহাদের মধ্যে আর কোন কথা বার্ত্তা হইল না।

সকালে উঠিয়াই, ভগবান রমেশের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। রমেশ তাহাকে সেদিন আহারাদি করিয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু একগুঁয়ে ভগবান তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করে নাই। একটা অছিলা করিয়া সে অতি প্রত্যুষেই চম্পট দিয়াছিল।

কল্যাণী, পূর্ব্ব রাত্রেই স্বামীর নিকট শুনিয়াছিল, বিবাহের প্রয়োজনীয় চারিশত টাকা ভগবান কিরূপে যোগাড় করিয়া দিয়া গিয়াছে। ভগবানের হৃদয়ের এই উদারতায়, কল্যাণীর এই ভগবান সম্বন্ধে পূর্ব্ব ধারণাটা আরও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। সে তাহার স্বামীকে কেবলমাত্র বলিল—"এটা দেবতার দান। ভগবান হচ্ছে তার উপলক্ষ্য। তুমি একমনে নারায়ণকে ডাক, কোন বিপদই তোমার থাকবে না।"

রমেশচন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই পাত্র আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন।

তৎপরে কন্যা দেখা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা অতি আড়ম্বর বিহীনাবস্থায়। গরীবের ঘরে যে ভাবে হওয়া উচিত, সেই ভাবেই এই কাজটা হইয়া গিয়াছিল। এমন চুপে চুপে এ ব্যাপারটা শেষ হইয়া গিয়াছিল, যে রমেশচন্দ্রর প্রতিবাসীরাও এ কথা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন নাই।

কল্যাণী ও রমেশচন্দ্র পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, শুভকর্ম্মে বাধাবিঘ্ন অনেক ঘটে। বিবাহটা যাহাতে পনর দিনের মধ্যে হইয়া যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা করাই উচিত।

রমেশচন্দ্র তাঁহার ভাবী বেহানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দিন

স্থির করিয়া আসিলেন। বিবাহের আর দুই সপ্তাহ মাত্র বাকী রহিল। সেকরার দোকানে গহনা গড়াইতে দেওয়া হইল। এক-দিন সুবিধামত কলিকাতায় গিয়া রমেশচন্দ্র কলিকাতায় বাজার-হাট কতক শেষ করিয়া আসিলেন। মোটের উপর তাঁহারা তাঁহাদের অবস্থামত সকল বিষয়ে প্রস্তুত হইয়া কেবল, বিবাহের দিনের অপেক্ষায় রহিলেন! আর দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, দিনও কাটিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একটী সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কিন্তু এই সাত দিনের মধ্যে, ভগবানের কোন সংবাদই নাই। রমেশচন্দ্র এজন্য একটু চিন্তিত হইলেন। কারণ এই স্বার্থপর মমতাশূন্য জগতে এই ভগবান যে তাঁহার একমাত্র নিঃস্বার্থ বন্ধু।

একদিন রমেশচন্দ্র নির্জ্জনে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন, "এও কি সম্ভব? সত্য বটে, কালীকিশোর কুসীদজীবি, অর্থলোলুপ ও হৃদয়হীন। কিন্তু সমাজের ও লোকনিন্দার ভয় কি তাহার নাই? সে কি সত্য সত্যই তাহার নামে নালিস করিবে! ডিক্রীজারি করিয়া তাহার বাস্তভিটা ক্রোক্ দিবে! না—না এতটা সে কখনও করিতে পারে না। মানুষ কখনও এতটা হৃদয়হীন হইতে পারে না। সে কেবল তাহাকে ভয় দেখাইয়াছে মাত্র। এখনও চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিত উঠিতেছে। এখনও দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ ফলে। এখনও ধরিত্রী দেবী শস্যশালিনী। এখনও কলির পূর্ণ প্রভাব প্রকটিত হয় নাই। সুতরাং কালীকিশোর যতই দুর্বৃত্ত হউক না কেন, সমাজের বুকের

উপর বসিয়া, এমন হৃদয়হীন কাজ সে কখনই করিতে পারিবে না।”

হায় ! রমেশচন্দ্র ! এই কালীকিশোর সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণাই ভবিষ্যতে তোমার সর্ব্বনাশ করিবে। তোমার দম্ভ আছে, অভিমান আছে, পরহিতচিকীর্ষা বৃত্তি আছে, কিন্তু লোক চরিত্রের অভিজ্ঞতা খুব কম ! তাহা না হইলে তুমি আজও তোমার মাতুল স্নেহময় মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরীকে চিনিলে না কেন ? আজও তুমি এই শয়তানাধম কালীকিশোরকে চিনিলে না কেন ?

১২

কালীকিশোর যে কতদূর ভয়ানক লোক, রমেশচন্দ্র তাহা ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই। এই তুলসী বনের বাঘ, যে বনের বাঘের চেয়েও হিংস্রজীব, তাহা তাঁহার ধারণার মধ্যেই আসে নাই।

রমেশের প্রত্যাখ্যান পত্র পাইয়া অবধি, কালীকিশোর গায়ের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল। রমেশের নামে নালিশ দায়ের করিবার জন্য, সে তাহার উকিলের হাতে সমস্ত কাগজ পত্র দিয়া আসিয়াছিল। বোধ হয় নালিস দুই এক দিনের মধ্যেই রুজু হইবে।

কালীকিশোর, তাহার পুত্র অন্নদা আর কর্ম্মচারীকে লইয়া নির্জ্জনে পরামর্শ আঁটিতেছে, এমন সময়ে ভগবান সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল—“হরিবোল—হরিবোল ! বাবুর জয় হোক !”

ভগবানের উপর কালীকিশোর নারাজ নহে। সে তাহাকে পুরাদস্তর পাগলা বলিয়াই ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল। কালীকিশোরের

ধারণা তাহার উপর খুব ভাল ছিল। কারণ তাহার মতে এই ভগা পাগলা—"নির্লোভ ভিখারী।" বহুদিন হইতে সে তাহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু কখনও একটী পয়সাও তাহার কাছে চাহে নাই। আর তাহার মনের বিশ্বাস, এই ভগা-পাগলা অতি নিরীহ নির্ব্বিবাদী ও পরোপকারী লোক। এ সেয়ান দুনিয়ার মধ্যে ছাপমারা একমাত্র বোকা।"

ভগবানকে দেখিয়াই কালীকিশোর বলিল—"কিরে ভগা! কেমন আছিস্?"

ভগবান বলিল—"আমার থাকাথাকি কি বাবু! একটা পেট আমার। আপনার শ্যামসুন্দর সে ভার নিয়েছেন। হাটে মাঠে পড়ে থাকি, ভাঁড়ে জল খাই, গাছতলায় শুই, আর আপনাদের মত প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখাসাক্ষৎ করে মনের আনন্দে দিন কাটাই। সত্য কথা বল্‌তে কি—অনেক যায়গায় অনেক ঠাকুর দেখেছি। কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠিত এই শ্যামসুন্দরের মত সুন্দর মূর্ত্তি আমার চক্ষে পড়ে নাই। খড়দার শ্যামসুন্দর ত এর তুলনায় কিছুই নয়। আপনি একজন পুণ্যাত্মা লোক আর পরম বৈষ্ণব। আপনাদের এই ভগাপাগলা চিরদিনই বৈষ্ণবের দাস।"

ভগবান, কালীকিশোরের প্রসন্ন ভাব দেখিলেই, এইরূপ আবোল তাবোল বকিত। কালীকিশোরকে কেহই প্রশংসা করিত না; অথচ সেও অতি মাত্রায় আত্মপ্রশংসা প্রিয় ছিল। কাজেই সে ভগবানের এই দীর্ঘ বক্তৃতায় বাধা দিল না। একটা

অপূর্ব্ব আত্ম-তৃপ্তির সহিত, সে এই বিষ গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। তা—কেবল কালীকিশোর কেন—এ দুনিয়ার অনেক কিশোরই এইরূপ একটা প্রশংসার সুখলাভের জন্য খুবই উৎসুক থাকে।

কালীকিশোর ভগবানকে এবার একটু আত্মীয়তা জানাইয়া বলিল—"ওরে রামা! ভগবানকে একটু তামাক দেনা।"

ভগবান বলিল—"আহা তাকি হয় বাবু! চাকরে আমায় তামাক দেবে, তার যোগ্য আমি নই। আর আপনার সম্মুখে কি আমি তামাক্ খেতে পারি? ওটা আমার মত লোকের পক্ষে মহা ধৃষ্টতা।"

এইকথা বলিয়া ভগবান নিজে গিয়া তামাকু সাজিল। রামা চাকর অবশ্য সে ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তারপর সে কলিকাটিতে ফুঁ দিয়া, ভাল করিয়া আগুণ ধরাইয়া, তাহা কালীকিশোরের হুঁকার উপর বসাইয়া দিল।

কালীকিশোর বলিল—"আরে কচ্ছ কি! তাও কি হয়? তুমি আগে খাও।"

ভগবান আসামীর মত জোড়হস্তে বলিল—"তা খুব হয়। আমি যখন বৈষ্ণবের দাস বলে বড়াই করে বেড়াই, তখন আপনার মত পরম বৈষ্ণবকে একটু তামাক সেজে দোব, এটা কি বেশী কথা হ'লো? আপনি পেসাদ করে দিন না হুজুর!"

কালীকিশোর অন্নদাকে বলিল—"দেখ্‌লে—লোকটা কেমন সাধা সিদে। ওকে ত লোকে পাগল বলেই জানে। কিন্তু কথা

বার্ত্তায় বাঁধুনী কেমন দেখছো অন্নদা! যাক্—তোমায় যা বলে দিলুম—তাই করো। আজই খেয়ে দেয়ে, বর্দ্ধমানে গিয়ে গোপনে উকীল বাবুর সঙ্গে দেখা করে, কাজের বন্দোবস্ত করে ফেল্‌... জানতো এটা কতবড় জরুরী কাজ।"

অন্নদা বলিল—"যা বলছো—তাই করবো। তবে কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে ত।"

কালীকিশোর বলিল—"রাধেকৃষ্ণ! রাধেকৃষ্ণ! টাকা ত চাই-ই। টাকার চাকার উপর এই দুনিয়া মহারথটা চল্‌ছে। উকীল আর বেশ্যা, এরা টাকা না হলে কি কথা কয়? তুমি তৈরি হও গে। আমি আহ্নিকটা সেরেই যাচ্ছি।"

অন্নদা চলিয়া গেলে, কালীকিশোর হুঁকাটী হাতে লইয়া টান মারিতে লাগিল। কুণ্ডলী আকারে ধোঁয়া উড়িয়া, তাহার মুখের সম্মুখটাকে অন্ধকার করিয়া দিল। চোঁয়া কলিকাটী ভগবানের হাতে দিয়া, কালীকিশোর তাহাকে বলিল—"ওহে! তামাকটা খেয়ে একবার এখানে এসো। তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে। অন্য লোকে তোমায় পাগল বলে হেনস্তা করুক আর যাই করুক, আমি কিন্তু তা করি না।"

ভগবান, কালীকিশোরের ধূমপানের দৌড় দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, কলিকাটীতে কিছু নাই। সে কালীকিশোরের সম্মুখে তামাক খাইত না। এজন্য দালানে গিয়া, কলিকায় দুই একটী দম্ মারিয়া, তাহা যথাস্থানে রাখিয়া, ঘরের ভিতরে আসিয়া বলিল "আমার কি হুকুম করবেন বল্‌ছিলেন হুজুর।"

কালীকিশোর বলিল—"হুকুম-হাকাম নয়। তুমি এই গাঁয়ের সব বাড়ীতে ভিক্ষের জন্য যাও ত। একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাই। বলি তোমাদের রমেশবাবুর খপর কি?"

ভগবান বলিল—"আজ্ঞে! তাঁর মেয়ের বে সুমুখে! এজন্য তিনি বড় ব্যস্ত।

কালীকিশোর। কবে বে?

ভগবান। আজ্ঞে—২৬এ দিন স্থির হয়েছে।

কালীকিশোর। বল কি? মোটে তাহলে আর দুইসপ্তাহ বাকী! তা টাকা পেলে কোথা?

ভগবান। কি করে জানবো হুজুর! তবে তিনি যে একাবারে নিঃসম্বল, তা তো বোধ হয় না।

কালীকিশোর। না হে তা নয়। তুমি ভেতরের সব কথা জান না। লোকটা একাবারে নাতান। আর তার উপর একটা নিরেট বোকা। আর সে বোকামির সঙ্গে একটা ভয়ানক হারামজাদ্‌কি মেশান আছে।

ভগবান। আপনি সব জান্‌তে পারেন। কারণ শুনেছি তিনি আপনার টাকা ধারেন। তাঁর বাগান টাগান সব আপনারই কাছে বাঁধা।

কালীকিশোর। সত্যই তাই। ব্যাপারটা কি তবে শোন। আমি তার কাছে এক বন্দকী কোবালার দরুণ মায়সুদ, প্রায় পাঁচ হাজার টাকা পাবো। সুদে সুদে সে টাকা বাড়্‌ছে। কিন্তু

লোকটা এতই নির্লজ্জ, যে আমার কাছে সে দিন তার মেয়ের জন্য আবার তিন্‌শো টাকা ধার কর্ত্তে এসেছিল। আমি তাকে বল্লুম—"ওহে রমেশ! অমন সুন্দর মেয়েটীকে হাঘরের হাতে দিচ্ছ কেন? আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বে দাও। আমি তোমার বন্ধকী কোবালার টাকা চাই না। তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে। রাজার বৌ হবে। তা হতভাগাটার এত দেমাক, যে সে আমার মুখের উপর বল্‌লে—"আপনারা বাঙ্গাল কায়েত। আপনার ছেলের স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজি হতে পাল্লুম না।" এমন দুরবস্থা যার সে টাকা পেলে কোথায় তাই ভাবছি।

ভগবান। কি করে জান্‌বো হুজুর! লোকটা বড় চাপা। আমি এ গ্রামে এলে, তার সঙ্গে একবার করে দেখা করি বটে, কিন্তু ভিতরের এসব কথা তো শুনিনি। আর সেই বা আমার মত একটা ভবঘুরেকে একথা বল্‌বে কেন? সেত আর আপনার মত সাদাসিধে লোক নয়।"

কালীকিশোর বলিল—"তা ভগবান, তুমি স্থির জেনো, কালীকিশোর রায়ের অপমান করে সেই রমেশ যে বিনা বাধায় তার মেয়ের বে দেবে—তা মনেও করো না। ও বে যদি আমি পণ্ড না করি, ত আমি যদু বাঙ্গালের ঔরসজাত ছেলেই নাই। 'আজই তার শ্রাদ্ধের জোগাড়ের জন্য—অন্নদাকে সদরে পাঠাচ্ছি।"

ভগবান—ন্যাকামির ভাবে গালে হাত দিয়া বলিল—"ওঃ—মা! এর ভেতর এত ব্যাপার! রমেশের তা হ'লে দেখ্‌ছি মতিচ্ছন্ন দশা

ধরেছে। আপনার মত প্রবল পরাক্রান্ত জমীদারের সঙ্গে বিবাদ করে কি সে এ গ্রামে টিক্‌তে পারবে? আপনি ত ভাল কথাই বলেছিলেন।

কালীকিশোর বলিল—"দেখা যাক্ না কেন—কোথাকার জল কোথায় মরে। তা বেলা হয়ে পড়্‌লো। তুমি আজ ঠাকুর বাড়ীতে না হয় চাট্টি পেসাদ পেয়ে যেও। আর মাঝে মাঝে আমার এখানে এসো। রমেশ তার মেয়ের বের জন্য তিন্‌শো টাকা কোথায় পেলে যদি সন্ধানটা আন্‌তে পার, তা হলে তোমাকে বক্‌শীশ করবো।"

ভগবান বলিল—"হুজুরেরই ত খাচ্ছি। এবার যেদিন আসবো, সেদিন আপনাকে কিছু নূতন খপর দিয়ে যাব। বেলা হয়ে পড়্‌লো আপনি আহ্নিক পুজো সেরে নিন্ গে।"

কালীকিশোর অন্দর মহলে চলিয়া গেল। ভগবানও ধীর পদে কালীকিশোরের দরোজার বাহিরের রাজপথে দাঁড়াইয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—"হরে মুরারে! হরে মুরারে! দয়াময় নারায়ণ! তোমার সংসারে এমন নরাধমও আছে প্রভু! আজকাল এই বাঙ্গালীর, কন্যাদায় পিতৃমাতৃ দায়ের চেয়ে বড়। লোকে মেয়ের বে দিতে গিয়ে ভিটে মাটী বাঁধা দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে। আর এই শয়তান কিনা সে বিবাহ পণ্ড করে দিয়ে, এক ভদ্র কায়স্থসন্তানের জাত মার্‌তে চায়। দেখা যাক্ মধুসূদন—তোমার লীলা খেলার মহিমা!"

১৩

ভগবানের এ সংসারে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। কেন না, মানুষ বাক্‌শক্তি সম্পন্ন। আর তাহার উপর তাহার বুদ্ধিও আছে। এই বুদ্ধিটা ভগবানের দান হইলেও, সে কথনও কথনও ইহার সহায়তায় তাহার স্রষ্টার সহিত কারসাজি করিবার চেষ্টা করে।

এ সংসারে ভাল মন্দ দুই আছে। প্রাকৃতিক নিয়মে যেমন আলো আর অন্ধকার এ জগতে বিদ্যমান, সেইরূপ দুষ্ট লোক ও ভাল লোক লইয়া ভগবানের এই সংসার।

কেহবা পুণ্যকর্ম্ম করিয়া আনন্দ ভোগ করে, কেহবা পাপে সেই আনন্দ পায়। কেহবা পরোপকার করিতে পারে না বলিয়া আফ্‌শোষ করে, কেহবা পরোপকারের শক্তি থাকিলেও, তাহা অপকারের দিকে প্রয়োগ করে। কেহবা আর্ত্তের রক্ষক, আর কেহবা নিরীহের, নিঃসহায়ের উৎপীড়ক। পরের অনিষ্ট করা কাহারও বা জীবনের ব্রত, আবার পরের উপকার করা কাহারও বা স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম।

আমরা সেই জন্য দুইটী লোকের চিত্র তুলনার সমালোচনায়, এই উপন্যাস মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। একজন এই নর পিশাচ কালীকিশোর। আর একজন ভগবান। ভগবান কর্ম্মী বটে, কিন্তু শক্তিহীন। তাহার পিছনের শক্তি হইতেছেন মৃত্যুঞ্জয়।

বলা বাহুল্য, কালীকিশোরের কথা ও যা কাজ ও তা। রমেশচন্দ্র তাঁহার কন্যার সহিত, অন্নদার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হইয়া তাহাকে সে ভয়ানক অপমান করিয়াছেন, এরূপ একটা সংস্কারের বশবর্ত্তী

হইয়া সে তাহার কন্যার বিবাহ পণ্ড ও জাতিনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সে গোপনে নালিশ করিয়া, রমেশের নিকট প্রাপ্য টাকার জন্য এক তরফা ডিগ্রী করিল। কেবল ডিক্রী করা নয়, সে দস্তকের প্রার্থনা পর্য্যন্ত করিল।

এ দিকে রমেশচন্দ্র নিশ্চিন্তমনে, কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতেছেন। দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। মাঝে আর সাতটী দিন বাকী। এ বিবাহে জাঁকজমক কিছুই নাই। কেবল সম্প্রদান ও পাড়ার কয়েকটী প্রতিবাসীকে আমন্ত্রণ। বরযাত্রীদের সংখ্যা মোটে আট দশজন।

রমেশচন্দ্র ইতিমধ্যে কলিকাতায় গিয়া, তাঁহার কলিকাতার বাজারের কতক কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া আসিয়াছেন। নিশ্চিন্ত মনে বিবাহের আয়োজন করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে কল্যাণী তাহার গায়ের সমস্ত অলঙ্কার গুলি হাসিমুখে খুলিয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার কন্যার অলঙ্কার তৈয়ারি হইয়া আসিয়াছে, ইহাতেই সে আনন্দিত।

রমেশচন্দ্রের বৈঠকখানার পার্শ্বে একটী ছোট দালান ছিল। এইটীই তাঁর পূজার দালান। ঠিক পূজার দালান বলা যায় না, কেননা ছড়ওয়ালা থাম বা কার্ণিস তাহাতে ছিল না। আট দশ হাত প্রশস্ত একটী ঘর সেটি। বড় বড় দরোজা গুলি খুলিয়া দিলে, তাহা পূজার দালানেই দাঁড়াইত।

এই দালানের মধ্যেই সম্প্রদান হইবে। বাগানের বাঁশের ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিয়া একটী ম্যারপ বা মণ্ডপ তৈয়ারী হইয়াছে।

বাড়ীঘর সাধ্যমত চুণকাম করা হইয়াছে। দিন কাহার ও জন্ম অপেক্ষা করে না। বিবাহের বাকী সাতদিন হইতে পাঁচটী দিন খসিয়া গেল। মধ্যে কেবল দুই দিন।

কালীকিশোর সকল সংবাদই রাখিতেছিল। এই ক্রিয়া উপলক্ষে রমেশচন্দ্র প্যালার মা বলিয়া এক কৃষক কন্যাকে অস্থায়ীভাবে অতি-রিক্ত ঝি রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই প্যালার মাই গুপ্তচররূপে, কালীকিশোরের টাকা খাইয়া, ভিতরের সমস্ত কথাই তাঁহাকে জানাইতেছিল।

ভগবানের কোন সংবাদই নাই। সে পাঁচ ছয়দিন এ বাড়ীতে দেখা দেয় নাই। এজন্য রমেশচন্দ্র একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "তবে কি ভগবান অসুস্থ হইয়াছে? তবে কি সে এ বিবাহে আসিবে না? সে যদি না আসে, তাহা হইলে, এ বিবাহে তাঁহার যে কোন আনন্দই হইবে না।"

কিন্তু ভগবান ত নিস্ক্রিয় নহে। কালীকিশোরের মুখে সেই ভয়ানক কথা শুনিয়া অবধি, সে বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিল। সে ভাবিল—"এই নরপিশাচ সত্যসত্যই যদি দস্তকের মত কোন কিছু একটা কাণ্ড করিয়া বসে, তাহা হইলে যে এই বিবাহ পণ্ড হইবে। রমেশকে যদি আদালতের পেয়াদারা টানিয়া লইয়া যায়, ত কন্যা সম্প্রদান করিবে কে? তাহা হইলে যে সমূহ সর্ব্বনাশ! এজন্য সে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরে পৌছিল।

তাহার প্রভু মৃত্যুঞ্জয়কে ভগবান সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। তাঁহার সম্বন্ধে রমেশ কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও

সে বলিল। মৃত্যুঞ্জয় রমেশের মনে একটা অনুতাপের উদয় হইয়াছে শুনিয়া, মনে মনে বড়ই সুখী হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত না করিয়া, একটু উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

একটি কক্ষমধ্যে বসিয়া, মৃত্যুঞ্জয়বাবু ভগবানের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। সে কথা গুলি আমাদের শুনিতে হইবে :

মৃত্যুঞ্জয়। দেখ—এ সব শুনেও তার উপর আমার একটুও দয়া হচ্ছে না। ভগবান! এখনও যখন তার চৈতন্য হলো না, তখন হবে কবে ?

ভগবান। যদি হুজুর আমায় মার্জ্জনা করেন, আর বেয়াদবী বলে না ভাবেন, একটা সোজা কথা বলি। কথায় বলে "নরাণাং মাতুলক্রম।" মামার অনেক গুণ, মায়ের দিকে দিয়ে ভাগ্‌নে পায়। তা আপনিও যেমন একটুও নুইতে চাচ্ছেন না, আপনার ভাগ্‌নে রমেশ বাবু, যদি সেরূপ একটা প্রবৃত্তি দেখান, সেটা কি খুব দোষের কথা !"

মৃত্যুঞ্জয়। তাবলে সে আমাকে তার মেয়ের বেতে নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত কল্লে না ! দেখদেখি বেয়াদবের কাজ ! তাকে আবার সাহায্য করবো ?

ভগবান। তিনি কি জানেন—যে আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আছে। আর তিনি ত এখনি এখানে আস্‌তে প্রস্তুত। কেবল একটা অভিমান তাঁকে খুব জোর করে টেনে রাখ্‌ছে। ঘটনার প্রতিকূলতাও তাতে আরো শক্তি যোগ করে দিচ্ছে। তিনি ত স্পষ্টই বল্লেন—"আমি যদি বুঝেসুঝে চল্‌তুম্, তা হলে আমার

ভাবনা কি? কিন্তু যখন আমার সুখের দিনে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন কর্ত্তে যেতে পারিনি, তখন এই দুঃখের দিনে, তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি মনে করবেন কি?"

মৃত্যুঞ্জয়। সত্যই সে এইকথা বলেছে নাকি? দেখ ভগবান যদি সে আসতো, তা হলে খুব ভাল কাজই সে করতো। আমি তাকে এই অভিমানচঞ্চল বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে, তার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করতুম। এই ভবানীপুরের বাড়ীতে মহাসমারোহে তার মেয়ের বিয়ে দিতুম। দশহাজার টাকার অলঙ্কার তার মেয়েকে যৌতুক দিতুম। সে একটু ছোট হলেই ত সব গোলমাল চুকে যায়।"

ভগবান। ছোট ত তিনি হয়েছেন হুজুর! তবে গ্রহচক্রের ফের, তাঁকে উল্‌টো পথে নিয়ে যাচ্ছে। এমন একদিন আস্‌বে, যে দিন তিনি আপনি এসে আপনার অই পায়ে লুটিয়ে পড়বেন। এখন উপস্থিত বিপদের কি করা যায় বলুন দেখি!"

মৃত্যুঞ্জয়। আমি আর কি করবো! তোমায় মুখে একথা শোনবার আগে, আমি আদালতে লোক পাঠিয়েছিলুম। যে সে লোক নয়, আমার দেওয়ানজী। দেওয়ানজী খপর এনেছেন, কালীকিশোর, শমন চেপে রেখে, মিথ্যে এফিডেবিট করিয়ে মোকদ্দমা ডিগ্রী করেছে। দস্তকেরও প্রার্থনা করেছে। আজ শনিবার। বেলাও বারটা বেজে গিয়েছে। এখন যদি দাওয়ানজীকে বর্দ্ধমানে পাঠাই, তাহলে কোন ফলই হবে না। আর কাল রবিবার। কাছারি বন্ধ।

ভগবান। তাহলে কি হবে প্রভু! সোমবারে যে এই বিয়ে তা হলে কি রমেশবাবু আপনার ভাগ্নে হয়ে, দেনার দায়ে জেলে যাবেন।

মৃত্যুঞ্জয়। যা ভবিতব্য, তাতে ত আমি বাধা দিতে পারবো না ভগবান!

ভগবান। আমার এ ছোট মুখে বড় কথা শোনায় না ভাল। কিন্তু আমার মত অতি মূর্খেরও মনের বিশ্বাস, যে পুরুষকার চেষ্টা করলে দৈবকেও বাধা দিতে পারে!

মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু সে শক্তিময় পুরুষকার কই?

ভগবান। কেন আপনি!

মৃত্যুঞ্জয় এ কথাটা শুনিয়া মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন—"তুমি ভুল বুঝেছ ভগবান! আমার নিজের শক্তিকে আমি অতি দুর্ব্বল বলে মনে করি। সে শক্তি যদি আমার থাক্‌তো, তাহলে রমেশ আজ আমার কাছ থেকে এত দূরে থাকতে পারতো না। সে শক্তি যদি আমার থাক্‌তো, তাহ'লে আমার ভাগনে হ'য়ে সামান্য দেনার দায়ে সে দস্তকের আসামী হ'তো না। সে শক্তি যদি আমার থাক্‌তো, তাহ'লে তার মেয়ের বে এমন গরিবানা চালে হতো না! না, না, আমার দ্বারা আর কিছুই হবে না—আমি কিছুই কর্ত্তে পারবো না। যে চারশোটাকা তাকে দিয়ে এসেছ—তা ছাড়া এক কপর্দ্দক আমি তাকে দিতে পারবো না—দোব না। সে জেলে যাক্‌। তার দর্প চূর্ণ হোক!"

ভগবান—মৃত্যুঞ্জয়ের পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"তা

হবে না। হ'তে দোব না। দয়ার সাগর আপনি। ক্ষমার প্রস্রবণও আপনি। গরীবের মা-বাপ আপনি। এই বাঙ্গলার মধ্যে আদর্শ জমিদার আপনি। না চেয়ে নিস্পরে আপনার করুণার ফল ভোগ করে। আর আপনার সন্তানপ্রতিম এই রমেশ বাবু সেই করুণার ফল ভোগ কর্ত্তে পাবেন না। এ হতেই পারে না। প্রভু! আমার মুখ রক্ষা করুন।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু—ভগবানের হাত দুখানি ধরিয়া, তাহাকে সম্মুখস্থ এক চিয়ারে বসিতে বলিলেন। তৎপরে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া প্রসন্ন মুখে বলিলেন—"ব্যস্ত হয়ো না ভগবান! আমায় একটু ভাবতে দাও। কাল সকালে আমি তোমাকে বল্‌বো, এর কি ব্যবস্থা হতে পারে। তারপর তুমি, রমেশের কাছে চলে যেও।"

ভগবান তাহার প্রভুর ধাত্‌ জানিত। তাঁহার প্রকৃতি যে বাহিরে অতি কঠোর, ভিতরে অতি কোমল, তাহাও সে খুব ভাল রকমেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। পাষাণ বক্ষের অন্তরালে—যেমন স্নিগ্ধ নির্ঝরধারা থাকে, তাহার দয়ালু মনিবের হৃদয়ের অবস্থা যে ঠিক সেইরূপ, তাহা জানিয়াই সে আশান্বিত হইল। কারণ যখন কথাটা একবার তাঁহার কাণে উঠিয়াছে, তখন তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা না করিয়া, তিনি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না।

১৪

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সম্বন্ধে কাহারও হাত যদি থাকে, তাহা-বিধাতার। আর তাঁহার বিধানের ব্যতিক্রম করিবার শক্তিও

কাহার নাই। ছার বুদ্ধি মানুষ, সোজা কথাটা বোঝে না বলিয়া, বাহাদুরী দেখাইতে যায়।

শ্রীমান নরেশচন্দ্রের সহিত, শ্রীমতী স্বর্ণপ্রতিমার বিবাহ সম্বন্ধ বিধাতার স্বেচ্ছাকৃত। সুতরাং সে বিবাহ কোন মতেই রহিত হইল না। সেদিন যেরূপ একটা বাধা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু তাহাতেও এই বিবাহ আটকায় নাই। পরেই সব ঘটনা পরিস্ফুট হইবে।

যাই হ'ক নির্দ্দিষ্ট দিনে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। কন্যা স্বর্ণ প্রতিমার গায়ে হলুদ হইল। রমেশচন্দ্রের বাড়ীতে পাড়ার আত্মীয় কুটুম্বিনীরা আসিয়া জুটিলেন। অন্দরের উঠানের একদিকে ভেয়ানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সেখানে বরযাত্র ও কন্যাযাত্রদের আহারের ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

রমেশচন্দ্রের অবস্থা তখন মন্দ হইয়া গেলেও, তিনি সাবেক চালটা একেবারে ছাড়িয়া দিতে পারেন নাই। কাজেই অল্প স্বল্পের মধ্যে এ বিবাহ সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু ব্যবস্থা করিলেন, তাহা দারিদ্র্যগন্ধবর্জ্জিত।

বাহিরের মেরাপে লাল রঙ্গের পাল টাঙ্গান হইয়াছে। পালের নীচে লম্বা লম্বা দড়িতে কয়েকটী গোলক-লণ্ঠন টাঙ্গানো রহিয়াছে। আত্মীয় প্রতিবেশীদের মধ্যে ভট্টাচার্য্য খুড়ো, দত্তজা মহাশয়, তর্কালঙ্কার ঠাকুর, সবাই রমেশচন্দ্রের সদরে আসিয়া সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র বরযাত্রীগণের আহারের জন্য কলিকাতার ধরণেই

আয়োজন করিয়াছিলেন। যদিও অল্প লোকের আয়োজন হইয়াছিল, তবুও তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।

পত্নী কল্যাণী, ভিতরে কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত। রমেশের সুদ্দিনে তাঁহার বাড়ীতে অনেক ক্রিয়াকলাপ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং নিমন্ত্রিতাগণের সম্বর্দ্ধনায় ও সম্মানরক্ষাকার্য্যে কল্যাণী অনভ্যস্তা ছিল না।

যুবতীরা ক'নে সাজাইতেছে, কেননা বেলা অপরাহ্নে নামিয়াছে রমেশচন্দ্র এক একবার বাড়ীর মধ্যে আসিয়া, রশুই ব্রাহ্মণের কাজ কত দূর অগ্রসর হইল দেখিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও তাঁহার মনে যেন একটা অপ্রসন্ন ভাব। তাহার কারণ, ভগবান এই বিবাহ ক্ষেত্রে তখনও অনুপস্থিত।

আর কালীকিশোরের ব্যাপারে তিনি যে উৎকণ্ঠিত ছিলেন না, এমন নয়। তবে যখন বেলা চারিটা বাজিয়া গেল, তখন তিনি ভাবিলেন, হয়তঃ আজকের দিনটা ভালয় ভালয় কাটিয়া যাইবে।

গোধূলি লগ্নে বিবাহ। আর একঘণ্টা পরেই বর আসিবে। পল্লীগ্রামের বিবাহ। গাড়ী ঘোড়া সে অঞ্চলে খুব কম। কেননা, গ্রাম্যপল্লীর কাঁচা রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ী চলেনা বলিয়া, গাড়ী ঘোড়া বেশী নাই। মেয়ে সওয়ারি ডুলি পাল্কী ইত্যাদিতেই যাতায়াত করে। তবে রমেশচন্দ্রের বাড়ীতে বর আসিবে গাড়ী করিয়া।

দুই চারিজন বরযাত্র ইতিপূর্ব্বেই দেখা দিয়াছেন। তাঁহারা রমেশচন্দ্রের বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছেন। তাঁহাদের মুখেই রমেশচন্দ্র শুনিলেন, বাকী বরযাত্র রওয়ানা হইয়াছে। আধঘণ্টা মধ্যেই আসিয়া পৌঁছিবে।

তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। বৈশাখের রৌদ্র তেজ তখন অনেকটা কমিলেও একেবারে স্নিগ্ধ হয় নাই। এমন সময়ে আর এক দল বরযাত্র আসিয়া পৌঁছিল। রমেশচন্দ্র তাহাদের খুব খাতির করিয়া বসাইলেন। তাঁহাদের মুখেই শুনিলেন, যে বর আর আধঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে।

রমেশচন্দ্র অন্দরের মধ্যে বরযাত্রীগণের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিতে গিয়াছেন। এমন সময়ে কালীকিশোরের বংশধর শ্রীমান অন্নদাকিশোর, দুইজন আদালতের পিয়াদা লইয়া সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

এই পেয়াদাগণ ও অন্নদা, গ্রামের সকলের নিকটই পরিচিত। তর্কালঙ্কার মহাশয় অন্নদাকে প্রশ্ন করিলেন—"ব্যাপার কি খোকা বাবু?"

অন্নদা তর্কালঙ্কারকে একটা প্রণামও করিল না। বরঞ্চ তাচ্ছল্য ভাবে বলিল—"ঠাকুর! ব্যাপার যা তা এখনি দেখিতে পাইবেন। এখন কন্যাকর্ত্তা রমেশ বাবু কোথায় বলুন দেখি?"

তর্কালঙ্কারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, রমেশের একজন প্রতিবাসী। নাম, মুরলীমোহন দত্ত। মুরলীবাবু, কাণাঘুষায় রমেশের নামে নালিশের কথা শুনিয়াছিলেন। লোকটা রমেশের হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিবাসী। মুরলীবাবু, অন্নদার রুক্ষমূর্ত্তি দেখিয়াই সব কথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখনই পাশ কাটাইয়া, বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন

রমেশ, ভেয়ান-ঘরে যেখানে লুচি ভাজা হইতেছে, সেইখানে

দাঁড়াইয়া কতটা ময়দা তখন মাখিতে হইবে, এ সম্বন্ধে রশুয়ে ব্রাহ্মণদের উপদেশ দিতেছিলেন। সহসা মুরলীকে হস্তেঙ্গিতে তাঁহাকে ডাকিতে দেখিয়া, তিনি ত্রস্তভাবে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বলিলেন—"আমায় ডাকিতেছ কি? ব্যাপার কি মুরলী?"

মুরলী বলিল—"ব্যাপার বড় ভাল নয়। তুমি একটু গা ঢাকা দাও।"

রমেশ। কেন বল দেখি?

মুরলী। বোধ হয়—বোধ হয় কেন নিশ্চয়ই, কালীকিশোরের ছেলে তোমার নামে ডিক্রীর দস্তক করিতে আসিয়াছে। তার সঙ্গে দুইজন আদালতের পেয়াদা। তোমার নামে যে নালিশ হইয়াছিল, তার কি কোন সন্ধানই তুমি রাখ না?

রমেশ। না—কিছুই না। তা আমায় পলাইতে বলিতেছ কেন?

মুরলী। এখনি দেনার দায়ে বদ্‌মায়েসেরা তোমায় গ্রেপ্তার করিবে। দস্তক মানে কি জানতো ভাই। ঐ শয়তান কালী-কিশোরের অসাধ্য কাজ যে কিছুই নাই!

রমেশচন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—"হা! ভগবান! এযে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত! রক্ষা কর! নারায়ণ! আজ আমার মান বাঁচাও। জেলে যাইতে আমি তিল মাত্র কুণ্ঠিত নই। কিন্তু আজ যে আমার কন্যার বিবাহ!

মুরলী, রমেশের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল—"ভাই! আমি তোমায় যা বলি, তাই কর। সূর্য্যাস্তের পর দস্তকের আসামী

ধরিবার আইন নাই। আধঘণ্টাকাল তুমি যদি বাহির বাটীতে না যাও তাহা হইলে দস্তকের কোন কাজ আজ হইবে না।”

রমেশ কপাল চাপ্ড়াইয়া বলিল—“কোথায় গিয়া লুকাইব মুরলী!”

মুরলী বলিল,—“তুমি বাগানের পাঁচিল টপ্কাইয়া, আমার বাড়ীতে যাও। আমি সদর দ্বার দিয়া ঘুরিয়া যাইতেছি।”

রমেশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন—“না—না মুরলী! আমি জেলে যাইতে পারি, কিন্তু প্রতারণার কলঙ্ক কিনিতে পারি না।

মুরলী। রমেশ! ও সব ধর্ম্মজ্ঞানের কথা এখন ছাড়িয়া দাও। আত্মরক্ষার চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম নাই।

এমন সময়ে বাহির হইতে পেয়াদাদের উচ্চ কণ্ঠস্বর রমেশের কাণে পৌঁছিল। পেয়াদা বলিতেছে—“রমেশ বাবু! এখনি বাহিরে আসুন। আদালতের পেয়াদা আমরা। সরকারের চাকর আমরা। এ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার হুকুম আমাদের নাই।”

রমেশচন্দ্র মুরলীকে বলিলেন—“ভাই! আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। আমার অদৃষ্টে যাহা হয় হউক! যদি আজ আমায় উহারা আটক করে, তাহাহইলে আমার পত্নীকে দিয়া কন্যা উৎসর্গ করাইও। লোকজনকে খাওয়াইও। তুমি আমার সহোদরের অধিক। ভগবান যদি সত্য হন, দেখিও আমার কন্যা এ বিবাহে কোন বাধা উপস্থিত হইবে না।

রমেশ বাহিরে আসিবামাত্র দেখিলেন—ভগবান সেই পেয়াদা

মৃত্যুঞ্জয়বাবু স্বর্ণপ্রতিমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—
"এস দিদি! স্বর্ণ প্রতিমা আমার!"

দের নিকট হইতে একটু দূরে দাঁড়াইয়া, একটী ভদ্রলোকের সহিত ফিস্ ফিস করিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে!

এই সময়ে রমেশচন্দ্রকে দেখিয়া অন্নদাকিশোর পেয়াদাদের বলিল—"ঐ দেনদার রমেশবাবু! উহাকে পাকড়াও।"

পাইকেরা রমেশকে ধরিতে যাইতেছে, এমন সময়ে ভগবান বাঘের মত লাফাইয়া রমেশ ও পেয়াদারের মধ্যে গিয়া পড়িয়া বলিল—"সাবধান! রমেশবাবুর অঙ্গস্পর্শ করিও না। এই ভগা পাগলা, তোমাদের মাথা ভাঙ্গিয়া দিবে।"

অন্নদাকিশোর সহসা তাহার ইপ্সিত কার্য্যে বাধা পাইয়া বলিল, "সরে যা হতভাগা পাগ্‌লা! আদালতের পেয়াদার সঙ্গে পাগ্‌লামী চল্‌বে না।"

এমন সময়ে একজন ভদ্রবেশী ব্যক্তি, অন্নদাকিশোরের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অন্নদাকে বলিলেন—"তুমি কি চাও বাপু?"

অন্নদা একটু রুষ্টস্বরে বলিল—"আমি কি চাই, তাহা আপনাকে বলিতে বাধ্য নহি। বুদ্ধি থাকে বুঝিয়া লউন।"

সেই লোকটী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল—"আমার বুদ্ধি তোমার চেয়ে কম বটে! তবে তুমি আর তোমার বাবা কালীকিশোর, আজ যে কাণ্ডটা করিলে, অতি চামারেও তাহা করিতে পারে না। তবে তোমাদের মনে একটু ভাবা উচিত ছিল, ভগবান যার সহায় হন, তোমাদের মত অতি ঘৃণিত হৃদয়হীন লোকে তাহার কোন অনিষ্টই করিতে পারে না। বল—তো বাবু মহাজনের পো! কত টাকার জন্য এই দস্তক বাহির করিয়া, এই ভদ্রলোকের জাত

মারিতে উদ্যত হইয়াছ? এই নাও পাঁচ হাজার টাকা। তোমার নাকের ডগায় ধরিয়া দিতেছি।"

এই কথা বলিয়া সেই ভদ্রলোকটী তখনই পকেট হইতে পাঁচ খানি হাজার টাকার নোট বাহির করিয়া শ্রীমান্ অন্নদাপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এখন দেখ্‌লে ত বাবু! বুদ্ধি তোমার বেশী, তোমার বাবার বেশী, না এই দরিদ্র রমেশ বাবুর বেশী। ভাল মানুষের মত টাকাটা নিয়ে রসিদ দিয়ে চলে যাও।"

পেয়াদারা আইনের চাকর। তাহারা অশিক্ষিত ও হৃদয়হীন। তাহারাও এই ব্যাপার দেখিয়া চটিয়া গেল। সর্দ্দার পেয়াদা বলিল "অন্নদাবাবু! আর আমরা দেরী করিতে পারি না। সত্যই আপনার পিতা অতি ভয়ানক লোক।"

এই তিরস্কারে অন্নদা একটুও অপ্রতিভ হইল না। সে টাকা গুলি গণিয়া লইয়া তখনই রসিদ লিখিয়া দিল।

তখন সভাশুদ্ধ লোক উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া, কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে, কিসে কি হয়!

সেই ভদ্রলোকটী রসিদখানি লইয়া, রমেশবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন—"এই নেন্ রমেশবাবু। এখন আপনি ঋণমুক্ত। যদি আমাদের গ্রাম হইত, তাহা হইলে এই চণ্ডালাধমকে আমরা জুতা মারিয়া তাড়াইয়া দিতাম।"

রমেশ এ অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া, খুবই বিস্ময়স্তম্ভিত হইলেন।

কে এ দাতা, কে এ অপরিচিত উদারচেতা মহাত্মা, যে এক কথায় পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা এক নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির ঋণশোধের জন্য গুণিয়া দিয়া, তাহাকে ঋণমুক্ত করিতে পারে!

রমেশ যুক্তকরে বলিলেন—"মহাশয়! আপনাকে কখনও দেখি নাই, আপনাকে আমি চিনিও না। তবু বুঝিতেছি, আজ ভগবান রূপে আপনি আমার মান রক্ষা করিলেন, জান বাঁচাইয়া দিলেন। এ অধম কি আপনার পরিচয় পাইয়া সুখী হইবে না?"

সেই ভদ্রলোকটী সহাস্যমুখে বলিলেন—"রমেশ বাবু! আমার পরিচয় আর একটু বাদে পাইবেন। তবে ভগবান আমি নই, কিম্বা স্বয়ং ভগবান আপনার জন্য আমার মূর্ত্তি ধরিয়া এ ক্ষেত্রে আসেন নাই। ভগবান যেখানকার সেইখানেই বসিয়া তিনি সব ব্যাপারের কলকাটী নাড়িতেছেন। যান—আপনি ঠাণ্ডা হইয়া আসুন। রসিদ খানি ভাল করিয়া রাখিয়া দিন্ গে। আমি এখানে বসিয়া তামাকু খাইতেছি। পরে আমাদের দুজনের আলাপ পরিচয় হইবে। আজ আমি আপনার অতিথি।"

রমেশচন্দ্র তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে দিতে বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। রসিদ খানি তাহার বাক্সের মধ্যে রাখিবামাত্রই তাঁহার পত্নী-কল্যাণী সেখানে রোরুদ্যমান অবস্থায় আসিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! উপায় কি হবে?"

রমেশ প্রসন্নমুখে বলিলেন—"উপায় যা তা হয়ে গেছে। কল্যাণী! তুমি চিরদিনই আমায় বলে আসছো,—ভগবানকে এক মনে ডাক। কোন তোমার বিপদ হবে না। তা—সতী-সাধ্বী

তুমি। আজ তোমার কথা ফলেছে। ভগবান আমাকে এক মহা বিপদে উদ্ধার করেছেন।"

এই কথা বলিয়া রমেশচন্দ্র সমস্ত ঘটনা, তাঁহার পত্নীকে অতি সংক্ষেপে বলিয়া ফেলিলেন। কল্যাণীর চোখের বিষাদাশ্রুধারা তখনই আনন্দাশ্রুতে পরিবর্ত্তিত হইল। সে বলিল—"যাও, যাও, আগে সেই ভদ্রলোককে দেখ গে! কে তিনি তাতো জানি নি। বোধ হয় সেই লজ্জানিবারণ বিপদবারণ মধুসূদনের চক্রে, তিনি এই ঘোর বিপদের সময়, আমাদের মান রক্ষা কর্ত্তে এসেছেন।"

রমেশ এই অসম্ভব ব্যাপারে একাবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। আজকালকার দিনে, যে এরূপ পরোপকারী নিস্বার্থ দাতা এ দুনিয়ায় আছে এরূপ ধারণা তাঁহার ছিল না। যে দুনিয়ায় কেবল নিমকহারামী, স্বার্থের জন্য পরের সর্ব্বনাশ, নাবালক ও বিধবার জীবনের সম্বল অপহরণ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অকারণে গৃহবিচ্ছেদ, সেখানে এমন আদর্শ চরিত্রের পরোপকারী লোক যে থাকিতে পারেন, রমেশ কোন মতেই তাহার রহস্যভেদ করিতে পারিতেছিলেন না।

রমেশচন্দ্র বাহিরে আসিয়াই দেখিলেন, বর আসিয়া পৌছিয়াছে। এরূপ স্থলে সকল বাড়ীতেই একটা হট্টগোলের কাণ্ড হইয়া থাকে। চারিদিক হইতে শঙ্খধ্বনি আর উলুধ্বনির সঙ্গে, এমন একটা গোলমেলে অবস্থা আসিয়া পড়ে, যে সেটার টাল সামলাইতে অনেকক্ষণ চলিয়া যায়।

বর আসনে বসিলে, বরযাত্রগণকে খুব যত্ন খাতির করিয়া

বসাইয়া, রমেশচন্দ্র তাঁহার উদারহৃদয় অপরিচিত বন্ধুর সন্ধানের জন্য চারিদিকে খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন্ না।

তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া, রমেশচন্দ্র যেন দিশাহারার মত হইয়া পড়িলেন। মনে ভাবিলেন, হয়ত তিনি বৈঠকখানার ভিতরে বসিয়া তামাকু খাইতেছেন। কিন্তু বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন, সেখানেও তিনি নাই। তখন আমাদের পাগল ভগবান দুইটী হুঁকা লইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে, দুইজন বরযাত্রীর হাতে দিতেছিল। ভগবানকে দেখিয়া রমেশচন্দ্র সোৎসুকে বলিলেন—"ভগবান! ভগবান! তিনি কোথায় গেলেন?"

ভগবান বলিল—"কার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন বড়বাবু!"

রমেশ। যিনি আজ ভগবানের প্রতিনিধি রূপে, আমার মান ইজ্জৎ জাতি বাঁচাইয়াছেন!

ভগবান। আমি ত তাঁকে চিনি না। তবে ঐ রকের উপর তিনি খানিকটা বসিয়াছিলেন। বরযাত্রগণ তামাকু চাহায়, আমি দুইটা কলিকা সাজিয়া তাহাদের জন্য তামাকু আনিতে গেলাম। পরিচয় লইবার অবসর পাইলাম না। আর তিনি কে তাও ত জানি না!

রমেশচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া খুব একটা মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলেন। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"হায়! কেন আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিলাম।"

ভগবান বলিল—"আপনি কি তাঁর নাম ধাম জানেন না?

রমেশচন্দ্র বিস্ময়স্তিমিতনেত্রে বলিলেন—"না কিছুই না! কপাল।

আমার দেখ ভগবান ! হায় ! এক দেবতার পদধূলি আমার ন্যায় অধমের গৃহ-প্রাঙ্গণে পড়িয়াছিল। দেবতা দয়া করিয়া আমার দেনা শুধিয়া দিলেন। আমার বিপদোদ্ধার করিলেন। কিন্তু তার পর একদণ্ড ও রহিলেন না। হায় ভাগ্য।"

ভগবান বলিল—"আমার বোধ হয়, তিনি এই গ্রামের কোন ভদ্র লোকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। আপনি আপনার কাজ কর্ম্ম দেখুন গে। এতগুলি অভ্যাগত নিমন্ত্রিত আজ আপনার বাটীতে। পরিচর্য্যার ত্রুটি হইলে, ইহাঁরা রুষ্ট হইতে পারেন। বরযাত্রদের কাণ্ড জানেন ত? সকল বাড়ীতেই একটু মনিবানা-চালের। আমি না হয় তাঁহাকে খুঁজিয়া দেখিতেছি। এ গ্রামের সকল বাড়ীই তো আমি চিনি।"

এই কথা বলিয়া রমেশচন্দ্রকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া, ভগবান তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

রমেশচন্দ্র বরযাত্রদের লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে ভগবান ফিরিয়া আসিয়া রমেশচন্দ্রকে বলিল—"না বড়বাবু! তাঁহার কোন সন্ধানই পাইলাম না।"

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! সমস্যার উপর সমস্যা! রমেশচন্দ্র প্রত্যেক বরযাত্রীকেই তাঁহার উপকারী মহাত্মার নামধামের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলেই এক বাক্যে বলিলেন—"তাঁহাকে ত আমরা চিনি না। তিনি আমাদের সঙ্গে আসেন নাই। আমাদের গ্রামের লোকও নহেন।"

এই অদ্ভূত পরোপকারী লোক যে কে, তাহা ভগবানই

কেবল মাত্র জানিত। কিন্তু সে তখন কোন গূঢ় উদ্দেশ্য চালিত হইয়া, ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে গোপন করিল।

এইবার আমরা বিয়েবাড়ীর কথাটা শেষ করিব। বলা বাহুল্য, যথাসময়ে, গোধূলিলগ্নে, বিনাবাধায়, রমেশচন্দ্র তাঁহার আদরিণী কন্যা স্বর্ণপ্রতিমাকে নারায়ণ স্বাক্ষী করিয়া, শ্রীমান নরেশচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করিলেন। বিবাহের কাজ, লোকজন খাওয়ানোর সমস্ত ব্যাপার, নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল। কিন্তু রমেশচন্দ্র এতৎসত্বেও মনের অসুখে রহিলেন। কেননা—তিনি তাঁহার সেই অযাচিত বন্ধু, বিপদে পরিত্রাণকর্ত্তা, সম্ভ্রমরক্ষয়িতা ভদ্রলোকটীর কোন সন্ধানই পাইলেন না।

১৫

কোন এক সংসারের ঘটনাগুলি নিত্য যেমন ঘটিয়া যায়, তাহার যথাযথ বর্ণনা করাই উপন্যাসের কার্য্য। লীলাময় ভগবানের মায়ায় সংসারের চারিদিকে নিত্য যাহা ঘটিতেছে, তাহা কৌশলের সহিত লিপিবদ্ধ করিতে পারিলেই একখানা উপন্যাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। এই রমেশের জীবনে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

রমেশচন্দ্রের কন্যার বিবাহের পর, ঘটনা স্রোত নুতন পথ ধরিল। এই দস্তকী অপমানের বেদনাটা, তাঁহার প্রাণে শেলের মত আঘাত করিয়াছিল। এ জন্য গ্রামের মধ্যে বাস করিতে তাঁহার বড়ই একটা ঘৃণা উপস্থিত হইল। গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা

হইলে, তাঁহার মাথাটা যেন আপনা আপনি হেঁট হইয়া আসিত। অপরিচিত গ্রামের বরযাত্রগণের সম্মুখে, ভবিষ্যৎ কুটুম্বপক্ষীয়গণের সম্মুখে, এই অপমানকর ব্যাপারটা ঘটায়, তাহা আশপাশের গ্রামেও চারিদিকে আগুণের হল্‌কার মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই অপরিচিতের সহসা আগমন, রমেশের সাহায্যের জন্য অর্থদান, এই সব কথা গুলা লোকে যেন উপন্যাসের ব্যাপারের মত খুব তৃপ্তির সহিত আলোচনা করিতে লাগিল।

তারপর, রমেশের একমাত্র সুহৃৎ ও প্রধান সহায় ভগবানও সেই বিবাহের পরদিন হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। প্রায় একমাস অতীত হইতে যায়, তাহারও ত কোন সংবাদ নাই। এরই বা কারণ কি?

বিবাহের পর কন্যা স্বর্ণ-প্রতিমাকে রমেশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে পাঠাইয়াছিলেন। সে আবার পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাঁহার পত্নী কল্যাণী এখন সদাই প্রফুল্লমুখী। কন্যার বিবাহ হইতেছে না দেখিয়া তাঁহার মনে সে একটা পাষাণের ভার চাপিয়াছিল, সেটা তখন সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের দিন-গুলি টাকাকড়ির অভাবে অচল হইয়াছে।

নিয়মই হইতেছে, বাঁধাবাঁধি ফর্দ্দ ধরিয়া এসংসারের কোন কাজই হয় না। একটু দিক ও দিক হইয়া যায়। রমেশচন্দ্রের তাহাই হইল। তিনি বিবাহের জন্য বাজারের বাকীর ফর্দ্দাদি পাইয়া বুঝিলেন— চারিদিক হইতে তাঁহার প্রায় একশত টাকা বাজার দেনা দাঁড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া কন্যা পাঠাইতেও আরও কিছু অতিরিক্ত টাকা ধার হইয়া গিয়াছে।

একটা চাকরী-বাকুরীর চেষ্টা না করিলে আর চলেনা কারণ এদিকে সংসারটা খুব অচল অবস্থায় উপস্থিত। যদিও এক অদ্ভুত উপায়ে তাঁহার বাস্তু এবং বাড়ীখানা রক্ষা পাইয়াছে, তাহাহইলে কি হয়, তাহাতে ত পেট চলিবে না।

রমেশ এই সব চিন্তায় অধীর হইয়া, বড়ই বুকভাঙ্গা হইয়া পড়িলেন। কল্যাণীর সহিত এ বিষয়ের একটা পরামর্শ স্থির করিবার জন্য অন্দরে গেলেন।

স্বর্ণপ্রতিমা তখন এক প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে। বাড়ীতে আর কেহ নাই। কল্যাণী সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া, কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল—রমেশচন্দ্র ঘোর চিন্তামগ্ন। তাঁহার মুখে দিন দিন কে যেন কালী ঢালিয়া দিতেছে। চক্ষুদ্বয় কোটরমধ্যে প্রবিষ্ট। তাহার মুখের সেই সমুজ্জ্বল কান্তি, যেন কন্যার বিবাহের পর হইতে, দিনে দিনে বিশ্রী হইয়া যাইতেছে।

কল্যাণীর রমেশের নিকটে আসিয়া, তাহার হাত দুখানি ধরিয়া স্নেহময় স্বরে বলিলেন—"কি ভাবছো? দিনে দিনে এমন হয়ে যাচ্ছো কেন?"

রমেশ একথার উত্তরে কেবল মাত্র একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহাতেই তাঁহার গভীর মর্ম্মবেদনা ফুটিয়া উঠিল।

কল্যাণী বলিল—"তোমার প্রধান ভাবনা যা; তাতো চুকে গেছে। কন্যাদায়ের মত তো দায় আর নেই। তারপর এক অদ্ভুত উপায়ে বাড়ী ও বাগান খানা বেঁচে গেল,। তবে এখনও বৃথা ভাবছো কেন বল দেখি?"

রমেশ। কি বল্‌বো কল্যাণী! কেন ভাব্‌ছি? সে দিনের অপমানের কথাটা মনে হলে, এখনও আমার গা শিউরে উঠে। তারপর স্বর্ণর বিয়ের জন্য বাজার দেনা একশো টাকা দাঁড়িয়ে গেছে। ভগবানের দরুণ হ্যাণ্ডনোটের দেনা চারশো টাকা। বাজারের দোকানদারদের তাগাদার জন্য আমার পথ চলবার যো নেই। শুন্‌ছি, সেই কালীকিশোর ব্যাটা বাজারের সব দোকান-দারদের নাচিয়ে দিচ্ছে।"

কল্যাণী। যদি একশো টাকা হলেই তোমার এ জ্বালা মিটে যায়, আমি এখনিই তার উপায় কচ্ছি।

রমেশ। টাকা কোথা পাবে তুমি?

কল্যাণী। যেখানেই পাই না কেন, তোমার পেলেই তো হলো?

রমেশ। টাকা কোথায় পাবে, একথা না বল্‌লে কখনই আমি টাকা নোব না।

কল্যাণী। শোন তবে তোমায় বলি। যতদিন তুমি চাকরী করেছ, আমার হাত খরচের জন্য তুমি ফি মাসে দশটাকা করে দিয়েছ। তা থেকে খরচ পত্র আমি খুব কম করেছি। টাকাটা জমিয়ে, বিশ পঞ্চাশ করে আমি সইকে ধার দিয়েছিলুম। একশো টাকা সুদে আসলে দেড়শো হয়েছে। এখন তাদের সময় ভাল। সই কাল আমাকে সে টাকাটা ফেরত দিয়ে গেছে।

রমেশ এ কথায় যেন প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। সানন্দ চিত্তে বলিলেন—"কল্যাণী! তোমায় আশীর্ব্বাদ করি—"

কল্যাণী রমেশের এই কথায় বাধা দিয়া সহাস্যমুখে বলিল, "আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার পায়ের তলায় সিঁথার সিন্দুর পরিয়া আমি মরিতে পারি।"

রমেশ বলিলেন—"না—না; ও কথা বলো না—কল্যাণি! আমার সব গেছে, একমাত্র ঐশ্বর্য্য আছ তুমি। একমাত্র আশা-ভরসা সান্তনার শক্তি তুমি। ও কথা শুনলে আমার বড় ভয় হয়।"

কল্যাণী বলিল—"স্বামির পায়ে মাথা রেখে মরার চেয়ে স্ত্রীলোকের আর কি সৌভাগ্য আছে বল দেখি? যে স্বামী সেবা করে, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মর্ত্তে পারে, তার চেয়ে সৌভাগ্য-বতী, স্ত্রীলোক যে ত্রিজগতে নেই। যাক্ এখনও সব কথা। তুমি আজই বিকেলে গিয়ে, বাজার দেনাটা শোধ করে দাও।"

এই কথা বলিয়া, কল্যাণী তাহার ট্রাঙ্ক খুলিয়া একটী ক্ষুদ্র ক্যাশ বাক্সের মধ্য হইতে দশটাকার দশ খানি নোট বাহির করিয়া রমেশের হাতে দিল। রমেশ তাহা হাতে করিয়া লইয়া প্রাণে যেন, একটা শান্তি পাইলেন। বুঝিলেন—কল্যাণীর মত গুণবতী পত্নী না পাইলে, তাঁহার সংসার একেবারে অচল হইয়া উঠিত।

রমেশ কল্যাণীর হাতে সেই টাকাগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি একটু ঘুমাইয়া নাও এইখানে। এই অভাবের দিনে টাকা গুলো ভাল করে রেখে দাও কল্যাণী! আমি বাহিরে গিয়ে একটুকু গড়িয়ে নিই। তারপর বৈকালে বাজারে যাবো।"

রমেশ বাহিরের বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন। কল্যাণী নোট-

গুলি বিছানায় মাথার বালিশের নীচে রাখিয়া, ঘরের মেঝেয় একটী ছোট মাদুর পাতিয়া, একটু আলিস রাখিবার চেষ্টা করিল। শুইবামাত্রই শ্রান্তি নিবন্ধন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

রমেশও কল্যাণীর মধ্যে যা-কিছু কথোপকথন হইতেছিল, একজন কৌতুহলচালিত হইয়া তাহা দ্বারের আড়াল হইতে শুনিল। এ সেই প্যালার মা। রমেশের নব নিয়োজিত ঠিকা ঝিও কালীকিশোরের নিয়োজিত গুপ্তদূতী। যে রমেশের ঘরের সকল কথা এই কালীকিশোরকে জানাইয়া আসিত।

প্যালার মা সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া, মনে মনে বড়ই সুখী হইল। সে রান্নাঘরের পাট সারিবার জন্য, চুপিসাড়ে রান্নাঘরে চলিয়া গিয়া, ঘর নিকাইতে লাগিল। কল্যাণী ও রমেশ জানিতে পারিলেন না, যে তাঁহাদের নব নিয়োজিত ঝি, তাঁহাদের সকল কথাই শুনিয়া গেল। আর কল্যাণীও শয়নের পূর্ব্বে জানালার মধ্য দিয়া দেখিয়াছিল, যে প্যালার মা রান্নাঘরের সকড়ী বাসন বাহির করিয়া ঘর নিকাইতেছে। কাজেই তাহার কোন সন্দেহই হয় নাই।

প্যালার মার বরাবরই একটু হাতটান রোগ ছিল। সে ঘোর শয়তানী। আর শয়তানী না হইলে, শয়তান কালীকিশোরের তাহার এত মেশামিশি ভাব কেন!

প্যালার মা মনে মনে ভাবিল—"এদের আজকাল যেমন দুরবস্থা দেখ্‌ছি, মাইনে যা পাব তা অষ্টরম্ভা। কালীকিশোর বাবু যখন আমার সহায়, তখন আর আমায় ধরে কে? এই সুযোগে যদি ঐ একশো টাকা সরাতে পারিত বড় মজা হয়। কালীকিশোর বাবু

একথা শুন্‌লে বড়ই খুসী হবে। ফাঁকতালে একশোখানেক টাকা আমার হয়ে যাবে।

শয়তানী উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিল। তারপর কল্যাণীকে সে নিদ্রিতা দেখিয়া, অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

কল্যাণী অঘোরে ঘুমাইতেছে। উপরের বিছানায় বালিসটার নীচে নোটগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্যালার মা, অতি দুঃসাহসে ভর করিয়া, সেই নোট কয়খানি হস্তগত করিল।

তার পর সে চুপিসাড়ে পা টিপিয়া, তখনই খিড়কীর দ্বার দিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। রমেশের বাড়ী হইতে কালীকিশোরের বাড়ী দশ মিনিটের পথ। সদর রাস্তা দিয়া যাইতে গেলে একটু বেশী সময় লাগে। এজন্য সে বাগান পার হইয়া, একখানা ছোট ক্ষেত ঘুরিয়া, একাবারে কালীকিশোরের খিড়কীতে পৌঁছিল।

খিড়কীতে পৌঁছিবামাত্রই, সে খোঁকা বাবুকে খিড়কীর ঘাটে দেখিতে পাইল। অন্নদা তখন চার ফেলিয়া, তাহাদের খিড়কীর পুখুরে মাছ ধরিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। অন্নদাকিশোর প্যালার মাকে দ্রুতপদে আসিতে দেখিয়া বলিল—"হাঁ রে প্যালার মা! অত হাঁপাচ্ছিস্‌ কেন র‍্যা!"

প্যালার মা চারিদিকে উঁকি মারিয়া দেখিল, খিড়কীতে আর কেহ নাই। সে একটু দম লইয়া, সমস্ত কথা সংক্ষেপে অন্নদাকে বলিল।

অন্নদা বলিল "বেশ করেছিস্‌। দেখ্‌ছি খুব বাহাদুর তুই!

তোকে ধরে কে প্যালার মা! নোট গুলো আমার কাছে রেখে যা। বাবু ঘুমুচ্ছেন। উঠলে তাঁকে দেখাব আর সব কথা বল্‌বো। রমশা ব্যাটা সে দিন আমায় বড় অপমানটাই করেছিল। ব্যাটার চারদিকে খুঁচ্‌রো দেনা। আমিও সব দোকানদারকে টুইয়ে দিয়েছি। এবার তারা নালিশ কল্লে বলে।"

প্যালার মা বলিল—আচ্ছা "খোকা বাবু! এখন আমার কি আর ও বাড়ীতে যাওয়া উচিত?"

অন্নদা বলিল—"খুব উচিত। তুই সেখানে ফিরে গিয়ে একটা সুবিধা মত যায়গায়, মাদুর পেতে আচ্ছা ক'রে ঘুমুগে যা। ওরা যদি ডাকাডাকি করে, তাহলে চট্‌ করে উঠিস্‌ নি। না গেলে ওরা তোকেই সন্দেহ কর্ব্বে। যা—শীঘ্র সেখানে যা। তোর কোন ভাবনা নেই প্যালার মা। ও নোট তোরই জন্যে তোলা থাক্‌বে।"

ফিরিয়া আসিতে প্যালার মার আরও দশ মিনিট লাগিল। সে দেখিল, কল্যাণী তখনও সেই ভাবে ঘুমাইতেছে।

তখন সে একটী মাদুর লইয়া, ভাঁড়ার ঘরের দাওয়ায় তাহা বিছাইয়া শয়ন করিল। সেইখানেই সে প্রাত্যাহিক খাটা খাটুনির পর এই ভাবেই শয়ন করে।

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে, প্যালার মা সত্যসত্যই ঘুমাইয়া পড়িল। কালীকিশোরের বাড়ী হইতে প্রত্যাগমনের পর প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে। ঠিক এই সময়ে কল্যাণী জাগিয়া

মুখে হাতে জল দিবার জন্য বাহিরে আসিয়া কল্যাণী দেখিল,

যে প্যালার মা ভাণ্ডার ঘরের দাওয়ায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। বেলা প্রায় চারিটা বাজিয়া গিয়াছে।

কল্যাণী কক্ষমধ্যে আসিয়া দেখিল, নোটের তাড়া বালিশের নীচে নাই। সে ভাবিল, হয়তঃ রমেশ তাহাকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া হয়তঃ সেই তাড়াটী লইয়া গিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে রমেশচন্দ্রেরও নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি মুখ হাঁত ধুইয়া, এক ছিলিম তামাকু পোড়াইয়া, বাড়ীর ভিতরে আসিলেন।

কল্যাণী তাহাকে দেখিয়া বলিল—"তুমি এখনও বাজারে যাও নাই ?"

রমেশ। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া দেরী হইয়া গিয়াছে। এখনি যাইতেছি। নোট গুলো আমায় দাও।

কল্যাণী একথায় চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন—"সে কি ? নোট তুমি নিয়ে যাও নি ?"

রমেশ। এই ত আমি বাড়ীর ভিতরে আস্‌ছি কল্যাণী!

কল্যাণী তখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া সমস্ত বিছানার বালিস সরাইয়া, ওলট পালট করিয়া দেখিল, কোথাও নোট নাই। সে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—"এ সর্ব্বনাশ করলে কে ?"

রমেশ সবিস্ময়ে বলিল—"সে কি! নোট গুলো তবে গেছে নাকি ?"

কল্যাণী। যখন পাচ্ছি নি তখন গেছে বই কি!

রমেশ। তুমি বাক্সের মধ্যে রাখনি ত ?

কল্যাণী। না—গো—না। মনে ভাবলুম শরীরটা আলিস্যি

করছে। মেঝেয় একটু গড়িয়ে নিই। নোট গুলো বিছানায় এই বালিসের নীচেই চাপা ছিল। আমি মেঝেয় শুয়েছিলাম।

রমেশ। আর কেউ এ ঘরে আসেনি ত?

কল্যাণী। ভগবান জানেন! আমি ত কাকেও আস্‌তে দেখি নি।

রমেশ সবিস্ময়ে বলিলেন—"ঠিকে ঝি প্যালার মা কোথায়?"

কল্যাণী বলিল—"সে ভাঁড়ার ঘরের দাওয়ায় পড়ে ঘুমুচ্ছে।"

রমেশ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বেশ্ হয়েছে! আপদ গেছে। আমার মত হতভাগ্যের কপালে এই রকমই এখন হবে। আচ্ছা তুমি যখন শুয়ে ছিলে, তখন প্যালার মা কোথায় ছিল?"

কল্যাণী। সে তখন সকৃড়ী পাড়ছিল—দেখেছি।

রমেশ। তা হলে এ কাজ ঐ প্যালার মার। মাগীটার হাত টান রোগ আছে, একথা আমি শুনেছিলুম। তবে বের সময় একজন ঝির দরকার বুঝে, আর অন্য লোক না পাওয়াতেই ওকে রেখে-ছিলুম। মনে ভেবেছিলুম আমাদের আর কি আছে যে ও নেবে। এখন দেখছি আক্কেল হল।

কল্যাণী বলিল—"দেখ যা নিজের চোখে দেখি নি, তা বলা ঠিক নয়। তা'তে পাপ হয়। বিশেষতঃ না দেখে শুনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পেয়ে, কাউকে চোর অপবাদ দেওয়াটা ঠিক নয়। হ'তে পারে ওর হাতটান আছে। তা চালটা, ডালটা, নুন্‌টার ওপর দিয়েই সেটা যাওয়া সম্ভব। কিন্তু তাও ত এ পর্য্যন্ত একদিনও

দেখিনি। ওর কি এত সাহস হবে, যে আমার ঘরে ঢুকে বালিসের নীচে থেকে টাকা চুরী করবে? এক আধটা টাকাতো নয়, এক-একশো টাকা।"

রমেশচন্দ্র কল্যাণীর নিষেধ বাক্য না শুনিয়া, নিদ্রিতা প্যালার মার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। প্যালার মা তখন জাগিয়া উঠিয়া ছিল। কারণ এই সব চেঁচামেচিতে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে চোখ বুজিয়া সব কথাই শুনিতেছিল।

রমেশচন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"প্যালার মা! ও প্যালার মা!"

প্যালার মা স্বপ্নোত্থিতের মত উঠিয়া,চোখ্ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল—"কেন গা বাবু?"

রমেশ। বালিশের নীচে একশো টাকার নোট ছিল—তুই নিয়েছিস কি?

প্যালার মা ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"ও মা! সেকি ঘেন্নার কথা গো! হাঁ-গা বাবু তুমি বলছো কি? গরীব দুঃখী লোক আমরা, গতর খাটিয়ে খাই বলে কি আমরা চোর?"

রমেশচন্দ্র প্যালার মার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বলিলেন—"তুমি যে চোর—সে সে কথা তো অমি বল্‌ছি না। বালিশের নীচে নোট গুলো রাখা ছিল, যদি তুমি কুড়িয়ে পেয়ে থাকো, আর আমাদের অসাবধানতার শাস্তি দেবার জন্য লুকিয়ে রেখে থাকো, তাই জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি।"

প্যালার মা—মাটীতে আঙ্গুল মট্‌কাইয়া বলিল—"যে নোট

ছুঁয়েছে, তার হাত যেন নোটের মত সাদা হয়ে যায়। সে যেন চোখের মাথা খায়। ওমা পেটের দায়ে খাট্‌তে এসে, এই কলঙ্ক গা। কি ঘেন্না মা!”

প্যালার মার স্নুর পঞ্চমে উঠিল। তারপর সে কান্না ধরিল। একটা নূতন বিভ্রাট উপস্থিত দেখিয়া, কল্যাণী সেখানে উপস্থিত হইয়া প্যালার মাকে বলিল—“যা হবার তা হয়ে গেছে। আমাদেরই কপালের দোষ। যা তুই সংসারের কাজ কর্‌গে যা।”

প্যালার মা বলিল—“না বাবু! এমন ঘরে আমরা কাজ কর্ত্তে চাই নি। গতর খাটিয়ে খাব, তার ওপর আবার চোর অপবাদ। ছিঃ! ছিঃ! কি ঘেন্না! কি লজ্জা মা। চাকরি কি আর জুট্‌বেনি গা। তা তোমরা আমার পাওনা গণ্ডা চুকিয়ে দাও। আমি আর কাজ করবো না।”

কথায় আছে, অনেক সময়ে অঁটিতে না পারিলে, লোকে কাঁদিয়া জেতে। প্যালার মারও এ ক্ষেত্রে তাই হইল! সে বাজী জিতিল।

প্যালার মা—কোন মতেই কাজ করিবে না দেখিয়া, কল্যাণী তাঁহার বাক্‌সো হইতে আড়াইটী টাকা বাহির করিয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন—“তোর আর কাজ কর্ত্তে হবে না। এই নে তোর মাইনে। যা চ’লে যা।”

প্যালার মা যাইবার সময় হাত ঘুরাইয়া বলিয়া গেল—“আমায় যেমন দাগা দিলে,—তেমনি দাগা পেতে হবে। দেখি ধর্ম্ম আছে কি না? সর্ব্বনাশ হবে—যে আমাকে মিথ্যে কলঙ্ক দেবে।”

কল্যাণী প্যালার মার মুখে এই অভিশাপ বাক্য শুনিয়া, ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। তারপর সে ধীর ভাবে, রমেশকে বলিল—"দেখ দিকি মাগীর আস্পর্দ্ধাটা। আমার মনে হচ্ছে, ঐ মাগীই নিশ্চয়ই আমাদের টাকা নিয়েছে। তবে যখন কেউ চোখে দেখেনি তখন ওকে জুলুম করার ত কোন ফল নেই। আমাদের শত্রু অনেক। এখনি একটা কাণ্ড বেধে যাবে।"

রমেশচন্দ্র বলিলেন—"একথা সত্য বটে কল্যাণী! কিন্তু এখন যে একটা টাকা, আমার পক্ষে একটা মোহরের মত। এক এক শো টাকা সহজ কথা ত নয়! আমি না হয় একবার দারোগার সঙ্গে পরামর্শ করে আসি।"

কল্যাণী বলিল—"না গো—না, ও কাজ করোনা। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা! আমাদের এই দুঃসময়ে থানা-পুলিস কর্ত্তে গিয়ে শেষ কি ফের আবার একটা নূতন বিভ্রাট ঘটাবে। তার চেয়ে বাজারে গিয়ে দোকানদারকে বলে এসো, আর এক হপ্তা বাদে টাকাটা শোধ ক'রে দোব।"

রমেশচন্দ্র অগত্যা কল্যাণীর কথাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া ভাবিলেন। তারপর চাদর খানি কাঁধে ফেলিয়া তিনি বাজারের দিকে চলিলেন।

(১৬)

বাজারের মধ্যে যেটি প্রধান দোকান, তাহার সঙ্গেই রমেশচন্দ্রের কারবার। দোকানীর নাম রতন শা। সে জাতিতে গন্ধ বণিক। কালিকাপুরেই তাহার বাস। আর রমেশচন্দ্রের সুখের

দিনে, সে অনেক টাকার কারবার তাঁহার সহিত করিয়াছিল।

রমেশ দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—রতন একমনে তাহার হিসাবের খাতা লিখিতেছে।

রমেশকে দেখিয়াই রতন একটু খাতিরের সহিত বলিল—"আসুন বড়বাবু! আর কিছু মাল টাল চাই না কি?"

রমেশ একথায় একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"না—এখন আর কিছু চাই না রতন। তবে তোমার পাওনা টাকাটা দিতে বোধ হয় আরও এক সপ্তাহ দেরী হবে।"

রতন বলিল—"সে কি বড়বাবু! বলছেন কি আপনি? আপনার কাছে পাওনা টাকা ত অনেক দিন হ'লো, জমা হয়ে গিয়েছে!"

রমেশ একটা মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। কি যে জবাব দিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কারণ এ টাকা শোধ করিল কে?

রতন দেখিল, রমেশচন্দ্র কথাটা বিশ্বাস করিতেছেন না। এজন্য দোকানের খস্‌ড়া বহিখানার পাতা উল্টাইয়া সে রমেশকে বলিল—"এই দেখুন! আপনার নামে জমা হয়েছে। পরশু ঠিক এমনি সময়ে, ভগা পাগলা এসে, আপনার টাকা দিয়ে গেছে। সে আরো বল্লে আপনার জ্বর বোধ হয়েছে বলে আপনি নিজে আস্‌তে পাল্লেন না।"

তখন রমেশচন্দ্র সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"হাঁ—হা, সে কথাটা আমার মনেই ছিলনা।"

রমেশকে একটু আপ্যায়িত করিবার জন্য রতন বলিল—"আপনাদের যে নানাদিকে ভাব্‌তে হয় বড়বাবু! সব সময়ে অনেক কথা মনে থাকে না।" এই কথা বলিয়া সে তাহার দোকানের ওজনদার নফরচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও নফর! বড়বাবুকে একটু তামাক খাওয়াও।"

নফর তামাক সাজিতে যাইতেছে দেখিয়া, রমেশচন্দ্র বলিলেন— তামাক খাওয়া আজ থাক। আমার বাজারে আর একটা কাজ আছে। এখন তবে উঠি রতন।"

রমেশ সেই দোকান হইতে বাহির হইয়া অদূরবর্ত্তী আর একটী দোকানে গেলেন। এটী ময়রার দোকান। গণেশ ময়রা এই দোকান করে। গণেশ রমেশকে দেখিয়া খাতির করিয়া বসাইয়া বলিল—"তামাক ইচ্ছে করুন। তা এদিকে কি মনে করে?"

রমেশ বলিলেন—"তোমার হিসেবটা একবার দেখ তো গণেশ? কত পাওনা আমার কাছে?—"

গণেশ বলিল—সেই বিয়ের দরুণ বাকীটা তো? তা আমার মনেই আছে। আপনার বাকী ছিল গে—এই কুড়িটাকা সাড়ে নয় আনা। তা বড়বাবু! সে হিসেব ত ভগবান এসে মিটিয়ে দিয়ে গেছে। তবে—গত বৎসরের জেরের দরুণ মোট দশ আনা পয়সা খাতায় লেখা আছে বটে! তা সেটা আর আমি চাইনে। অনেক টাকা আপনার খেয়েছি।"

রমেশচন্দ্র, দোকান হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"না—না ওটা আমি একদিন দিয়ে দোব?"

বিস্মিতচিত্তে রমেশচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন—"ভগবান! ভগবান! জানিনা তুমি আমার কে? আমাকে যে তুমি এমন করিয়া ঋণ ডোরে বাঁধিয়া রাখিতেছ, কিন্তু তোমার এ ঋণ কি জীবনে আমি শোধ করিতে পারিব? না—না আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার প্রকৃত স্বরূপ আমি এখনও বুঝিতে পারিলাম না। আমার কন্যাদায় উদ্ধারের মূল তুমি। আমার বাস্তুভিটাটি রক্ষারও কারণ তুমি। যে অপরিচিত ভদ্রলোক সেদিন আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছিলেন—তিনি নিশ্চয়ই তোমার পরিচিত লোক। সহোদর ভাই যা পারে না, মা বাপে যা পারে না, আমার অতুল ঐশ্বর্য্যশালী মাতুল যাহা করিতে পারেন নাই, তা তুমি করিয়াছ। তুমি নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ। তোমার কাজকর্ম্ম ঠিক যেন সেকালের ঠাকুর দেবতার মত! এবার তোমার দেখা যদি পাই, তাহা হইলে তোমার পায়ে আমি পুষ্পাঞ্জলি দিব।"

এই কথাগুলি মনে মনে বলিতে বলিতে, রমেশচন্দ্রের চক্ষুদ্বয় কৃতজ্ঞতার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এই সময় ভগবানকে পাইলে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলি—"কে বলে তুমি পাগল—ভগবান? জ্ঞানীর চেয়েও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান তোমার। মহত্ত্বের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মহত্ব তোমার। আমার মত হীন দীনের উপর তোমার এত করুণা?"

রমেশচন্দ্র বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া, রুদ্ধস্বরে ডাকিলেন—"কল্যাণী! শুনে যাও একটা অদ্ভুত কথা!"

কল্যাণী তখন রান্নাঘরে রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। রমেশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর চাপা চাপা। সে ভাবিল—নিশ্চয়ই একটা কিছু কাণ্ড ঘটিয়াছে। হয়তো দোকানদার তার করার মত টাকা না পাইয়া, তাঁহাকে কোন কড়া কথা বলিয়াছে।

কল্যাণী তখনই রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল—"কেন গা! ব্যাপার কি? তোমার আওয়াজটা অত ভারি ভাঁরি কেন?"

রমেশ বলিলেন—"কল্যাণী। সাধ্বী পত্নী আমার! তোমার কথাই সত্য। ভগবানে যে একান্ত বিশ্বাস করে, তার মার নাই। কথায় বলে—রাখে কৃষ্ণ মারে কে? ব্যাপার অতি অদ্ভূত। পাগল ভগবান আমার সকল বাজার দেনা শোধ করিয়া দিয়াছে! কে এই ভগবান কল্যাণী! কোথা হইতে এই পাগলা আসিয়া আমায় পাগল করিল।"

কল্যাণী সবিস্ময়ে বলিল—"আমাদের ভগবান্? বল কি?"

রমেশচন্দ্র কৃতজ্ঞতাপ্লাবিত হৃদয়ে বলিলেন—"হাঁ—এখন সে আমাদের মত নষ্টভাগ্যের ভগবানই বটে। আমাদের ষোল আনা দুঃখ অভাবের ভার যখন সে ঘাড়ে করিয়া লইয়াছে, তখন আমাদের ভগবান নয় ত আর কার কল্যাণী!"

কল্যাণী, মনে মনে ভগবানকে যে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সে রমেশচন্দ্রকে বলিল—"দেখ! আমার বোধ হয়, ঐ ভগাপাগ্‌লা কোন মহাপুরুষ। লোকের উপকারের জন্য এই ভাবে পাগল সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

রমেশ। নিশ্চয়ই তাই! সে তার প্রত্যেক কাজে, আমাদের একটা গভীর ঋণে আবদ্ধ কচ্ছে। তার ঋণ শোধ করবো কেমন করে?

কল্যাণী। আসল ভগবানকে ডাক। নকল ভগবানের ঋণ শোধ হয়ে হয়ে যাবে।

কল্যাণীর এই কথায় রমেশচন্দ্র প্রাণে একটা শান্তি পাইয়া, বাহিরে বৈঠকখানায় চলিয়া গেলেন।

১৭

দিন কাহারও অপেক্ষায় থাকে না। কাজেই রমেশচন্দ্রেরও দিন গুলি কাটিতে লাগিল। স্বর্ণপ্রতিমার বিবাহের পর আরও তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। রমেশচন্দ্র এই তিন মাসকাল ভগবানের সাক্ষাৎ কামনা ক্রমাগত করিয়া আসিয়াছেন, তবুও তার দেখা পান নাই। গ্রামের অনেক লোককে তিনি ভগবানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। গৌরদাস বাবাজীর আখ্ড়াতেও তিনি সন্ধান লইয়াছেন, কিন্তু তাহার কোন সন্ধানই পান নাই।

বিবাহের পর তিনি দুইবার জামাতা নরেশচন্দ্রকে নিজ বাটীতে আনিয়াছিলেন। নরেশচন্দ্র স্বর্ণপ্রতিমার মত রূপসী ভার্য্যা লাভ করিয়া, নিজেকে বড়ই সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিয়াছিল। তাহার উপর শ্বশুর শ্বাশুড়ীর যত্নে আদরে, সে বড়ই তৃপ্ত ও চরিতার্থ হইল। আর নরেশের বিনম্র ব্যবহার, গুরুজনে ভক্তি দেখিয়া রমেশ ও কল্যাণী বড়ই সুখী হইলেন।

আর স্বর্ণপ্রতিমা! সে যেন বিবাহের জল পাইয়া, বর্ষার দুকুল-

ভরা তরঙ্গিণীর মত কুলেকুলে পুরিয়া উঠিয়াছে। সে দেহের কান্তি আরও জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। কিশোর যৌবনের সন্ধির লক্ষণ, তাহার সর্ব্ব শরীরে প্রকটিত। সে মূর্ত্তি যেন সত্যসত্যই সোনার প্রতিমা। তাহা অলঙ্কার দিয়া সাজাইবার আর কোন প্রয়োজনই নাই।

বাহিরের রূপ লইয়াই যে আমাদের এই স্বর্ণপ্রতিমার বিকাশ তাহা নয়। সে তাহার মায়ের সমস্ত গুণ গুলিই পাইয়াছিল। পিতার সুখের দিনে, ঝি চাকরের কোলে মানুষ হইলেও, সেই স্রষ্টা বিধাতা, তাহাকে মাতার ন্যায় সহিষ্ণু করিয়া তৈয়ারী করিয়াছিলেন। সে এখন বাল্যস্বভাবসুলভ চাপল্য, খেলা ধুলা ত্যাগ করিয়াছে। যৌবন স্বভাবসুলভ একটা গাম্ভীর্য্য তাহাকে অধিকার করিয়াছে।

শ্বশ্রূ গৃহে গিয়া, শাশুড়ীর সেবা যত্ন করিয়া, সে খুব একটা সুনাম কিনিয়া আসিয়াছে। আর বাড়ীতে এখন সংসারের সকল কাজেই সে তাহার মায়ের সঙ্গিনী ও সাহায্যকারিণী।

এক দিন রমেশচন্দ্র ও কল্যাণীর মধ্যে একটা বড়ই সঙ্গীন গোছের কথা বার্ত্তা হইতেছিল। এই কথা বার্ত্তার দিনের সন্ধ্যার প্রাক্কালে, রমেশচন্দ্র ডাকে একখানি পত্র পাইয়াছেন।

সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া, আহারাদির পর কল্যাণী নিশ্চিন্ত চিত্তে ঘরের মধ্যে আসিলে, রমেশ তাহাকে বলিল—"একটু স্থির হয়ে বসে কথাগুলো শুনে যাও। কল্যাণী! বোধ হয় ভগবান আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন!"

তার পর একখানি চিঠি হাতে লইয়া, রমেশচন্দ্র বলিলেন—"আমার এক বন্ধু কলিকাতায় ডন্‌কান্ ব্রাদার আফিসের এজেন্সি বিভাগের বড় বাবু। তিনি বেনারসের এজেন্সিতে আমার একটী চাকরী যোগাড় করিয়াছেন। বেতন আশি টাকা। পরে একশো হইবে। আমাকে দুই এক দিনের মধ্যেই রওনা হইতে হইবে। এরূপ ভাবে, এ অবস্থায় ঘরে বসিয়া থাকিলে দিন চলা যে দায়।"

কল্যাণী এই কথা শুনিয়া হরিষ ও বিষাদের সন্ধিস্থলে পড়িল। সত্যই তাহাদের দিন অচল হইয়া আসিতেছিল। ভগবানের প্রদত্ত, পূর্ব্বের চার্ শো, আর বাজার দেনার একশো এই টাকা শোধ না করিয়া অন্নগ্রাস মুখে দেওয়া, কল্যাণীর বড়ই কষ্টকর বোধ হইতেছিল। কাজেই সে একথায় কোন রূপ বাধা না দিয়া বলিল—"তা নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু আমাদের এখানে চলিবে কি করিয়া?"

রমেশ বলিলেন—"তাহাহইলে কাল আমায় কলিকাতায় গিয়া এই বন্ধুর সহিত তাঁহার আফিসে দেখা করিতে হইবে। যদি কাল কিম্বা পরশু চাকরীটা পাকা হইয়া যায়, তাহা হইলে আমি বোধ হয় এক মাসের বেতন অগ্রিম পাইব। সেই টাকাটা তোমায় দিয়ে গেলে সংসার চলিয়া যাইবে।"

কল্যাণী বলিল—"তাহা হইলে আমাদের সঙ্গে লওনা কেন?"

রমেশ। নূতন অজানা স্থান। তোমাদের কোথায় লইয়া যাইব কল্যাণ! আগে আমি স্থির হইয়া বসি। তার পর এইরূপ ব্যবস্থাই হইবে।

কল্যাণী। কিন্তু আমাদের এখানে দেখিবে কে?

রমেশ। মাস খানেক কোন রকমে কাটাইয়া দাও। নরেশের চাকুরী গিয়াছে। সে বাড়ীতে বসিয়া আছে। তাহাকে আসিতে লিখিয়াছি। আর তর্কচূড়ামণি মহাশয়, আমায় চিরদিনই পুত্রবৎ স্নেহ করেন। মুরারী তোমাকে বড় ভাজের মত সম্মান করে। এরা সর্ব্বদা তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। আর আমি একজন ঝি রাখিয়া যাইব। সেই আমাদের পুরাণো ঝি, যে স্বর্ণকে মানুষ করিয়াছিল। সে তার দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে বোধ হয় কাল আসবে।

কল্যাণী বলিল—"তা হ'লে মন্দ হয় না। সে বড় চৌকষ। আর কোন ভয়ই আমার থাকে না, যদি আমার ভগবান এই সময়ে আমায় মাঝে মাঝে দেখা দেয়। সে যে আমার পেটের ছেলের চেয়েও অধিক।

এই ভাবে কথা বার্ত্তা শেষ করিয়া, রমেশ সেদিন খুব নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেল। এমন সুনিদ্রা অনেক দিন তাহার হয় নাই।

পরদিন অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া রমেশচন্দ্র প্রাতঃকৃত্যাদি সারিল। আজ তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে। বেলা দশটার সময় একখানি ট্রেন আছে। রমেশ যথাসময়ে সেই ট্রেন্ ধরিয়া, মধ্যাহ্নকালে কলিকাতায় তাহার বন্ধুর অফিসে পৌছিল।

রমেশের এই বন্ধুটী ভবানীপুরের অধিবাসী। তাহার সহপাঠী। সে রমেশচন্দ্রকে দেখিয়াই বলিল—"তোমার সার্টিফিকেট

গুলি আনিয়াছ ত? ও কথাটা লিখিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম।"

রমেশ বলিল—"ভাই! তা আর বল্‌তে। কিন্তু এ চাকরীটা লেগে যাবে তো!"

রমেশের এই সহতীর্থের নাম অজিত বাবু। অজিত বলিলেন—"লেগে যাবে বই কি! সাহেবকে বলে কয়ে সব ঠিক করেছি। তবে হাজারখানেক টাকা সিকিউরিটী ডিপজিট্ চাই।"

রমেশচন্দ্র ডিপজিটের কথা শুনিয়া, একাবারে দমিয়া গেলেন। যাহার হাতে একটী কপর্দ্দকও নাই, সে হাজার টাকা ডিপজিট্ দিবে কি করিয়া?

রমেশ কপালে মৃদুভাবে করাঘাত করিয়া বলিলেন—"হাঃ আমার অদৃষ্ট! আমার হলো—অষ্টভক্ষ ধনুর্গুণের অবস্থা। হাজার টাকা এখন আমি কোথায় পাব ভাই অজিত!"

রমেশচন্দ্র পরিশেষে অজিতকে তাহার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সমস্ত কথাই বলিয়া ফেলিল।" অজিত সমস্ত কথা শুনিয়া বলিল—"তাই তো! এখন উপায়! আমাকে দেখ্‌ছি সাহেবের কাছে দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত হতে হবে! আমি যদি জানতুম, যে তোমার এ অবস্থা, তাহ'লে বোধ হয় এতটা অগ্রসর হতেম না।"

রমেশ বলিল—"আমি যাই বঙ্গে, আমার কপাল যায় সঙ্গে।" দুঃখ কষ্টই আমার ভাগ্যলিপি। গ্রহচক্র আমার প্রতি অতি বিরূপ। তাহা না হইলে এমন ঘটিবে কেন?"

অজিত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। তার পর বলিল—

"হাঁ ভাল কথা মনে পড়েছে! তুমি যখন কল্‌কেত্তায় এসেছ, তখন না হয় একবার ভবানীপুরটা ঘুরে এস না কেন?"

রমেশ। ভবানীপুরে গিয়ে কি করবো?"

অজিত। তোমার মামা মৃত্যুঞ্জয় বাবু একজন জমিদার। তাঁর কাছে চাইলে কি তিনি এই ডিপজিটের টাকাটা তোমায় দিতে পারেন না?

রমেশ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল —"তাঁর কাছে মুখ দেখাবার পথ কি আমি রেখেছি ভাই? যদি সে পথই আমার খোলা থাক্‌বে, তা হলে আমি চাকরিই বা কর্ত্তে যাব কেন?"

অজিতনাথ কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিয়া বলিল—"আচ্ছা আমি না হয় তোমায় হাজার টাকা ঋণ দিচ্ছি। তোমার স্বভাব চরিত্র আমি জানি। বাল্যবন্ধু তুমি আমার। সেখানে গেলে শীঘ্রই তোমার একশো টাকা মাইনে হবে। তুমি আমায় একখানা হ্যাণ্ড-নোট লিখে দিও। তাতেই চল্‌বে। সুদ আমি এক পয়সা চাইনি। কোম্পানীর যা সুদ, তাতেই আমার হবে। কিন্তু তুমি প্রতিমাসে তোমার মাইনে থেকে পঁচিশটী করে টাকা, আমায় শোধ দেবে! কেমন এতে স্বীকার আছ কি?"

রমেশ দেখিল—তাহার বাল্যবন্ধু অজিতের কৃপায় অসম্ভব ও সম্ভব হইয়া পড়িল! রমেশ অজিতের হাত দুখানি ধরিয়া, কৃতজ্ঞতার উচ্ছাসময় স্বরে বলিল—"অজিত! আজ যথার্থই তুমি সহোদরের কাজ করলে। তুমি এভাবে আমায় সাহায্য না করলে আমাকে অন্নাভাবে মর্‌তে হইত। আমার স্ত্রী পুত্র অতিকষ্টে থাকতো।

আজ বুঝলাম, এখনও এ স্বার্থপর জগতে বাল্যসৌহৃদ্যের একটা মূল্য আছে। তোমার মত নিঃস্বার্থ বন্ধুও জগতে দুর্ল্লভ নয়।"

অজিত, রমেশের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"তোমায় লেক্‌চার গুলো, এর পর কোন মাসিক পত্রিকায় ছাপিয়ো। বড় সাহেব, অনেকক্ষণ টিফিনে গেছেন। বোধ হয় এতক্ষণে ফিরেছেন। তুমি এইখানে ঐ চেয়ারে বসো। আমি একবার সাহেবের ঘর থেকে আসি।"

বড়বাবু অজিতনাথ চেয়ার ত্যাগ করিয়া উঠিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে, বড় সাহেবের চাপরাসি আসিয়া অজিতকে বলিল—"হুজুর! বড় সাহেব আপনাকে সেলাম দিয়াছেন।"

অজিত সাহেবের কাম্‌রায় চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাঁরপর তিনি সহাস্যমুখে নিজের কক্ষে আসিয়া রমেশকে বলিলেন—"সব ঠিক্। সাহেব তোমায় ডাকিতেছেন।"

রমেশ বহুদিন পরে, এক সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সাহেবও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন। তাঁহার সার্টিফিকেট গুলি—দেখিয়া বলিলেন—All right!

রমেশ, বড় সাহেবকে একটী ভক্তিপূর্ণ সেলাম করিয়া অজিতের সহিত সেই কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এই সময়ে যদি কেহ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে সে অজিতের মুখে একটা মৃদু হাসির লহর দেখিতে পাইত।

বলা বাহুল্য, রমেশচন্দ্র সেদিন অজিতেরই আতিথ্য গ্রহণ করি-

লেন। যুগ যুগান্তপরে দুই বন্ধুতে মিলন। কাজেই খুব আনন্দে সেই রাতটা কাটিল।

ভবানীপুরে যে পল্লীতে অজিতনাথের বাড়ী, তাহার পরের পল্লীতেই, রমেশচন্দ্রের মাতুল মৃত্যুঞ্জয় বাবুর প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা।

রাত্রিকালে নির্জ্জন কক্ষে শয্যায় শুইয়া রমেশচন্দ্র ভাবিতেছেন, "এইতো এত কাছে আছেন তিনি। কিন্তু বোধ হচ্ছে যেন অতি দূরে। এ দূরত্বের স্থাপন আমিই ত করেছি। পূজ্য তিনি—পিতৃ-স্নেহের অধিক স্নেহে তিনি আমায় বাল্যকাল থেকে মানুষ করেছেন। কিন্তু এমনি হতভাগ্য আমি, যে আমার কর্ম্মদোষে তাঁহার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।"

পূর্ব্বোক্তধরণে চিন্তাটা অবশ্য অনুতাপের ফল, অনুশোচনার তীব্র অভিব্যক্তি। ইহার পরই বিদ্যুতের মত আবার অভিমান দেখা দিল। অভিমান, অনুশোচনার জ্বালাকে একাবারে ডুবাইয়া দিল। তাহাতে রমেশের মনে, আবার নূতন ধরণের চিন্তা স্রোত উপস্থিত হইল।

রমেশ মনে মনে বলিল—"ধরিয়া লইতেছি, আমি অপরাধী। কিন্তু তাহার স্নেহের উপর কি আমার কোন দাবিই নাই। আমি যদি তাঁহার ভাগিনেয় না হইয়া পুত্র হইতাম, তাহা হইলে কি এভাবে তিনি আমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন! না না, তাঁর কাছে আর আমি যাইব না। দারিদ্রের জ্বালা, অন্নের অভাব, গ্রাসচ্ছাদনের কষ্ট, এসব যতদিন আমার থাকিবে, ততদিন আমি

ঘৃণ্য কুক্কুরের মত তাঁর দ্বারস্থ হইবে না। হোক—আমার সহস্র লাঞ্ছনা! হোক আমার অনাহারে মৃত্যু! অভাব অনাটন আমার মরুময় জীবনকে আরও ছার খার করিয়া দিক্—তবু ও আমি তাঁহার দ্বারে ভিক্ষুকের মত দাঁড়াইব না।”

ধিক রমেশচন্দ্র। ধিক্ তোমার অভিমানে! ধিক্ তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞানে। কিসে সে কি হইতেতেছে, কি ঘটিতেছে, তাহার কিছুই তুমি জানিতেছ না, অথচ একটা বৃথা অভিমানে ফুলিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছ।

(১৮)

রমেশচন্দ্র শয্যায় পড়িয়া যখন এই ভাবে চিন্তায় নিমগ্ন, ঠিক সেই সময়ে, অপর পল্লীতে, মৃত্যুঞ্জয় বাবুর বাড়ীর একটী নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া গৃহস্বামী জমীদার মৃত্যুঞ্জয়বাবু এবং আমাদের ভগবান যে কথোপকথন করিতেছিলেন, তাহা আমাদের একবার শুনিয়া আসিতে হইবে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ভগবানকে বলিলেন—“দেখ! রমেশটা আজ আমার খুব কাছেই আছে। অজিতের বাড়ীতে সে আজ অতিথি হয়েছে তাহাও আমি জানি। কিন্তু কই সে ত আমার কাছে আসিল না! কত স্নেহমমতা যে আমায় এ হৃদয়ে আছে, তাহা তো সে একবার আঘাত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল না।”

ভগবান বলিল—“সবাই কি হুজুরের মত হইয়া জন্মায়? স্বাতি-নক্ষত্রের জলের মত, এক একজন পূণ্যবাণ লোক কচিৎ কখনও

ধরায় দেখা দেন। শুনিয়াছি, গ্রহনক্ষত্র বিরূপ থাকিলে, অতি নিকট আত্মীয়কে লোকে শত্রু ভাবে, হিতকারীকে অহিতকারী বলিয়া বিবেচনা করে! রমেশবাবুর কুগ্রহগুলি যতদিন না কেন্দ্রস্থান হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছে, ততদিন তাঁহার সুমতি হইবে না।*

মৃত্যুঞ্জয়। তা না হোক—আমার মনে এও একটা মহাসন্তোষ, যে তার কন্যার বিবাহ পণ্ড হয় নাই। আর এই অজিতের সহায়তায়, তাহাকে আমি একটী চাকরী জোগাড় করিয়াও দিয়াছি। তার উপর আমি রাগ করিতে পারি, কিন্তু তার স্ত্রীকন্যার উপর ত পারি না। তার স্ত্রী কল্যাণী, যার বিবাহ সম্বন্ধ আমি নিজে করিয়াছিলাম, তার কন্যা স্বর্ণপ্রতিমা, যাকে আমি এ পর্য্যন্ত চোখে দেখিলাম না, তাহাদের কষ্ট মোচন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হাঁ—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, রমেশের আর কোন বাজার দেনা নাই ত?

ভগবান। যা ছিল, তা আপনার আদেশে আমি সব শোধ করে দিয়ে এসেছি।

মৃত্যুঞ্জয়। এখন কথা হচ্ছে কি—রমেশ যদি বিদেশে যায়, তাহ'লে তার স্ত্রীকন্যাকে দেখে কে? আমার ইচ্ছা হচ্ছে—তাদের এখানে এনে রাখি। কিন্তু তা কি করা সম্ভব ভগবান? আমি বলি কি, এতদিন তুমি ত আমারই পরামর্শে তার কাছ থেকে গা ঢাকা হয়ে ছিলে। আমার ইচ্ছা এই, যে কালই তুমি কালিকাপুরে চলে যাও। তোমায় দেখলে, তারা অনেকটা ভরসা পাবে।*

১৮৭

ভগবান। যে আজ্ঞা। ঠিক কথাই বলেছেন হুজুর! এই সময়ে আমায় একবার সেখানে যাওয়া খুবই উচিত।

মৃত্যুঞ্জয়। তাহ'লে আর কিছু টাকা সঙ্গে নিও। যে সব দোকান থেকে তার জিনিস পত্র আস্‌তো, তাদের কিছু কিছু অগ্রিম দিয়ে দিও। দেখো! তার স্ত্রী কন্যা যেন কোনরূপে কষ্ট না পায়।

ভগবান। আপনি যা হুকুম কচ্ছেন, তাই হবে। এখন আর রমেশবাবুর সম্বন্ধে ভাবনার বেশী কিছু দেখ্‌ছিনে। যখন বাস্তুখানা রক্ষা হয়েছে, তাদের মাথা গোঁজবার স্থানটা বজায় হয়ে গেছে, তখন প্রধান অভাব যেটা, সেইটিই আপনি মোচন করে দিয়েছেন! আর বিয়ের দিন দেওয়ানজী মশাই এতটা চালাকীর সহিত, সে কাজটা করেছিলেন, সে কেউ জান্‌তে পারে নি, কোথা থেকে কি হলো?

মৃত্যুঞ্জয়বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"দেখ ভগবান! আমার প্রাণের ভিতর সেই হতভাগা রমেশের জন্য এক এক সময়ে এমন কষ্ট হয়, যে তা বল্‌তে পারি নি। ইচ্ছা হয়, মানঅপমান সব বিসর্জ্জন দিয়ে, তার হাতে ধরে বলি—"আয় বাপ! আমার স্নেহময় ক্রোড়ে আয়। অভাব কিসের তোর? দেখ, আমার জননী মৃত্যুসময়ে অনুরোধ করে গিয়েছেন—রমেশকে খুঁজে এনো, তাকে তোমার কোল ছাড়া করো না। কিন্তু আমি ছার মানের ভয়ে তা কর্ত্তে পাচ্ছি নি। মনে ভয় হয়, পাছে এভাবে তাকে ডাক্‌লে যদি সে না আসে, যদি আমার কথা না শোনে, তাহলে আমার মুখ থাক্‌বে কোথায়? তাই আমি ঘটনা স্রোতে গা ভাসান দিয়েছি। দেখি না এ স্রোত কোথায় গিয়ে থামে।"

ভগবান বলিল—"যা বল্‌ছেন, সবই ঠিক কথা হুজুর! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, রমেশবাবুর কুগ্রহ সমূহ শীঘ্রই তাঁকে ত্যাগ করবে। সেদিন অতি নিকটে—যে দিন তিনি আপনার চরণে ধরে মার্জ্জনা চাইবেন।" এই সব কথাবার্ত্তার পর, ভগবান মৃত্যুঞ্জয় বাবুর নিকট বিদায় চাহিল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু ভগবানকে বলিলেন—"তা হ'লে কাল তুমি যেতেই চাও। তোমার কাছ থেকে তাদের খপর পেলে, আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকবো।"

এখন এই উদারপ্রাণ মৃত্যুঞ্জয় বাবুর কক্ষ ছাড়িয়া, একবার অজিতের বাড়ীতে আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে। হতভাগ্য রমেশ জানিত না, যে এই অজিত মৃত্যুঞ্জয়েরই আশ্রিত ও অনুগত। ডিপজিটের জন্য যে হাজার টাকা প্রয়োজন, তাহা মৃত্যুঞ্জয়ই অজিতকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আর তাঁহারই চেষ্টায়, রমেশের এই চাকরী হইয়াছে।

অজিতের অফিসের বড় সাহেব, মৃত্যুঞ্জয় বাবুরই এক ভাগলপুরী বন্ধু। এই অজিতের চাকরীও তিনি করিয়া দিয়াছেন। তবে তিনি রমেশের ব্যাপারে, এই সাহেবের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন কিছুই ব্যবস্থা করেন নাই। অজিতকে দিয়াই সকল কাজ করাইতেছেন।

পরদিন রমেশ, অজিতের সহিত পুনরায় আপিসে গেল। বলা বাহুল্য, তাহার চাকরীর হুকুমনামা সে সেই দিনই পাইল। আর অজিত, হাজার টাকার একখানি কোম্পানীর কাগজ তাহার

ডিপজিট্ স্বরূপ আপিসে জমা দিয়া, রমেশের নিকট হাজার টাকার একখানি হ্যাণ্ডনোট লইল।

রমেশচন্দ্র প্রসন্নমনে স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। কল্যাণীকে তাঁহার বাল্যবন্ধু অজিতের মহত্ত্বের কথা বলিলেন। তিনি আবার এক ক্যাশিয়ারি চাকরী পাইয়াছেন এবং শীঘ্রই তাঁহার দেড়শত টাকা বেতন হইতে পারে। সুবিধামতে মাসখানেক পরে, তিনি কল্যাণীকে কাশীতে লইয়া যাইবেন, এবং ভবিষ্যতে জামাতা নরেশচন্দ্রকেও সেখানে লইয়া গিয়া একটা চাকরী করিয়া দিয়া, কন্যা স্বর্ণপ্রতিমাকে কাছে রাখিবেন, এরূপ আশ্বাসও প্রদান করিলেন।

রমেশচন্দ্র একমাসের বেতন অগ্রিম পাইয়াছিলেন। তিনি তাহার মধ্য হইতে, পঞ্চাশটী টাকা কল্যাণীকে দিয়া বলিলেন—"খুব সাবধানে রাখিও কল্যাণী! আমার অদৃষ্ট বড় খারাপ। সে বারের মত আবার যেন এ নোটগুলি চুরি না যায়।"

রমেশচন্দ্রের মন, পূর্ব্বের তুলনায় অনেকটা হাল্‌কা হইয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্নে তিনি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। তাঁহাকে বলিলেন—"খুড়ো! তোমার স্নেহ দয়া আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না। আমার এ দুর্দ্দিনে সবাই আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তোমার স্নেহ এখনো একইভাবে আছে। আমি পুনরায় চাকরী যোগাড় করিয়াছি। পরশু প্রাতে, এখান হইতে কর্ম্মস্থলে রওয়ানা হইব। পরিবারবর্গকে দেখার ভার তোমায় দিয়া গেলাম।"

তর্কালঙ্কারের, বয়স ষাটের কাছাকাছি। তিনি রমেশচন্দ্রের কুল—পুরোহিত। তর্কালঙ্কারকে রমেশচন্দ্র খুড়া বলিয়া ডাকিতেন।

তর্কালঙ্কারের গৃহিণীও রমেশকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। রমেশের সুখের দিনে, ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে, তর্কালঙ্কার অনেক টাকা কামাইয়াছেন। এজন্য রমেশের সহিত, সকলে আত্মীয়তা পরিত্যাগ করিলেও, তিনি রমেশের মত যজমানকে চিরদিনই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

রমেশ আবার চাকরী পাইয়াছে শুনিয়া, তাঁহার বড়ই আনন্দ হইল। তিনি গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিল—"ও গিন্নি! একবার এ দিকে এসো। একটা শুভ খপর শুনে যাও।"

তর্কালঙ্কার গৃহিণী, স্বামীর আহ্বানে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র, রমেশ তাঁহার পদধুলি লইয়া বলিলেন—"খুড়ী মা! আবার আমার মোটা মাইনের চাকরী হয়েছে। আশীর্ব্বাদ কর যেন চাকরিটি বজায় থাকে। আর তোমার বৌকে তোমারই কাছে রেখে গেলুম। স্বর্ণকেও দেখো—খুড়ীমা।"

তর্কালঙ্কার গৃহিণী, এ সংবাদে খুবই আনন্দিতা হইয়া বলিলেন—"তোমার খুব বাড় বাড়ন্ত হোক বাবা রমেশ! আর বৌমাকে দেখবার কথা কি তোমায় আলাদা করে বল্‌তে হবে? এটা হ'চ্ছে আমাদের একটা কর্ত্তব্য কাজ। আহা! অমন লক্ষ্মী বৌ—খুব কম সংসারে আছে। খুড়ীমা বল্‌তে অজ্ঞান! তা সে জন্য তোমায় একটুও ভাব্‌তে হবে না।"

রমেশচন্দ্র, সন্তুষ্ট চিত্তে তর্কালঙ্কারের বাড়ী ত্যাগ করিলেন। নিজের বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ভগবান তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া তামাকু সাজিতেছে।

রমেশচন্দ্র, ত্বরিতগতিতে বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবানকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"এতদিন কোথায় ছিলে তুমি দরিদ্রের বন্ধু ?"

ভগবান জিভ্ কাটিয়া রমেশের পদধূলি লইয়া বলিল—"ওকথা বল্‌তে নেই বড়বাবু ! আমি যে আপনার ছেলের মত। চির অনুগত দাসানুদাস। গরীবের বন্ধু ভগবান—ঐ—ঐ আকাশের ওপর।"

রমেশচন্দ্র—ভগবানকে সাদরে তাহার পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন—"এসব কি করিতেছ ভগবান ?"

ভগবান। কি সব করিতেছি ?

রমেশ। আমার বাজার দেনা শোধ করিল কে ?

ভগবান। আপনিই করিয়াছেন। কথা ছিল, আপনি চারশো টাকা ধার নেবেন। কিন্তু পাঁচশো টাকা আমি এনেছিলুম। তবে আপনাকে দিয়েছিলুম চারশো। একশো টাকা চেপে রেখে-ছিলুম এই জন্য, যে আপনার হাত বড় দরাজ। বাজারদেনা দাঁড়াবেই দাঁড়াবে ! আপনার টাকা দিয়ে দেনা শোধ করেছি, তাতে দোষ কি বড় বাবু ?

রমেশ দেখিলেন—প্রতিবারেই ভগবান তাঁহাকে সকল ঘটনা ক্ষেত্রে "অশ্বত্থামা-হত-ইতি-গজ" ভাবেই বুঝাইয়া দেয়। আর তার সব কথার ভিতর এমন এক একটা যুক্তি থাকে, যে তিনি তার কোন প্রতিবাদও করিতে পারেন না।

রমেশচন্দ্র ভগবানকে বলিলেন—"বাপু ! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক বলবে কি ?"

ভগবান। কেন বলিব না বড়বাবু?

রমেশ। বিবাহের দিনে যে মহাপ্রাণ মহাত্মা, আমার মান বাঁচিয়ে গেলেন, তাঁর পরিচয় তুমি নিশ্চয়ই জানো!

ভগবান। একটুও—না। ও ব্যাপারে আমি যেন একটা গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে আছি। আর সেই মহাত্মার সন্ধানের চেষ্টায় এখান ওখান করাতেই, আমি এতদিন আপনার কাছে আসিতে পারিনি। তবে, আপনার এই দাসানুদাস ভগা পাগ্‌লার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। এমন দেশ নেই, যে সে যায় না। এক দিন না এক দিন, সেই ভদ্রলোককে আমি পাকড়াও করবোই করবো।

রমেশ। ভগবান! শুনে সুখী হবে, আবার আমার একশো টাকার চাকরী হয়েছে।

ভগবান। বটে! কোথায় চাকরী হলো?

রমেশ। কাশীতে।

ভগবান। ভালই হয়েছে বড়বাবু! আপনি সেখানে ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে বসুন গে। তার পর আমিও বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণে হাজির হতে যাচ্ছি।

রমেশ। ভগবান! তোমার দয়া আমি ভুলতে পারবো না। আমার স্ত্রীকে তুমি মা বলেছো। আমাদের কোন পুত্রসন্তান নেই। তুমিই আমার বড় ছেলে। আর তুমি আমাদের এই দুঃখের দিনে যা করেছ, অনেকের উপযুক্ত ছেলেতেও তা করে না। তোমাকে আমার একটা অনুরোধ, এই এক মাস তুমি তোমার মাকে আর

আর স্বর্ণ দিদিকে দেখো। আমার ইচ্ছা, এই এক মাস কাল তুমি এ বাড়ীতে থাক।

ভগবান। তার আর বেশী কথা কি? জানেন তো আমার পাগলের মরজি। একস্থানে আট্‌কে থাকা, আমার ধাতে লেখে না। তবে আমি এ বাড়ীতে হপ্তায় চারপাঁচ দিন কাটাবো। মা'র হাতের রান্না খেতে, বড় ভাল বাসি আমি।

রমেশচন্দ্র ভগবানের এই সব কথায় যথেষ্ট নিশ্চিন্ত হইলেন। ভগবান যদি মাঝে মাঝে এ বাড়ীতে আসে, আর তর্কালঙ্কার মহাশয় এদের খোঁজ খপর নেন্, তাহা হইলে তাঁহার ভাবনার কোন বিশেষ কারণ নাই।

পরদিন রমেশ, পশ্চিম যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাকে এজন্য কলিকাতার পর্য্যন্ত যাইতে হইবে না। বর্দ্ধমানে গাড়ী ধরিলেই চলিবে।

যাত্রার সময় রমেশচন্দ্র পত্নীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—"কল্যাণী! হাসি মুখে আমায় বিদায় দাও।"

কল্যাণীর মনে তখন একটা মহাঝড় উপস্থিত হইয়াছিল। সতী, স্বামীর সঙ্গে নির্জ্জন গহনে যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে একা কোথাও ছাড়িয়া দিতে পারে না। কিন্তু মনের ভিতরের সেই মহা ঝড়টা খুব জোরে চাপিয়া রাখিয়া, সে বলিল—"মা অন্নপূর্ণা ও বাবা বিশ্বনাথ, তোমার মঙ্গল করুন। চিরদিনই ত তুমি কলিকাতায় কাটাইয়াছ। কতদিন তোমায় হাসিমুখে বিদায় দিয়াছি, কিন্তু আজ আমার মনটা বড় চঞ্চল হইয়াছে। বোধ হয়—

কল্যাণী সহসা থামিয়া গেল। কিন্তু কথাটা তাঁহার কানে যাওয়ায়, রমেশ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন—"ওকি কথা বলিতেছ কল্যাণী! কাশী আর বৰ্দ্ধমান কতদূর? ছিঃ! ওসব কথা মনে আনিতে নাই। আর এই একটা মাস, দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে।"

পাছে রমেশের সঙ্গে বেশী কথা কহিলে, চোখের জলের বাঁধনটা আল্‌গা হইয়া পড়ে, ইহা ভাবিয়া কল্যাণী স্বর্ণকে ডাকিল। স্বর্ণ, তখন তাহার পিতার জন্য পান সাজিতেছিল।

পানের ডিবাটা লইয়া, স্বর্ণ তাহার পিতার হাতে দিয়া, রুদ্ধস্বরে বলিল—"বাবা!"

কে জানে, তাহারও যেন কথা কহিতে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল। চিরদিন যে সে পিতার কাছ ছাড়া হয় নাই।

স্বর্ণপ্রতিমাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া রমেশ বলিলেন, "তোমার মাকে দেখো স্বর্ণ। তোমার শাশুড়ী বোধ হয়, আস্‌ছে মাসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। মনে জেনো—সেই তোমার ঘর। তোমার শাশুড়ী বৃদ্ধা হয়েছেন। তাঁকে কোন কাজ করতে দেবে না। স্বামীর সেবাই তোমার শ্রেষ্ঠ ব্রত বলে জানবে। শাশুড়ীর সেবা শ্রেষ্ঠধৰ্ম্ম বলে মনে রেখো। তুমি নরেশের সংসারের কুললক্ষ্মী। ঠিক্ লক্ষ্মীর মতন হয়েই থেকো মা! স্বামীকে নারায়ণের মত, দেবতার মত, ভক্তি করবে। এখন তোমার জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, বেশী কথা তোমাকে বোধ হয় বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না।"

স্বর্ণ-প্রতিমা বলিল—"বাবা! তুমি যেন আমাদের ভুলে থেকো না। এক মাস বাদে ছুটি নিয়ে এসে, আমাকে আর মাকে কাশীতে নিয়ে যেও। এবার আমার বড় মন কেমন কচ্ছে।"

এ করুণামাখা দৃশ্যের যবনিকা, এইখানেই ফেলিয়া দেওয়া ভাল। বলাবাহুল্য—রমেশচন্দ্র, কন্যা ও পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া বর্দ্ধমানের পথ ধরিলেন। তাঁহাকে ষ্টেসনে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ভগবান ইতিপূর্ব্বেই একখানি গাড়ী আনিয়াছিল। সে রমেশচন্দ্রকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিতে গেল।

১৯

রমেশচন্দ্র বেনারসে পৌঁছিয়াই, পত্র দিয়াছেন। আর প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতরূপে দুই তিন খানি পত্র দিতেছেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়, রমেশকে যাহা বলিয়াছিলেন, তদনুসারেই কাজ করিতেছেন। প্রত্যেক দিন, কল্যাণী ও স্বর্ণর খপর লওয়া তাঁহার সন্ধ্যাহ্নিকের মত নিত্য কর্ম্ম।

কল্যাণীও, অনেক সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে তাইতে যায়। এক পাঁচীলে লাগাও তাঁহাদের বাটী। এক বাড়ী বলিলেই চলে।

আর ভগবান! সে ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সেই দিন কল্যাণীর কাছেই আহার করিল। কল্যাণীকে সে বলিল—"মা! কোন ভয়ই নাই তোমার। মাসের মধ্যে পনর দিন আমি তোমায় দেখা দিয়া যাইব।"

বলা বাহুল্য, ভগবান তৎপর দিনই বাজারে গিয়া, এক মাসের

উপযোগী, দাল-কড়াই চাউল ঘৃত মসলা তৈল ইত্যাদি কিনিয়া আনিয়া দিল। কল্যাণী তাহাকে এই সব জিনিষের মূল্য দিতে চাহিল, সে কিছুতেই লইল না। সে বলিল—"বাবু আমাকে এসব কিনিবার জন্য আলাদা টাকা দিয়া গিয়াছেন। ও টাকা তুমি এখন নিজের কাছে রাখিয়া দাও। দরকার পড়িলেই আমি উহা চাহিয়া লইব।"

এইরূপে এক মাস কাটিয়া গেল। কল্যাণী প্রতিমুহূর্ত্তে রমেশের নিকট হইতে এমন একখানি পত্রের আশা করিতেছেন, যাহাতে রমেশ লিখিবেন, যে অমুক দিনে আমি কাশী ছাড়িব।

মাসের শেষ দিনে রমেশের একখানি পত্র আসিল। কল্যাণী, অল্প বিস্তর শিক্ষিতা। সে পত্রখানি সাগ্রহে খুলিয়া পাঠ করিল।

পত্রে লেখা আছে—"কল্যাণী! এই মাসের শেষে আমার বাড়ী যাইবার কথা ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে যাওয়া হইল না। শুনিয়া সুখী হইবে, যে এখানকার সাহেবরা আমার কাজ দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এজন্য তাঁহারা আমার মাহিনা একশো টাকা, মালকেনার উপর একটা দস্তুরী দিবার জন্য সুপারিশ করিয়া, সদরে পত্র লিখিয়া ছেন। আমার ভাগ্যগুণে এখানকার অফিসের কাজ খুব বাড়িয়া গিয়াছে। কাজ বাড়াই লক্ষ্মী। যত কাজ বাড়িবে, ততই আমাদের দু'পয়সা হইবে।"

"এই সময় কাজের মরসুম পড়ায়, সাহেব আমায় ছুটি দিতে বড়ই নারাজ। আর এক মাস বাদে কাজ নরম হইয়া আসিলে. তখন

আমি ছুটি পাইব। আমার আপিস, কাশী সহরের বাহিরে ছাউ-নীতে। এখানে কর্ম্মচারীদের স্ত্রী-পুত্র লইয়া থাকিবার জন্য, সাহেবরা দুই তিন খানি ছোট ছোট বাড়ী তৈয়ারি করিতেছেন। আর দুই মাসের মধ্যে এই বাড়ীগুলি শেষ হইয়া যাইবে। আমি সেই সময়ে দেশে গিয়া, তোমাদের লইয়া আসিব। আর নরেশের জন্য একটী চাকরীর জোগাড় দেখিতেছি। খুব সম্ভব, তাহাও এই এক মাস বাদে হইতে পারে।"

"তোমার পত্রে জানিলাম—ভট্টাচার্জ্জি কাকা ও খুড়ীমা তোমা-দের যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন। ভগবানও আমাদের বাড়ীতে আসে। এ জন্য আমি খুব নিশ্চিন্ত। ভগবান তোমার বাজার হাট করিয়া দিয়াছে ও বলিয়াছে যে আমি তাহাকে টাকা দিয়া আসিয়াছি। তা দেখিতেছি—আমাদের ঐ পাগল ছেলেটা, ভুলেও একটা সত্য কথা বলে না। মা অন্নপূর্ণা যদি কৃপা করেন, আর সাহেবরা কেনা মালের উপর আমার দস্তুরীর টাকাটা মঞ্জুর করেন, তা হলে বোধ হয়, যাহা ঘরে লইয়া যাইব, তাহাতে এই মহোপকারী বন্ধু ভগবানকে স্বর্ণের সাহেব ঋণটা শোধ করিয়া দিব।

লিখিয়াছ, যে ভট্টাচার্য্য মশায়ের নাতির অন্নপ্রাশন পরশু হইবে তিনি আমার পুরোহিত। দশটী টাকার কম দেওয়া ভাল দেখায় না। আমি তোমাকে শীঘ্র পঞ্চাশ টাকা পাঠাইব। তোমার কাছে যে টাকা আছে—তাহা হইতে দশটী টাকা খুড়ীর হাতে দিও।'

—"রমেশ"

কল্যাণী এই পত্র পাইয়া বড়ই আশ্বস্ত হইল! সে কবিকঙ্কণের

ফুল্লরার মত দিন গণনা করিতে লাগিল। একমাস যখন এরি মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে, তখন আর একটা মাসও কাটিতে কতক্ষণ।”

পর দিন রবিবার। এই দিনই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পৌত্রের অন্নপ্রাশনের লোক খাওনার দিন।

কল্যাণী ও তাহার কন্যা স্বর্ণ-প্রতিমা, উভয়েই সকাল হইতে নিমন্ত্রণ বাটীতে উপস্থিত আছেন। নানা কাজকর্ম্ম করিতেছেন। তর্কালঙ্কারের পুত্রবধূর সহিত স্বর্ণ-প্রতিমার সই পাতানো ছিল। তাহারা দুজনে সংসারের কাজও করিতেছে এবং গল্প গুজবও করিতেছে।

আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও এ ব্যাপারে একটু সমারোহ করিয়াছিলেন। কেননা, তাহার একমাত্র পুত্র ভবভূতির পুত্রের অন্ন-প্রাশন। নিজ পাড়া ছাড়া, তিনি গ্রামের অন্যান্য পাড়াও বলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, কালীকিশোর পুত্র অন্নদা ও তাহার বন্ধু অদ্বৈতও সে দিন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছে।

পল্লীগ্রামের চির সনাতন নিয়মানুসারে, আগে ব্রাহ্মণভোজন হইয়া গেল। তারপর কায়স্থদের ডাক পড়িল।

তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বাড়ীর এক দিকটা এক তালা। তাহাতে দুইটী কামরা আছে। আর অপর দিকে একখানি খুব উচু দাওয়া-ওয়ালা শুইবার ঘর। এতদ্ভিন্ন রান্নাঘর, গোয়ালঘর, ভাণ্ডার ঘর, ধানের মরাই, তুলসীমঞ্চ ইত্যাদি অনেক জিনিষই সেই বাড়ীতে ছিল।

বড় মেটেঘরের উঁচু দাওয়ার উপর বসিয়া, স্বর্ণ-প্রতিমা ভবভূতি

ঠাকুরের স্ত্রী, তাহার সই ও পাড়ার আর একটী বৌ, কয়জনে বসিয়া পান সাজিতেছিল। বৌ ছুটী, বালিকাবধূ বলিয়া তাহাদের মুখ অবগুণ্ঠনাবৃত। আর স্বর্ণপ্রতিমা সে বাড়ীর ঝিউড়ি। সে কেবল মাথায় কাপড়টা দিয়া বসিয়াছে। তবে মুখখানি সম্পূর্ণ খোলা।

ঠিক তাহার বিপরীত দিকের দালানে, কায়স্থদের স্থান হইয়াছে। অন্নদা ও তাহার প্রাণের বন্ধু অদ্বৈত, পাশাপাশি ভোজনে বসিয়াছে।

অন্নদার দৃষ্টি, সহসা সেই মেটে দাওয়ার দিকে পড়িল। তাহার চোক যেন আর সেখানে হইতে ফিরিতে চায় না।

ছুই তিন বার দেখিবার পর স্বর্ণ-প্রতিমার সে সুন্দর মূর্ত্তিখানি, তাহার বুকের মধ্যে খুব জাঁকিয়া বসিল। কিন্তু এরূপভাবে দেখা যে মহাধৃষ্টতা, ইহা ভাবিয়া সে আহারে মন দিল।

অদ্বৈত, স্বর্ণপ্রতিমাকে চিনিত। সে তাহাকে বিবাহের পূর্ব্বে বহুবার দেখিয়াছে। কিন্তু বিবাহের পর সে যে এরূপ সুন্দরী হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই। অদ্বৈত দেখিল, অন্নদা এক দৃষ্টে স্বর্ণ-প্রতিমার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তার পর মুখ নীচু করিল।

অদ্বৈত চুপে চুপে বলিল "ব্যাপার কি ভায়া ?"

অন্নদা। দাওয়ায় বসে পান সাজছে ঐ মাথা খোলা মেয়েটী কার ?

অদ্বৈত। ওটি ত তোমারই গিন্নি হতোগো ! তা তোমার যেমন পোড়া কপাল ! অমন খাসা আমটা, দাঁড়কাকে মেরে দিলে।

অন্নদা আর কিছু বলিল না। একঘণ্টার মধ্যে তাহাদের আহার শেষ হইল। ইহার মধ্যে অন্নদা বোধ হয়, বিশবার সেই দাওয়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া মুখে অন্ন দিতে ছিল!

অন্নদা ও অদ্বৈত, আহারাদি করিয়া বাহিরে যাইতেছে, এমন সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন গো অন্নদা বাবু! পেটটা ভর্‌লো ত? গরীব ব্রাহ্মণ আমি। যেন নিন্দেটিন্দে করো না।"

অন্নদা নম্রতা জানাইয়া বলিল—"আজ্ঞে সে কি কথা! বামন বাড়ীর প্রসাদ পেলে ত আমরা বর্ত্তে যাই। খুব খাওয়া হয়েছে।"

২০

রমেশচন্দ্র, কাশীতে গিয়া বেশ কাজ কর্ম্ম করিতেছেন। সাহেব দের সঙ্গেও তাঁর বেশ বনিবনাও হইয়াছে। ভাগ্য তখন ভালোর দিকে পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে। তবে রমেশচন্দ্রের প্রধান মনকষ্ট, পত্নী কল্যাণী তাঁহার কাছে নাই। আর তাঁহার স্নেহময়ী কন্যা, স্বর্ণপ্রতিমাও অনেক দূরে।

এদিকে কল্যাণীর মনের অবস্থাও সেইরূপ। রমেশচন্দ্রের পুনরায় চাকরী হইয়াছে—জীবনের অন্ধকারময় দিনগুলা কাটিয়া যাইবার পর, আবার সুখসূর্য্য উদিত হইয়াছে, একমাত্র কন্যা স্বর্ণপ্রতিমাও সুপাত্রে অর্পিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার ভাবনা বোল আনাই কমিয়া গিয়াছে। তবে রমেশচন্দ্রের নিকট হইতে দূরে থাকিতে কল্যাণী বড়ই নারাজ। এ পার্থক্য তাহার মনে একটা ঘোর অশান্তি আনিয়া দিল। সে দিনরাতই নারায়ণকে ডাকিয়া বলিত

—"হে হরি! হে মধুসূদন! তাঁহাকে নিরাপদে রাখও তাঁহার পায়ে যেন কুশাঙ্কুর বিদ্ধ না হয়।"

মানুষ ভাবনাকে যতই তাড়াইবার চেষ্টা করে, ভাবনাও মানুষকে তত জোরে জড়াইয়া ধরে। কাজেই সহস্র চেষ্টা করিয়া কল্যাণী, ভাবনার হাত হইতে উদ্ধার পাইল না। দূরদেশগত প্রবাসী স্বামীর সম্বন্ধে দুর্ভাবনাটাই, কল্যাণীর যেন খুব বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রক্তমাংসের অত সহিবে কেন? কল্যাণী জ্বরে পড়িল! আর সঙ্গে সঙ্গে কন্যা স্বর্ণপ্রতিমাও একটা মহাভাবনার সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া, হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, কল্যাণী শরীরের সামান্য অসুস্থতাকে উপেক্ষা করিয়া সে দিন স্নানাহার করিল। এ অন্যায় স্নানাহারের ফল বড়ই বিষময় হইল। সেই দিন রাত্রে জ্বরটা খুব জোরে আসিল দ্বিতীয় দিনও সেই ভাবে কাটিল। অপরন্তু তাহার সঙ্গে নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল—প্রলাপ।

এ প্রলাপবাক্য কেবল রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে। "তুমি আমার ছেড়ে গেলে কেন?" "মরে গেলে আরতো এসে দেখ্‌তে পাবে না।" "তোমার কি হবে তাহ'লে?" এই ভাবের কথাই কিছু বেশী।

স্বর্ণ-প্রতিমা প্রথম দিনেই তাহার তর্কালঙ্কার ঠাকুরদাদার বাড়ীতে খপর দিয়া আসিয়াছিল। তর্কালঙ্কার হাত দেখিতে পারিতেন। নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, জ্বরটা সোজাসুজি ধরণের। কাজেই তিনি ডাক্তার কবিরাজ ডাকান

নাই। আর সে গ্রামে এক শতেকমারী বৈস্থ ও সহস্রমারী, ঘরে-বাঙ্গালা ডাক্তারী বই পড়া একজন আনাড়ী ডাক্তার ভিন্ন আর কোন চিকিৎসকই ছিল না। বর্দ্ধমান হইতে রমেশচন্দ্রের গ্রাম দুই ক্রোশ। যাহাদের অর্থসামর্থ্য নাই, বাধ্য হইয়া তাহারাই এই গ্রাম্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হইত। যাহাদের পয়সা কড়ি ছিল— তাহারা বর্দ্ধমান হইতে পাশকরা ডাক্তার আনাইত।

ঠিক বুঝিতে না পারিয়া, কল্যাণী শরীরের সামান্ত অসুস্থতাকে উপেক্ষা করিয়া, সে দিন স্নানাহার করিলেন। স্নানাহারের ফল বড় বিষময় হইল। সেই দিন রাত্রে জ্বরটা খুব জোরে আসিল। তৃতীয় দিন ও সেইভাবে কাটিল। অপরন্তু তাহার সঙ্গে নূতন উপসর্গ আসিয়া জুটিল—প্রলাপ।

এ প্রলাপ বাক্য রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে। "তুমি আমায় ছেড়ে গেলে কেন?" মরে গেলে আর ত এসে দেখ্‌তে পাবে না।" "তোমার যে বড় কষ্ট হবে তা হলে?" এই ভাবের কথাই কিছু বেশী।

পীড়ার প্রথম দিনেই স্বর্ণ-প্রতিমা তাহার তর্কালঙ্কার ঠাকুর দাদার বাড়ীতে খপর দিয়া আসিয়াছিল। তর্কালঙ্কার হাত দেখিতে পারিতেন। নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, জ্বরটা সোজা সুজি ধরণের। কাজেই তিনি ডাক্তার-কবিরাজ ডাকেন নাই। কারণ সে গ্রামে পূর্ব্বোল্লিখিত শতেকমারী বৈস্থ ও সহস্রমারী, এক স্বয়ংসিদ্ধ আনাড়ী ডাক্তার ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাহার উপর আবার বর্দ্ধমান হইতে রমেশচন্দ্রের গ্রাম দুই ক্রোশ;

স্বর্ণ-প্রতিমা তার মাকে প্রলাপ বকিতে দেখিয়া, তাড়াতাড়ি ভট্টচাজ্যি বাড়ী গিয়া তর্কালঙ্কারকে বলিল—"ঠাকুরদাদা! মা কেমন ক'চ্ছে আর ভুল বক্‌ছে। আপনি শীঘ্র একবার আসুন।"

তর্কালঙ্কার কথাটা শুনিয়া বড় ভয় পাইলেন। তথনই স্বর্ণর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া, নাড়ী পরীক্ষায় বুঝিলেন, বিকারের পূর্ণ লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সে কালের লোক। কাজেই ডাক্তার না ডাকিয়া, কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিয়া আনিলেন।

কবিরাজ মহাশয়ের নাম শম্ভুনাথ সেন গুপ্ত। লোকটার পড়া শুনা তত বেশী না থাকিলেও, বহু চিকিৎসার ফলে অভিজ্ঞতাটা যথেষ্ট ছিল। কবিরাজ বহুক্ষণ ধরিয়া নাড়ী টিপিয়া দেখিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন।

তর্কালঙ্কার ঠাকুর বলিলেন—"নাড়িতে কি দেখলে শম্ভুখুড়ো!"

শম্ভু বলিল—"বিকারের নাড়ী বটে। খুব সাবধানে চিকিৎসা করতে হবে.

তর্কালঙ্কার। বলি প্রাণের ভয় কিছু নেই ত?

শম্ভু। তাকি বল্‌তে পারি বাবা ঠাকুর। ভয় মানুষের মরণ বাঁচনের কর্ত্তা সেই ভগবান! চিকিৎসকে যথা সাধ্য চেষ্টা করে মাত্র।

তর্কালঙ্কার কথাটা শুনিয়া, একটু মুখ বাঁকাইলেন। হায়! রমেশ যে তাঁহার হাতেই এই কল্যাণীর ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে কর্ম্ম স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

তিনি উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—"তা হলে কি করতে চাও?"

শম্ভু কবিরাজ বলিল—"চিকিৎসা চলুক। বিদ্যা আমার বেশী নেই বটে দাদা ঠাকুর! তা হলেও আমি দেখেছি ঢের। এখনি ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি। বোধ হয়, এই ওষুধে জ্বরটা কমে আসতে পারে। বেশী ভয়ের কারণ কিছু নেই। আপনি অত ভাববেন না।"

ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, শম্ভু কবিরাজ চলিয়া গেলেন। কল্যাণী তখন অঘোর অচৈতন্য। তর্কালঙ্কার নিজে একবার ওষুধ খাওয়াইয়া দিলেন। শম্ভু কবিরাজ পাড়াগেঁয়ে কবিরাজ। কলিকাতা সহরের পেটেণ্টওয়ালা ডাক্তারি-মেজাজের কবিরাজ নহেন। কাজেই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পুঁটলী ভরা ডিস্‌পেন্‌সারী থাকিত।

ওষুধ ব্যবস্থা করিয়া কবিরাজ চলিয়া গেলেন। তর্কালঙ্কার গৃহিণী, সকাল সকাল সংসারের কাজ সারিয়া আসিয়া, কল্যাণীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কল্যাণীর প্রলাপের অবস্থাটা কাটিয়া গেল।

পরাহ্নকালে ডাকে এক খানি পত্র আসিল। পিতার পত্র মনে করিয়া, স্বর্ণ তাহা আগ্রহের সহিত খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু পত্র পাঠ করিবার পর সে বুঝিল, আবার এক নূতন বিপদ উপস্থিত।

পত্রখানি জামাতা নরেশচন্দ্রের কাছ হইতে আসিয়াছিল। নরেশ তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে লিখিতেছেন—"শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, আমার বৃদ্ধা মাতা ঠাকুরাণী, কঠিন অতিসাররোগে শয্যাশায়িনী। বোধ হয়, তিনি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। এ সংসারে একটীও স্ত্রীলোক নাই, যে তাহার সেবা করে। যদি আপনি এই সময়ে আপনার কন্যাকে কিছুদিনের জন্য এখানে পাঠাইয়া দেন,

তাহাহইলে আমার বড়ই উপকার করা হয় কারণ আমার মাতাঠাকুরাণী তাহাকে একবার দেখিতে বড়ই উৎসুক।"—নরেশ।

সুবুদ্ধিমতি স্বর্ণপ্রতিমা পত্রখানি পড়িয়া বড়ই বিমর্ষ হইল। শাশুড়ীর কঠিন পীড়া, আর সেই সময়ে তাঁর শুশ্রূষার অভাব, স্বামী নরেশচন্দ্রের কষ্ট, এসব ভাবনা তাহার প্রাণটাকে বড়ই নিপীড়িত করিতে লাগিল। এদিকে তাহার পিতা বিদেশে, মাতা ভয়ানক জ্বরে শয্যাশায়ী, তাহার ভগবান দাদারও দেখা নাই, এই সব ভাবিয়া স্বর্ণ বড়ই কাতর হইয়া উঠিল। তার মাকে তখন এসব কথা জানাইবার সময়ও নহে, এবং কোন উপায়ও নাই। এজন্য সে বড়ই ফাঁপরে পড়িল।

তাহার ভরসার মধ্যে, তাহাদের পুরাণো ঝি, রাখালের মা; এই রাখালের মাকে সে দিদি বলিত। এই রাখালের মার কোলেই স্বর্ণ-প্রতিমা পালিত হইয়াছিল। রাখালের মা, তখন রোগীর পথ্যের জন্য, বাজারে মিছরী আক এদানা প্রভৃতি আনিতে গিয়াছিল। তর্কালঙ্কার গৃহিণীও তখন সেখানে উপস্থিত নাই, বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন। কাজেকাজেই, স্বর্ণ তাঁহার এই নূতন ভাবনাটী লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

সে মায়ের রোগ শয্যার পার্শ্বে মেঝেয় বসিয়া, এক মনে, এক প্রাণে, যুক্তকরে ভগবানকে ডাকিয়া বলিল—"নারায়ণ! আমার বড়ই সঙ্কট অবস্থা। এদিকে মার এই সঙ্কট পীড়া, ওদিকে শাশুড়ী ঠাকুরাণীর অমন কঠিন রোগ! দুজনকেই আরোগ্য করিয়া দাও

দয়াল ভগবান। আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণে ভরসা দাও। এ বুক খানিকে আর ভাবনায় দমিয়ে দিও না।"

নারায়ণ বোধ হয়, সেই সময়ে স্বর্ণপ্রতিমার এই প্রাণের কথা শুনিলেন। কেননা, আমাদের পাগল ভগবান, সেই মুহূর্ত্তেই বাড়ীর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়া বহিল—"মা! তোমার পাগলা ছেলে এসেছে! কেমন আছগো তোমরা?"

স্বর্ণ ভগবানের কণ্ঠস্বর শুনিয়া কক্ষের বাহিরে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"আঃ বাঁচলুম! দাদা তুমি এসেছ! আমাদের বড় বিপদ!

ভগবান এ কথায় ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"কিসের বিপদ দিদিমণি? ব্যাপার কি?"

স্বর্ণ-প্রতিমা। মার বড় অসুখ! জ্বর বিকার হয়েছে। অঘোরে অচৈতন্য হয়ে রয়েছেন।

ভগবান। দেখ্‌ছে কে?

স্বর্ণ। উপরের ঐ ভগবান, আর গাঁয়ের কব্‌রেজ মশাই।

ভগবান। বটে! চল দিদি, একবার মাকে দেখে আসি।

মলিন মুখে কল্যাণীর শয্যাপার্শে দাঁড়াইয়া, ভগবান সে তাহার অবস্থা দেখিল। তাহারও একটু নাড়ীজ্ঞান ছিল। তাহার সহায়তায় সে বুঝিল—"রোগটা শক্ত বটে!"

কিন্তু পাছে তাহার স্বর্ণ দিদি কথাটা শুনিলে মনে ভয় পায়, এই ভাবিয়া আমাদের ভগবান বলিল—"তা এর জন্যে আর ভাবনা কি দিদি! এ জ্বর দুদশ দিনেই সেরে যাবে।"

স্বর্ণ বলিল—"তাই বল দাদা! তুমি যখন এসেছ, তখন আমার খুব ভরসা হয়েছে।"

ভগবান। তোমরা একটু অপেক্ষা কর। আমি মার জন্যে দুটো ভাল বেদানা, আর রোগীর পথ্য কিছু নিয়ে আসি!

স্বর্ণ। আবার তুমি কেন যাবে? আমাদের পুরাণো ঝি, রাখালের মা, এজন্য বাজারে গেছে।

ভগবান। হাঁ—তুমিও যেমন দিদিমণি! এখানকার গেয়োঁ বাজারে আবার কিছু পাওয়া যায় না কি! আমি ঘণ্টা খানেকের মধ্যে এলুম বলে। ঔষধটা তুমি ঠিক খাইও।"

ভগবান তখন স্নান করিয়াছে বটে কিন্তু আহার করে নাই। কল্যাণী পীড়িত, খাবার লোক কেহই নাই, এজন্য স্বর্ণও সেদিন রান্না চড়ায় নাই। সে বামুন বাড়ীতে গিয়া চারিটী খাইয়া আসিয়াছে। তবুও সে বলিল—"ভগবান দাদা! তোমার খাওয়া হয়েছে?"

ভগবান হাসিয়া বলিল—"যদি বলি হয় নি, তাহ'লে তুমি কি করবে দিদিমণি?"

স্বর্ণ। এখনি চারটী ভাতে ভাত চাপিয়ে দেবো।

ভগবান। না—আমি খেয়েই এসেছি। সেজন্য তোমার ব্যস্ত হবার কারণ নাই। আমি এলুম বলে! এই কথা বলিয়া তখনই সে একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া ষ্টেসনের পথ ধরিল।

ভগবান বলিয়া গিয়াছিল, এক ঘণ্টার মধ্যে সে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তাহার ফিরিতে দুই ঘণ্টা দেরী হইল যদিও সে

একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী করিয়া বৰ্দ্ধমানে চলিয়া গিয়াছিল। বর্দ্ধমানের যিনি শ্রেষ্ঠ ডাক্তার, তাঁহার সহিত ভগবানের খুব আলাপ। ভগবানকে এই ডাক্তার বাবু, খুব স্নেহ করিতেন, কেননা তিনি আমাদের এই পাগল ভগবানকে খুব ভাল রকমই চিনিয়া ছিলেন।

সুতরাং ভগবানের ডাকে, ডাক্তার বাবু তাঁহার অন্য "কল" গুলি ছাড়িয়া, তাহার গাড়ীতে সওয়ারী হইয়াছেন। রোগের অবস্থা ভগবান তাহাকে মুখেমুখে যতটুকু বলিয়া ছিল—তাহা শুনিয়াই তিনি চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রও সঙ্গে আনিয়াছেন।

ডাক্তার বাবুকে বাহিরের বৈঠক-খানায় বসাইয়া, ভগবান, রোগীর পথ্যগুলি লইয়া অন্দরে গেল। স্বর্ণকে ডাকিয়া বলিল—"দিদিমণি! আমার খুব দেরী হয়ে গেছে—না? তা তোমার ভাবনার কারণ কিছুই নেই। আমি বর্দ্ধমান থেকে, একজন ভাল ডাক্তার এনেছি।"

ভগবান, ডাক্তার বাবুকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। ডাক্তার বাবু রোগীর অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—"না—কোন ভয়ই নাই। আমি যা ঔষধ দিয়া যাইব, সেটা ঠিক করিয়া ঘড়ী ধরিয়া খাওয়াও। কালই জ্বর ছাড়িয়া যাইবে।"

স্বর্ণ আড়াল হইতে ডাক্তার বাবুর কথা শুনিল। শুনিয়া তার মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। ডাক্তার ঔষধ দিয়া পথ্য ব্যবস্থা করিয়া ভিজিটা না লইয়াই চলিয়া গেলেন। কেননা—এই ভগবান তাঁহার অতি প্রিয়।

ডাক্তার-বাবুর কথাই সত্য হইল। তৎপর দিনে জ্বর ছাড়িল।

তর্কালঙ্কার মহাশয়, সহরের বড় একজন ডাক্তারকে চিকিৎসা করিতে দেখিয়া, খুবই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। পরদিন কল্যাণীর জ্বর ছাড়িয়া গেল দেখিয়া, তিনি বড়ই সন্তোষ লাভ করিলেন।

বস্তুতঃ সেই দিন কল্যাণী খুব ভালই ছিল। কন্যা স্বর্ণ-প্রতিমা বলিল—"মা! কাল তোমার অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে আমরা খুবই ভয় পেয়েছিলুম। ভাগ্যে ভগবান দাদা এখানে এসে পড়েছিলেন, তাই তোমায় বাঁচাতে পাল্লুম। তিনি কাল এখানে পৌছেই, তোমার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে, সহর থেকে একজন বড় ডাক্তার এনে ছিলেন। তাঁর ঔষুধেই তুমি প্রাণে বেঁচে গেছ।"

কল্যাণী সাগ্রহে ত্রস্তভাবে বলিলেন—"তোর ভগবান দাদা কোথায়?"

স্বর্ণ, ভগবানকে বাহির বাড়ী হইতে ডাকিয়া আসিল। ভগবান কল্যাণীর কৃতজ্ঞতা উচ্ছাস প্লাবিত স্নেহভাব দেখিয়া ডাকিল—"মা?"

কল্যাণী বলিলেন—"বাবা! তোমার মত ছেলে যার,—সে কি ম'রে। তা তুমি সত্য সত্যই আমাদের ভগবান।"

ভগবান জিভ্ কাটিয়া বলিল—"ও কথা বল্‌তে আছে কি জননি! ওতে পাপ হয়! ছার কীট হয়ে এ পৃথিবীতে এসেছি, আমি কি ক্যর্ত্তে পারি? তবে যাঁর কাজ তিনিই করাচ্ছেন বটে!"

কল্যাণী। এই যে এত ডাক্তার বদ্দি আন্‌লে, কত খরচ হলো ভগবান?

ভগবান। সে জন্য এখন ভাবনা কেন মা! পরে জমা খরচ করে বলবো।

ইহার পর হইতে কল্যাণী দিনে দিনে সারিতে লাগিলেন, পথ্যও পাইলেন। ভগবানের চেষ্টায়, কল্যাণী সে যাত্রা প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন। দিনে দিনে বল পাইতে লাগিলেন।

মাতা আরোগ্য লাভ করিলে, কন্যা স্বর্ণ-প্রতিমা, উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া নরেশচন্দ্রের সেই চিঠি খানি তাহার মাকে দেখাইল।

ঠিক সাতদিন হইল, চিঠি খানি আসিয়াছিল। তাহাতে নরেশচন্দ্র এক সপ্তাহের মধ্যে, তাঁহার পত্নীকে তাঁহাদের বাটীতে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। পাঠাইবার এই মেয়াদের শেষ দিনেই, স্বর্ণ তার মাকে সেই চিঠিখানি দেখাইল। তাহার অপরাধ কি?

কল্যাণী চিঠি খানি পড়িয়া বড়ই বিমর্ষ হইলেন। বৃদ্ধা মাতার পীড়া লইয়া, নরেশচন্দ্র কষ্ট পাইতেছেন—এটা তাঁর পক্ষে বড়ই অসহ্য হইল। তিনি কন্যাকে বলিলেন—"মা স্বর্ণ! বিবাহের পর শ্বশুরগৃহই বাঙ্গালীর মেয়ের প্রকৃত ঘরকন্না। লোকে বৃদ্ধ বয়সে সেবা শুশ্রূষা পাবার জন্য, পুত্র কামনা করে। ঝি বৌ মানুষ করে। আমার ব্যায়রাম ত সেরে গেছে। খুব বল পেয়েছি আমি। রাখালের মা এখানে যখন রইলো, তোমার ভগবান দাদা রইলো, তখন আমার কোন ভাবনা নেই। তুমি শ্বশুর বাড়ীতেই যাও। এই অসুখের সময় যদি তুমি তোমার শাশুড়ীর সেবা কর্ত্তে নাপার, তাহ'লে তোমার জন্মই বৃথা। আমি ভট্টাচার্য্য কাকাদের বাড়ী থেকে

পাঁজি দেখিয়ে আসছি। আর তোমার ভগবান দাদা যখন এখানে আছে, তোমায় শ্বশুর বাড়ীতে রেখে আসবার লোকেরও অভাব নেই।"

স্বর্ণ-প্রতিমার প্রবৃত্তিগুলি এমন ভাবে গঠিত হইয়া ছিল, এমন ভাবে কল্যাণী তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে মার কথা সে যেন বেদ-পুরাণের কথার মত মান্য করিত।

স্বর্ণ এই বয়সেই স্বামী চিনিয়াছিল। নরেশচন্দ্রকেও বিধাতা অতি সুন্দর উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে এই রূপবতী পত্নী, স্বর্ণপ্রতিমার রূপমুগ্ধ হইয়াই যে তাহাকে খুব ভাল বাসিত, তাহা নয়। সে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিল—এমন কতকগুলি নারী দুর্লভ গুণ বিধাতা এই স্বর্ণকে দিয়াছিলেন, যাহা এখনকার কালের বধুগণের মধ্যে তাহাদের অনেক গুলিরই অভাব দেখা যায়। তাহার উপর স্বর্ণের শ্বশ্রূভক্তি অতুলনীয়। এজন্য স্বর্ণর শাশুড়ীও "বৌমা" বলিতে অজ্ঞান হইতেন।

তবে মাতার দেহের এই রোগজীর্ণ অবস্থায়, তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে, তাহার মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল। মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া সে বলিল—"মা! যাই বল, কেন তুমি, [illegible] তোমার বড় কষ্ট হবে?"

কল্যাণী। আমার জন্য তুমি ভেবোনা মা! এক জনের [illegible] চাট্টি ঝোলভাত বইতো নয়। তা রাখালের মা উজ্জুগ করে দিলে আমি সবই করে নিতে পারবো। না পারি, তিন চার দিনের জন্য না হয় ভটচাজ্জি বাড়ীতে খাবার বন্দোবস্ত করবো।

স্বর্ণ। তোমার যদি আবার অসুখ হয়! কে দেখ্‌বে তোমায়?

কল্যাণী। আমার ভগবান আমায় দেখ্‌বেন।

এমন সময়ে ডাকহরকরা বাহির হইতে হাঁকিল—"চিঠি আছে নিয়ে যাও।"

রাখালের মা—তখন গোয়ালে গরুর জাব দিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গিয়া, চিঠি খানি লইয়া আসিল। সহাস্য মুখে বলিল—"মা! বাবুর চিঠি এসেছে।"

কল্যাণী সহাস্য মুখে বলিলেন—"তুই কেমন করে জানলি রাখালের মা?"

রাখালের মা বলিল—"ক'বার ত তোমার চিঠি আমিই এনে দিয়েছি মা? বাবু যে ঐ রকম বিটকিলে রঙ্গের খামে চিঠি লেখেন।"

কল্যাণী সাগ্রহে সেই চিঠিখানি পাঠ করিলেন—তাহাতে বেশী কথা লেখা নাই। রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"কল্যাণ! আমি সকল বিষয়েই ভাল আছি। নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথও অন্নপূর্ণা দর্শনে প্রাণের ময়লা, মনের পাপ, কাটিয়া যাইতেছে! সাহেব বলিয়াছেন, ঠিক আর এক মাস পরে, আমায় দেড়মাসের ছুটি দিবেন। আমি সেই সময়ে নিশ্চিন্তমনে এই দেড়মাস কাল বাটীতে [illegible] তার পর তোমাদের লইয়া আসিব।

"নরেশের এক চিঠি পাইলাম। সে লিখিয়াছে, তার মার বড় অসুখ। এজন্য সে স্বর্ণকে লইয়া যাইতে চায়। তোমাকেও সে এ সম্বন্ধে পত্র লিখিয়াছে। অতএব যত শীঘ্র পার, স্বর্ণকে শ্বশুরালয়ে

পাঠাইয়া দিবে। মনে জানিও, স্বর্ণপ্রতিমা এখন আর আমাদের জিনিস নয়। তাহার উপর আমাদের অধিকার এখন খুব কম।"

পত্রখানি পড়িয়া, কল্যাণী প্রাণের মধ্যে বড়ই আনন্দ পাইল। দশটা ডাক্তারী টনিকে যে উপকার করিত, এই পত্রের কয়েকটী কথা—"দেড়মাস পরেই যাইতেছি" তাহার মনে ও দেহে শক্তি সঞ্চার করিল।

কল্যাণী পত্রখানি পড়িয়া কন্যার হাতে দিয়া বলিল—"এখানি পড়ে দেখ স্বর্ণ! আমি যখন সেরে উঠেছি, তখন আমি তোমায় স্বচ্ছন্দে পাঠাতে পারি। এই একমাস কাল যে ভাবে আমার সেবা করেছো, সেইভাবে তুমি তোমার শ্বাশুড়ীর সেবা যত্ন কল্লে তিনি নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন। তার পর উনি এলে, তোমাকে আনিয়ে নিতে আমাদের বেশী কষ্ট পেতে হ'বে না।"

বলা বাহুল্য, তর্কালঙ্কার ঠাকুরকে দিয়া পাঁজি দেখাইয়া কল্যাণী তৎ পর দিনই স্বর্ণ প্রতিমার শ্বশুরবাড়ী যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া দিলেন। আর আমাদের পাগল ভগবান, তাহার স্বর্ণ দিদিকে যথাসময়ে তাহার শ্বশুর গৃহে পৌঁছাইয়া আসিল!

ভগবান ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, স্বর্ণের শাশুড়ীর অবস্থা ভালর দিকে ফিরিয়াছে। রোগটা সারিয়া উঠিতেছে। এখন কেবল সেবা শুশ্রূষার প্রয়োজন। তা স্বর্ণ দিদি, যখন তাঁর সেবার জন্য গিয়াছেন, তখন বোধ হয় বৃদ্ধা এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবেন।"

রমেশচন্দ্রের বিদেশ-গমনের পর, এই ভাবের ছোট বড় ধাক্কা গুলি, কল্যাণীর উপর দিয়া যাইতেছিল।

২১

স্বর্ণের শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার পর, চারি সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কালিকিশোরের বাটীতেও অনেক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে।

কালীকিশোর যে ক্ষুদ্র তালুকখানি কিনিয়াছিল, তাহা তখন ঘটনাচক্রে পড়িয়া বড়ই বিপন্ন। তাহার নায়েব, যে এই তালুকের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ম্মচারী ছিল, সে শয়তানী করিয়া জমিদারের প্রাপ্য খাজনা সরকারে দাখিল করে নাই। অন্য একজন পত্তনিদারের সহিত যোগসাযোসে আর তাহার নিকট প্রচুর টাকা খাইয়া, সে এই ভয়ানক কাজ করিয়াছিল।

সে বৎসর অজন্মার বৎসব। সুতরাং প্রজার নিকটও ভালরূপ খাজনা আদায় হয় নাই। কালীকিশোর সেই নায়েবের নামে, তহবিল তছরূপ ও হিসাব নিকাশের দাবি দিয়া নালিশ করিয়াছে। কিন্তু তাহার ফল সে কোথায় দাঁড়ায়, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেননা সেই নায়েবপ্রবর সমস্ত কাগজপত্র লইয়া ফেরার হইয়াছে। কালীকিশোর এজন্য এই নায়েবের নামে ফৌজদারীতেও বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য একটা নালিশ করিয়াছিল। উভয় মোকদ্দমায় একদফা এক মাস পরে দিন পড়িয়াছে।

কালীকিশোর এই ব্যাপারে বড়ই দামিয়া গিয়াছিল। সে এক এক সময়ে মনে মনে ভাবিত—"হায়! কেন আমি আক্রোশ-বশে রমেশকে পথে দাঁড় করাইতে গিয়াছিলাম? তাহার ফল যে হাতে হাতে ফলিল। প্যালার মার চুরী করা টাকা, কেন আমি

বাক্সের মধ্যে রাখিয়াছিলাম? সেই জন্যই যে আমার এই মহা সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গেল।

আর তাহার গুণধর পুত্র অন্নদা! সে হতভাগা দিন দিন অবনতির স্তরে নামিতেছে। তাহার "অন্নদা-নাট্যসমাজ" এই সময়ে সর্ব্ব বিষয়ে খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। কেননা—তাহাতে খুব স্বচ্ছন্দ মদ ও হররা চলিত। আর তার সঙ্গে তাহাদের নির্ব্বাচিত পুস্তক দক্ষযজ্ঞেরও খুব মহলা চলিত। আর এক দিন মহলার সময়ে, মদের উত্তেজনায়, আসল দক্ষযজ্ঞ উপস্থিত হইত।

অন্নদাকিশোর, তাহার পিতাকে এদানীং বড় একটা গ্রাহের মধ্যে আনিত না। কেননা, আগে সে পিতাকে লুকাইয়া একটু আধটু সুধা পান করিত। এখন পুরা মাত্রায় পান করিয়া, মাতাল অবস্থাতেই সে বাড়ীতে ঢোকে।

একদিন কালীকিশোর, তাঁহার গুণধর পুত্রকে এইরূপ টল টলায়মান অবস্থায় বাটী প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া হইয়া উঠেন। রাগ সামলাইতে না পারিয়া, তিনি তাহাকে বলেন "হতভাগা নচ্ছার! তুমি এমন ভাবে উচ্ছন্ন যাচ্ছো! আমি তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করবো।"

আর তাঁহার উত্তরে অন্নদা তাহাকে শাসাইয়া গেল—"দেখা যাবে কে কার কি করে! আমি কল্‌কেতা থেকে গুণ্ডো আনিয়ে তোমার মাথা ফাটাবো, তবে আমার নাম অন্নদা!"

বলা বাহুল্য, অন্নদা এই ঘটনার পর, আর বাড়ীতে ঢোকে নাই। সে দিনরাত বাগান বাড়ীতেই থাকিত। আর তাহার গর্ভ-

তারিণী তাহার পুত্রের এই লাঞ্ছনা শুনিয়া, সময়ে অসময়ে এই বিষয় লইয়া স্বামীর সহিত কলহ করিতেন।

এক দিন এই রুদ্রচণ্ডা গৃহিণী কালীকিশোরকে বলিল— "হতচ্ছাড়া বুদ্ধি তোমার ঘটেছে। কশাই ঢের ঢের দেখেছি, কিন্তু তোমার মত কশাই ভগবান খুব কমই সৃষ্টি করেছেন। একমাত্র ছেলে আমার, তাকে তুমি ত্যজ্য পুত্র করবে? বাছা আমার বাড়ী ছাড়া হয়ে বাগানে রেঁধে খাচ্ছে। আর তুমি এখানে মাছের মুড়ো গিলছো! এ সংসার করা চুলোয় যাক— আজই আমি বাপের বাড়ী চলে যাব। থাক তুমি, তোমার খত তমসুক আর হরিনামের ঝুলি নিয়ে!"

এই রুদ্রচণ্ডারূপিণী কালীকিশোরের গৃহিণী, সত্যসত্যই সেই দিন অপরাহ্নে তাহার বাপের বাড়ী চলিয়া গেলেন। অন্নদা যেমন গৃহত্যাগ করিয়া বাগানে বাস করিতেছিল, কালীকিশোরও সেইরূপ অন্দর ছাড়িয়া, বাহিরের ঘরে দিন কাটাইতে লাগিল।

বিধাতা নরক বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পূতিগন্ধময়, মলমূত্র পুরীষপূর্ণ স্থান সৃষ্টি করেন নাই। এই সংসারেই স্বর্গ ও নরক দুই ভোগ হয়। ইহার পর যদি আরও কোন অপরিদৃশ্য নরক থাকে, তাহা হইলে তাহার সংবাদ পাইবার কোন উপায়ই নাই।

কর্ম্মদোষে মানব-মানবী, ভগবানের এই শান্তিময় বিশ্ব সংসারে, নিজের গৃহকেন্দ্রে এই স্বর্গ ও নরকের সৃষ্টি করে। যেখানে সুখ শান্তি নিঃস্বার্থ পরপ্রীতি, স্বার্থকলঙ্কশূন্য সরল ব্যবহার, গুরুজনে শ্রদ্ধা, দেবতায় ভক্তি থাকে, সেই সংসারই পুণ্যের সংসার। ইহলোকের

স্বর্গভূমি! আর যেখানে হীন স্বার্থ লইয়া কলহ, মনোবাদ, বিদ্বেষ, গুরুজনে অশ্রদ্ধা, পরশ্রীকাতরতা, শাস্ত্রবাক্য ও দেবতায় অনাদর ও আত্মম্ভরিতা ফুটিয়া উঠে, সেখানেই নরকাগ্নি তীব্র বেগে জ্বলিয়া উঠে। প্রমাণ—রমেশচন্দ্র ও কালীকিশোরের সংসার।

যাহা হউক, এখন কালীকিশোরকে ত্যাগ করিয়া, তাহার গুণধর পুত্র শ্রীমান অন্নদার নাট্যসমাজ কক্ষে, আমাদের একবার প্রবেশ করিতে হইবে।

অন্নদা ইতিমধ্যে একদিন একটা অতি দুঃসাহসিক কাজ করিল। সে একদিন গভীর নিশীথে, কালীকিশোরের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে, অর্থাৎ তাহার বহির্ব্বাটিতে থাকার সময়ে, চাবির হাত বাক্স অন্য একটি চাবি দিয়া খুলিয়া, তাহার মধ্য হইতে লোহার সিন্দূকের একটী বড় চাবি বাহির করিল। তার পর অতি সন্তর্পণে, সেই লোহার সিন্দুকটি খুলিয়া, পাঁচশত টাকার নোট সংগ্রহ করিয়া, সিন্দুকের ভিতরের জিনিস, ঠিক ভাবে সাজাইয়া রাখিয়া কক্ষের বাহির হইতে যাইতেছে এমন সময়ে সে দেখিল— সেই কক্ষের দ্বারপথে দাঁড়াইয়া তাহার পিতা কালীকিশোর।

লোহার সিন্দুক যে ঘরে থাকিত, কালীকিশোর সেই ঘরে খুব মজবুত একটা তালা লাগাইয়া নিশ্চিন্তমনে বাহিরে গিয়া শুইত। বলা বাহুল্য, গুণধর অন্নদা, এইতালার চাবিটি আগে খুলিয়া, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে।

কালীকিশোর উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"ও কি সর্ব্বনাশ করিতেছিস্ অন্নদা!
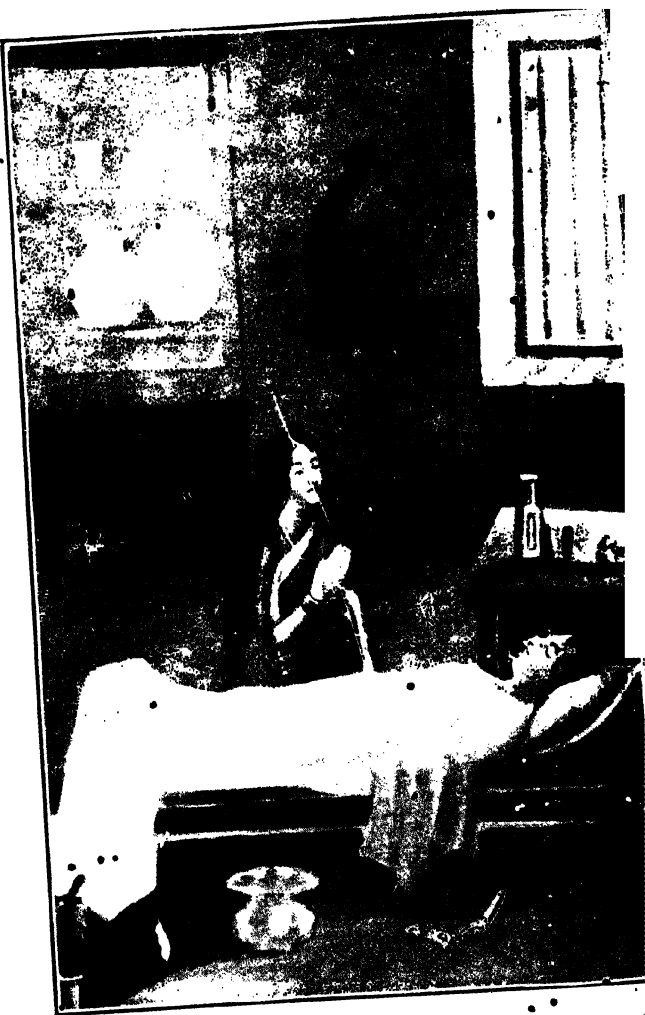
স্বর্ণ প্রতিমা যুক্তকরে ভগবানকে ডাকিয়া বলিল—"নারায়ণ ! আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণে ভরসা দাও, এ বুক খানিকে আর ভাবনায় দমিয়ে দিও না।"

অন্নদা পিতাকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া একটুও দমিল না। কেননা, সে তখন গোলাপী গোছের নেশা করিয়াছিল।

এজন্য অন্নদা বলিল—"তুমি ত আমায় ত্যজ্য পুত্র করিবে। তোমার এ যক্ষের ধন সহজে ত আমার ভোগে হবে না? কাজেই এই সোজা উপায় অবলম্বন করিয়াছি।"

কালী। টাকার দরকার কি তোর?

অন্নদা। তোমারই বা এতটাকা জমিয়ে রাখবার কি দরকার? আমায় যখন ত্যজ্যপুত্র করেছ এ টাকা ভোগ করবে কে? তুমি কি ভেবেছ—অজর অমর হয়ে, পরের সর্ব্বনাশ করে যে টাকা জমিয়েছ, তা চির দিন দরোয়ানের মত চৌকি দিয়েই চ'লে যাবে।"

কালী। এতবড় আস্পর্দ্ধা তোর! তুই আমার মুখের উপর এতবড় কথা বলিস্।

অন্নদা। আমি যে তোমার কুসন্তান বাবা! কুসন্তানের কাছে এর চেয়ে তুমি আর কি বেশী আশা কর্ত্তে পার? লোককে ঠকান যখন তোমার ব্যবসা, তখন তোমার ছেলে হয়ে আমি যে সে প্রবৃত্তিটা পাবোনা, তা তো অসম্ভব নয়।

কালীকিশোর মনে মনে বলিল—অন্নদা ঠিকই বলিয়াছে। কু-পিতারই কুসন্তান হয়। আর সে কুসন্তানের কাজই এইরূপ।

কিন্তু এ সব চিন্তার সময় তখন নয়। কালিকিশোরের দৃষ্টি সহসা অন্নদার হস্তস্থিত সেই নোটের তাড়ার উপর পড়িল। তাঁহার যক্ষের ধন, কুপুত্র অন্নদা অপব্যয়ে নষ্ট করিতে যাইতেছে, সে তাহা সহ্য করিতে পারিল না।

রুষ্টস্বরে কালিকিশোর বলিল—"রেখে দে টাকা ঐ সিন্দুকের ভেতর। তোর যা দরকার হয়, কাল আমার কাছে চেয়ে নিস্।"

অন্নদা জড়িত স্বরে বলিল—"তা কি হতে পারে বাবা! তুমি দিন রাত শাস্ত্র আওড়াও। তেলক-ছাপ কাটো, কুঁড়োজালির মধ্যে হরিনামের মালা ফেরাও। তোমার শাস্ত্রেই বলে "সর্ব্বনাশ-সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ"। দেখ। এই হাজার টাকা এখন আমার হস্তগত হয়েছে। আচ্ছা তোমার খাতিরে, শাস্ত্রবাক্য মেনে, ধর্ম্মের দায়ে, না হয় এর অর্দ্ধেক ত্যাগ কচ্ছি। পাঁচশো খানি টাকা আমায় এখনি নিয়ে যেতে হবে।"

কালীকিশোর। বলি এ টাকাটা নিয়ে কোথায় যাবি ভেবেছিস্?

অন্নদা। সেটা বলতে আমি বোধ হয় বাধ্য নই?

কালীকিশোর। দেখ্ অন্নদা! আমি গলায় দড়ি দেব!

অন্নদা। আমিও তেরাত্রে অপঘাতের শ্রাদ্ধ ক'রে শুদ্ধ হবো?

কালীকিশোর। বটে রে গুওটার সন্তান! কখনও তুই এ ঘর থেকে বাইরে যেতে পারবিনি!

"বটে!" এই কথা বলিয়া অন্নদা তাহার পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া কালীকিশোরের বুকের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"আমার মেজাজের ঠিক নেই। আমায় রাগিও না। বাধা দিও না। এই পিস্তলের গুলিতে, তোমার চৈতনশুদ্ধ মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

কৃপণের মৃত্যুভয়, বোধ হয় আর সকলের চেয়ে বেশী। পিস্তল

দেখিয়াই কাপুরুষ কালীকিশোর দ্বারপথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। আর সেই কুপুত্র অন্নদা, পাঁচশো টাকার নোটের তাড়া তাঁর বাপের সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, বাকী পাঁচশো টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

কালীকিশোর সেখানে দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—"আচ্ছা! দেখ্‌বো কতবড় পাজি তুই! আমি তোর নামে পুলিসে নালিশ করবো। দেখি! কে তোকে রক্ষা করে।"

অন্নদা কথাটা শুনিতে পাইয়া আবার ফিরিয়া আসিল। সহাস্য-মুখে বলিল—"জানি আমি তোমার মত অর্থপিশাচে তাও কর্ত্তে পারে। কিন্তু পুলিস্ আমার কলা করবে? বাদী হ'চ্ছো তুমি, আর প্রতিবাদী হ'চ্ছি আমি! সাক্ষী তোমার কই? সাক্ষী না হ'লে কি মামলা চলে বাবা! এতবড় মামলাবাজ লোক হয়ে, এ সোজা কথাটা ভেবে দেখবার অবসর তোমার হয়নি বুঝি?

কালীকিশোর একথার কোন উত্তর দিল না। সে মনে ভাবিল; "বাপকা বেটা আউর সিপাহীকা ঘোড়া" অন্নদা তার চেয়েও বেশী মাম্‌লা বোঝে।

কালীকিশোর, বিষণ্নমুখে অগত্যা সেই পাঁচশত টাকার নোটের তাড়াটি সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া দিল। আর সে দিন রাত্রে সেই দুঃখেই নিদ্রাহীন অবস্থায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইল।

[illegible]গুলি হাতে লইয়া, খিড়কীর বাগানে আসিয়া, অন্নদা এক চোট খুব হাসিয়া লুটাপুটি খাইল। তারপর সে অস্ফুট স্বরে বলিল

"কেমন জব্দ করেছি! তুমি কত বড় কৃপণ বাপ, আর আমি কত বড় খরচে ছেলে, একবার নমুনা দেখিয়ে দিলুম মাত্র। আমাকে তুমি ত্যজ্য-পুত্র করবে—না?"

তারপর সে খিড়কীর পাচিল টপকাইয়া, দুইখানা ছোট ছোট মাঠ পার হইয়া, তাহাদের বাগানের বা অন্নদা-নাট্যসমাজের মধ্যে প্রবেশ করিল।

উপরে তাহার ইয়ারবর্গ তখনও ধীরগতিতে "কারণ" চালাইতেছে। একটা ছোট খাট হল্লাও যে তার সঙ্গে না ছিল, এমন নয়। অন্নদা দরোজার কাছে আসিয়াই নোটের তাড়া সংবলিত পকেটটা চাপ্‌ড়াইয়া বলিল—"কাজ হতে!"

অদ্বৈত একটু ইংরাজী কায়দার সহিত হাততালি দিয়া বলিল—"Thtee cheers for you! You come like a conquering Hero! তা এত দেরী হলো কেন?"

অন্নদা বলিল—"কাজটা কি এত সহজ মনে করেছ অদ্বৈত? ভাগ্যে বুদ্ধি করে পিস্তলটা সঙ্গে নিয়েছিলুম।"

অদ্বৈত, একথায় একটু ভয় পাইয়া বলিল—"বলি—খুনখারাপি করে এলে না কি?"

অন্নদা, একখানা চেয়ারে বসিয়া, একটা পেগ্‌ ঢালিয়া গলাধঃকরণ পূর্ব্বক বলিল—"তুমি কি আমায় এত বোকা পেয়েছ লর্ড! খুনোখুনীতে আমি নেই। ভয় দেখিয়েই, কাজ সাবাড় করে এসেছি।"

অন্নদা তখন তাহার বীরত্ব কাহিনী অভিনয়ের ভঙ্গীতে বন্ধুবর্গের

কাজে বলিল। অদ্বৈত, অন্নদার পিঠ চাপড়াইয়া তারিফ করিয়া বলিল—"এমন না হ'লে কি তোমাকে আমরা কাপ্তেন করেছি যাদু! সোনার চাঁদ ছেলে তুমি।"

এই অদ্বৈত আজ কাল অন্নদার আড্ডাতেই আসন গাড়িয়াছে। কিম্বদন্তী বলে, সে পুনরায় আফিসের ক্যাস গোলমাল করিয়াছিল। কিন্তু এবার ত ক্ষমাগুণ সম্পন্ন রমেশচন্দ্র সেখানে নাই। হেমন্ত তখনই তাহাকে হাতনাতে ধরিয়া সাহেবের কাছে উপস্থিত করায়, তাহার চাকরিটী গিয়াছে। অন্নদার মোসাহেবী করিলে টাকাটা সিকাটা পাওয়া যায়, কাজেই সে এখানে জুটিয়াছে।

অদ্বৈত এখন অন্নদার দক্ষিণ হস্ত। কারণ, সে যে উপায়ে সেই পাঁচশত টাকা হস্তগত করিয়া আনিল, তাহা এই অদ্বৈতের পরামর্শেই হইয়াছে। অদ্বৈত বলিল—"এ নিয়ে তোমার বাপ কোন পুলিশ হাঙ্গামা করিবে না ত?"

অন্নদা সম্মুখস্থ টেবিলের উপর একটা ঘুসি মারিয়া বলিল—"ননসেন্স! হাঙ্গাম কল্লেই হয় আর কি! তা যদি করে, তা হ'লে জেনো ও সিন্দুকে কিছু থাক্‌বে না। জেলেই যদি আমায় যেতে হয়, তাহলে যা করবো, তা কোন কুপুত্রেই কখনও কর্ত্তে পারেনি।"

একথায় অদ্বৈতর একটা কৌতুহল জাগিয়া উঠিল। সে অন্নদার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—"বলি করবে কি, তা শুনতে পাইনি কি?"

অন্নদা একটু উত্তেজিত স্বরে বলিল—"করবো কি জান! যা করবো, তাতে বাবার জন্মের মত শিক্ষা হবে। বাবাকে এবার বুঝিয়ে দেব, যে এবার তাঁকে তাঁর চেয়েও একটা সাংঘাতিক শয়তানের

পালায় পড়তে হয়েছে। যতলোকের সর্ব্বনাশ করে, যাঁ গুনোট তমসুক খত কবর কট্‌কোবালা নিয়েছেন, সবই ওই সিন্ধুকের ভিতর। জেলে যদি যেতেই হয় ত ওর মুখের দিকে চাইবো কেন? আর একদিন খুব চুপিসাড়ে যাবো। আর নোটগুলি আগে সরিয়ে তারপর একটা বাতি জেলে, যত খৎতমসুক আছে, পুড়িয়ে ছারখার করবো। গরীব নাতান লোকগুলো বেঁচে যাবে—আমায় দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে! কি বল তুমি অদ্বৈত? জানতো আমি মিষ্ট কথার গোলাম। চোখ রাঙ্গানির কেউ নই।"

অদ্বৈত মোসাহেবী করিতে চিরদিন অভ্যস্ত। সে বলিল—"তা তোমার plan টাতে খুব brain খেলিয়েছে, তার আর সন্দেহ নাই। ওসব মতলব ত আমাদের মাথাতেই আসে না। যাই হক্ আজ রাত হয়েছে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া যাক্।"

সেই দিন তাহাই হইল। রমেশের বাড়ীতে যে প্যালার মা ঝী ছিল সে শয়তানী সম্পূর্ণরূপে অন্নদার হাত ধরা। তার কারণ, সে যে একশত টাকা কল্যাণীর বালিশের নীচে হইতে চুরী করিয়া আনিয়া ছিল, ধড়ীবাজ কালীকিশোর তাহাকে ভয় দেখাইয়া, তাহার সমস্তটাই আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু এই অন্নদা মাঝখানে আসিয়া পড়ায়, সে পঞ্চাশটী টাকা মাত্র পায়। এজন্য সে অন্নদার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ।

অন্নদা পর দিন প্রাতে উঠিয়া, প্যালার মাকে ডাকাইল। এখন এই প্যালার মা, কালীকিশোরের বাটীতে পাকা ঝিয়ের ক... করিতেছে। অন্নদা প্যালার মাকে বলিল—"দেখ্‌, কাল বাবার

সঙ্গে আমার খুব একটা ঝগড়া ঝাটি হয়ে গেছে। বাবা যদি আমার সম্বন্ধে কোন কিছু কথা বলেন বা কারুর সঙ্গে কোন পরামর্শ করেন, তাহলে আড়াল থেকে শুনে আসবি। যদি কোন নূতন খপর আন্‌তে পারিস্, তাহলে তোকে একটা টাকা বখ্‌শীশ করবো।"

প্যালার মা তাহার দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া বলিল—"তা, খোকা বাবু তোমারই তো খাচ্ছি। আজই তোমাকে নূতন খবর এনে দোব!"

প্যালার মা চলিয়া গেলে, অন্নদা বামন-ঠাকুরকে সকাল সকাল রান্না চড়াইতে বলিল। অন্নদার মনের কথা এই—"হেসে খেলে নাওরে যাদু মনের সুখে।" এজন্য সে অদ্বৈতকে দিয়া কলিকাতার এক হোটেলী রসুয়েব্রাহ্মণকে সেই বাগানবাড়ীতে আনাইয়াছিল। এই বিষ্ণুপুরী ঠাকুরটী, কলিকাতার কোন "হিন্দু-আশ্রমের" ফেরত, কাজেই মাংস চপ-কটলেট্,কালিয়া-পোলাও ইত্যাদি তাহার পাচক বৃত্তির প্রধান জিনিসগুলি তৈয়ারি করিত। আজ কাল এই সব আহেল বাকুয়ানা খানা না হইলে, অন্নদার আহারে রুচি হইত না।

বিষ্ণুপুরে ঠাকুর অন্নদাকে একটু আপ্যায়িত করিবার জন্য বলিল "খালি চা'টা খাবেন? ডিমের কোন কিছু রকম করে এনে দোব কি?"

অদ্বৈত বলিল—"নিশ্চয়ই! সে দিন অনেকগুলো ডিম্ কেনা হয়েছে। আর জান ত ঠাকুর! শুধু চা খেলেই, আমাদের খোকা বাবুর মাথা ধরে। তা, হাফ্ বয়েল করে মসলা মাখিয়ে এনে দাও। চার সঙ্গে সেই রকম ডিমই ভাল লাগবে।"

যথা সময়ে চা, সিদ্ধ ডিম্ব প্রভৃতি আসরে আসিয়া পৌছিল। অন্নদা চা পান করিতে করিতে বলিল—"টাকা তো হাতে এলো অদ্বৈতচরণ। এখন এদিকের কি করা যায় বল দেখি? আমি সেদিন স্বচক্ষে দেখেছি—ঐ প্যাগলা, একখানা পাল্কীকরে তোমার রমেশবাবুর মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়ী রাখতে যাচ্ছে।"

অদ্বৈত বলিল—"ওঃ! তা হলে দেখ্‌ছি খুব মজা হয়েছে। তুমি এ ব্যাপারে আর গয়ংগচ্ছ করোনা। পাখিকে যেমন পিঞ্জরেয় পোরা, আর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় চালান দেওয়া।

অন্নদা। আগে কাজটা কি রকমে কর্ত্তে হবে, তাই ঠিক হোক। তা না হয়ে, "গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল" মাখ্‌লে কি হবে?

অদ্বৈত। সে সব মতলব ঠিক না করেই কি তোমায় বলছি। দেখ! রমেশের ঐ জামাই নরেশ ছোঁড়াটা আমাকে একদিন বল্‌ছিল—"আপনাদের আফিসে খালি টালি হয় না অদ্বৈতবাবু! আমি তখন তাকে বলেছিলাম, শীঘ্র খালি হতে পারে। তুমি একখানা দরখাস্ত আমায় দিও। তা সে একদিন আমার বাড়ীতে এসে একখানা দরখাস্তও দিয়ে গেছে। এখন একটা কাজ কর্ত্তে পাল্লে হয়?

অন্নদা। কি কাজ?

অদ্বৈত। ছোঁড়াটাকে একখানা মিথ্যে টেলিগ্রাম করা। তা এ কাজটার দায়িত্ব আমি নিতে রাজি আছি। তবে এর জন্য আমার একবার কলকাতায় যাওয়া চাই। কেননা টেলিগ্রাম খানা, আমাদের আফিসের সাহেবই কচ্ছে, এই ভাবে কলকেতা থেকেই কর্ত্তে হবে।

ছোঁড়াকে লেখা হবে—তোমার চাকরি ছবার সম্ভাবনা আছে। সোমবারে দেখা করো। সোমবার অর্থাৎ—পরশু। সোমবার কেন বল্লুম জান, তা হলে ছোঁড়াটা শনিবারে এখান থেকে রওনা হতে পারে। আর রবি না হয় সোমবারে, আমরাও এই কাজটা ফতে করবো।

অন্নদা। এতে তোমার কোন বিপদ হবে না ত?

অদ্বৈত। আমার কি বিপদ! সাহেবরা ওকে দেখ্বামাত্রই ভাগিয়ে দেবে, আর টেলিগ্রাম খানাকে hoax মনে করে ছিড়ে ফেলবে। আর একবার ঐ আপিসে এই রকম একটা কাণ্ড হয়েছিল।

অন্নদা। এ যুক্তি মন্দ নয়। তা হ'লে তুমি কাল সকালেই চলে যাও। ছোঁড়াটা বাড়ী থেকে না স্'লে ত আর এ কাজে স্থবিধা হবে না। কাল হ'চ্ছে শুক্রবার। সকালে ক'ল্লে, বিকালে টেলিগ্রাম খানা ওর হাতে পড়বেই পড়্বে। ছোঁড়াটা বাড়ী ছেড়ে গেল কিনা, তার সন্ধান আমি নিতে পারবো। আমাদের দলে রাইচরণ বলে যে বৈরাগির ছেলেটা আছে, সে দুই একদিন না হয় ভিখিরির বেশ ধ'রে, ওদের গ্রামে ঢুকে সব সন্ধান সংগ্রহ করবে।

অন্নদা বলিল—"তা যেন হলো। এখন আদত কাজটা কি করে শেষ করা যায়?"

অদ্বৈত। সেটা সেদিন ত তোমায় বলেছি। তাদের বাড়ী মোটে তিনখানা মেটে ঘর। একখানা বড়—সেইটেতে নরেশ শোয়। আর একখানায় তার মা, সেই বুড়ীটা থাকে। আর ছোট

খানা হ'চ্ছে বাঃ চাঁদ! যেরূপ দেখ্‌ছি, তাতে বুড়ীর শোওয়ার ঘরখানায় আগুন দিলেই, সব দিকে সুবিধা হবে। আমি তুমি আর রাইচরণ তিনজনে এক্ষেত্রে থাক্‌বো। আমি রাইচরণকে চালিয়ে নেবো। তুমি ছুঁড়ীটার মুখবেঁধে ফেলে একেবারে নৌকায় তুলো। কিন্তু এসব কর্ত্তে গেলে পাঁচশোখানি টাকা চাই। সকলকে কিছু কিছু না দিলে তারা আজকালকার আইনের এই কড়াকড়ির দিনে, এসব ঝুঁকির কাজে এগুবে কেন? ধরা পড়লে সবাইকে ত ঘানি টান্‌তে হবে।"

অন্নদা কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"টাকার জন্য ভাবনা কি? এই নাও পাঁচশত টাকা। এতেও তোমার কুলুবে না?"

অদ্বৈত,নিজের নিঃস্বার্থপরতা ও বন্ধুর প্রতি একটা টান দেখাইয়া বলিল—"না না খোকা বাবু! পাঁচশ টাকার আপাততঃ দরকার নেই। একশো টাকা তোমার কাছে থাক। চারশো আমায় দাও। খরচখরচা বাদ যা উদ্বৃত্ত থাক্‌বে তার সব আমি তোমায় ফিরিয়ে দোব। পাই পয়সায় হিসেব পর্য্যন্ত তুমি পাবে।"

অন্নদা বলিল—"বন্ধু! তুমি কি মনে ভাব, যে আমি তোমায় অবিশ্বাস করি? তোমার যা দরকার হয়, তাই তুমি নাও। এর আর হিসেব দেওয়াদিই কি? তুমি যাই একান্ত নিঃস্বার্থ বন্ধু আমার, তাই, এতবড় একটা ঝুঁকির কাজে মাথা দিচ্ছো!"

বলা বাহুল্য—অদ্বৈত তৎপরদিন চারশো খানি টাকা লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। দুইটা টাকা দিয়া সে কলিকাতায় সদর আফিস হইতে নরেশচন্দ্রকে একখানা "আর্জ্জেণ্ট" টেলিগ্রাম করিল।

গ্রন্থকারের চক্ষু সকল দিকেই থাকে। সত্যই। হলফ করিয়া বলিতে পারি, ইহার মধ্য হইতে দেড়শতটাকা অদ্বৈত নিজের নামে বড় ডাকঘরের সেভিংসব্যাঙ্কের বহিতে জমা দিল। আর কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়,অন্নদার জন্য আধ ডজন হুইস্কি লইতে ভুলিল না। কেননা অন্নদারূপ উপদেবতার পূজার উপকরণ,সে ভাল করিয়াই জানিত। সেই জন্যই এই ভাবে জিনিষ পত্র লইয়া যথা সময়ে তাহাদের আড্ডায় পৌছিল।

২২

যাহাদের সর্ব্বনাশের জন্য, এই দুই শয়তান মিলিয়া ভয়ানক একটা চক্রান্ত করিল, একবার সেই চিরপ্রফুল্লমুখী স্বর্ণ-প্রতিমা ও সরলপ্রাণ নরেশচন্দ্রের খপর লইতে হইবে।

বলা বাহুল্য—নরেশ যথাসময়ে তাহার নামের সেই জরুরি টেলিগ্রাম খানি পাইয়াছে। তাহার মনে আর আনন্দ ধরে না। সে মনে মনে ভাবিল, ভাগ্যবতী পত্নী, স্বর্ণ-প্রতিমার পয়েই তাহার এই চাকরিটি এত সহজ হইয়া গেল। আজ কাল বাজারে, বি এ পাশ করা ছেলেরাও এক কথায় যখন চল্লিশ টাকার চাকরী জোগাড় করিতে পারে না, তখন অদ্বৈত বাবু যে এত চেষ্টা করিয়া তাহার জন্য যে এই চাকরিটী জোগাড় করিয়া দিলেন, তাহার জন্য সে তাঁহাকে মনে মনে খুবই ধন্যবাদ দিল। কেননা, অদ্বৈত একটু চালাকি খেলাইয়া সেই টেলিগ্রামে চল্লিশ টাকা মাহিনার কথাই লিখিয়াছিল।

নরেশচন্দ্র, পরদিন অর্থাৎ শনিবার প্রাতেই কলিকাতায় যাইবে হা স্থির হইয়া গিয়াছিল। নরেশ, খুব আহ্লাদের সহিত তাহার াকে এই টেলিগ্রাম খানির কথা শুনাইল। তাহার বৃদ্ধা জননী রেশচন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"বড় পয়মন্ত বউ আমি রে এনেছি বাবা! ওর পয়েই তোমার লক্ষ্মী ভাগ্‌গি হবে। তাহ'লে কালই দুর্গা বলে বেড়িয়ে পড়ো। আমি ত চিরদিনই একলা কাটিয়েছি। এখন ত বৌমা আমার কাছে আছে। আমার জন্য তোমার কোন ভাবনা নেই।"

রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। আহারাদি শেষ করিয়া, নরেশচন্দ্র তাঁহার নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া উৎসুক নয়নে দ্বারের দিকে চাহিয়া আছে। অলঙ্কারনিক্কণ শুনিলেই সে ভাবে, অই বুঝি তাহার চিত্তানন্দদায়িনী স্বর্ণ-প্রতিমা আসিতেছে।

নরেশ মনে মনে ভাবিতেছে—"এই সোণার প্রতিমাকে এই বিদ্যুৎ লতিকাকে, নিত্যই ত আমি চোখে দেখিতেছি। তবু আমার প্রাণের আশা মেটে না কেন? আমার বোধ হয়, পলকহীন নেত্রে, দিন রাত স্বর্ণর মাধুরীমাখা রূপরাশি দেখিলেও আমার নেত্রের তৃপ্তি হইবে না। বসন্তের জ্যোৎস্নার মত কি সুন্দর কান্তি, আমার এই স্বর্ণ প্রতিমার! মৃদুবাতবিকম্পিত শুভ্র বাসন্তী মল্লিকার মত কি সুন্দর সুবাস তাহার পবিত্রদেহে। পূর্ণবসন্তের মাধুরী মাখা কুসুমের মত কি সুন্দর হাসিটী তার। শুভ্রোর্ম্মিময় সমুদ্র তরঙ্গের মত, কত স্নেহস্ফীত বুকখানি তার! স্বর্ণ! আমি যে দরিদ্র। তোমার মত বহুমূল্য রত্নলাভের সৌভাগ্য বিধাতা আমায় দিয়াছেন বটে,

কিন্তু আমিতো তোমায় একটুও সুখে রাখিতে পারিতেছি না দিনরাত বাঁদির মত এ সংসারে খাটিতেছ, আমার আর মার কে কষ্ট না হয়, ইহাই তোমার যেন তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য তোমার নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ ভুলিয়া, আমাদের সেবার জন্য, সুখের জন্য, স্বচ্ছন্দের জন্য, জীবন সমর্পণ করিয়াছ। হায় স্বর্ণ! জানি আমার মত নষ্টভাগ্যের হাতে পড়িয়া তুমি নারী জীবনের সকল সুখ স্বচ্ছন্দ পাইবে কিনা?"

স্বর্ণপ্রতিমা ঠিক এই সময়ে চুপে চুপে সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া, স্বামীকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া স্থির ভাবে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল। নরেশচন্দ্রের দৃষ্টি, সহসা স্বর্ণের দিকে পড়ায়, তিনি বলিলেন "কতক্ষণ—আসিয়াছ তুমি স্বর্ণপ্রতিমা?"

স্বর্ণ, হাস্য মুখে বলিল—"বেশী ক্ষণ নয়। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে কি ভাবছিলে তুমি!"

নরেশ। তোমারই কথা!

স্বর্ণ। এত ভাগ্য আমার? তা কি ভাব্‌ছিলে শুনি?

নরেশ। তোমায় এক দিনের জন্য সুখী কর্ত্তে পারি না, পারবো কি না—তা জানিনা। এই সব কথা?

স্বর্ণ। আবার সেই পুরোণো কাহিনী! আমার সুখের জন্য বাকী কি রেখেছ তুমি! স্বামীর আদরের চেয়ে, স্বামীর মধুমাখা সম্বোধনের চেয়ে, আর পবিত্র বঙ্গসংসারের বধূজীবনের সার ব্রত শাশুড়ীর আর স্বামীর সেবা করার চেয়ে, বেশী সুখ বাঙ্গালীর মেয়ের ভাগ্যে আর বেশী কি হয়ে থাকে? দুখানা

ভাল কাপড় আর গয়না। ওসব পুতুল সাজানের খেয়াল! ছিঃ! ও কথা আর বলো না। তা কালই তা হ'লে কল্‌কেতায় যাচ্ছো ত!

নরেশ। তুমি কেমন করে জান্‌লে?

স্বর্ণ। মা আমায় সব বলেছেন। তোমার নামে একখানা টেলিগ্রাম এসেছে তাও দেখেছি।

নরেশ। স্বর্ণ! যদি এই চাকরীর জন্যে আমাকে কলকাতায় থাক্‌তে হয়।

স্বর্ণ। তা থাক্‌বে। তবে একটা ভাল জায়গায় থেকো। যেন তোমার দেহের কোন কষ্ট না হয়। শনিবার শনিবার বাড়ী আসবে। সবাই ত এই ভাবে বিদেশে চাকরী করে থাকে।

নরেশ। তোমার আমার জন্য একটুও মন কেমন কর্‌বেনা?

স্বর্ণ। একটুও না। কেননা এই হপ্তার পাঁচটা দিন পাঁচ রকমে কেটে যাবে। তবে শনিবার বাড়ী না এলে খুব কষ্ট হবে।

কিন্তু স্বর্ণের মনের কথা তা নয়। সে মনে মনে বলিল— নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। যাতে তোমার ভবিষ্যৎ ভাল হবে, এ সংসারের উন্নতি হবে, তোমার বৃদ্ধামাতা সুখে থাক্‌বেন, যাতে আমার সহস্র কষ্ট হলেও, আমি তা মুখবুজে সহ্য করবো।" কিন্তু পাছে নরেশ তাহার মনের প্রকৃত কথা শুনিলে দমিয়া যায় এইজন্য স্বর্ণ তাহার প্রাণকে একটু কঠোরসুরে বাঁধিয়া বলিল—"আমার একটুও কষ্ট হবে না।"

সেই প্রেমমুগ্ধ দম্পতি, সেদিন অনেক রাত্রি জাগিয়া, গল্প করিয়া কাটাইল। গম্ভীর নিশীথে, পেচকের কঠোর কণ্ঠস্বর শুনিয়া স্বর্ণ

বলিল—"কাল তোমাকে সকাল সকাল উঠ্‌তে হবে। আর রাত জেগোনা।"

তাহারা দুই জনেই সুখস্বপ্নের মোহিনী মায়ায় বিভোর হইয়া সেই রাত্রিটা কাটাইয়া দিল। পরদিন প্রভাতে, নরেশ তাহার স্যার্টিফিকেট গুলি লইয়া, কলিকাতায় চলিয়া গেল।

২৩

নরেশচন্দ্রকে বিদায় দিয়া চলুন পাঠক! একবার আমরা ভবানীপুর যাই। সেখানে কি হইতেছে, একবার দেখিয়া আসি।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু একখানি আরাম কেদারায় লম্ববান হইয়া পড়িয়া—ভগবানের সহিত কথোপকথনে নিমগ্ন আছেন। সে কথোপকথন, আমাদের একটু শুনিয়া রাখা প্রয়োজন।

মৃত্যুঞ্জয়, ভগবানকে বলিলেন—"তা হলে বৌমা এখন বেশ সেরে গেছেন? কোন ভয় নেইতো?"

ভগবান্। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে রোগের কথা বলা যায়না। আবার হ'তে কতক্ষণ।

মৃত্যুঞ্জয়। স্বর্ণ শ্বশুর বাড়ী গেল—তাকে যেসব কাপড় ও জিনিষ পত্র দিতে বলেছিলুম—তা সব কিনে দিয়েছে!

ভগবান। হুজুরের হুকুম ত আমি চির দিনই অক্ষরে অক্ষরে পালন করে আস্‌ছি।

মৃত্যুঞ্জয়। দেখ—ভগবান! অনেক খরচ পত্র করে কাশীর বাড়ী খানা মেরামত করা হয়েছে। কিন্তু পনর দিনের বেশী তথায়

ব্যস্ত কর্ত্তে পারি নি। একটা জরুর কাজের জন্য, চলে আসতে হয়েছিল। আমি মনে করছি—কালই একবার পশ্চিমে রওয়ানা হবো। বাবা বিশ্বনাথের ডাক— পড়েছে। এজন্য তাঁর চরণ দেখবার জন্য মনটা বড় ব্যস্ত হয়েছে। বিশেষতঃ আমার গিন্নি, কাশীতে যাবার জন্য খুবই বেশী ব্যস্ত হয়ে গেছেন!

ভগবান। তা আমি এবার আপনার চরণসেবা কর্ত্তে কাশীতে যেতে পাবো না কি?

মৃত্যুঞ্জয়। সে-কি কথা! তবে তোমার একটা মস্ত কাজের ভার দিয়ে রেখেছি যে বাবা! বৌমা যত দিন না ভাল করে সেরে ওঠেন, আর রমেশ ছুটী নিয়ে বাড়ী না আসে, ততদিন তোমার যাওয়া হবে না। তুমি চাই কি, কোন একটা অছিলা করে, রমেশের সঙ্গী হতে পারো।

ভগবান। যে আজ্ঞা হুজুর! সেই কথাই ভাল। তা হ'লে আমি কাল ভোরেই কালিকাপুরে চলে যাই।

মৃত্যুঞ্জয়। তাই করলে ভাল হয়। রমেশ ছোঁড়ার জন্য আমি তিলমাত্র ভাবিনা। কেননা ছোঁড়াটা এদিকে যেমন গোঁয়ার গোবিন্দ, অন্য পক্ষে তেমনি খুব হুঁসিয়ার। আমার ভাবনা কেবল তার মেয়েটা ও পরিবারের জন্য। যাক্—ওসব দিনরাত ভেবে মনটাকে খারাপ করি কেন? যা হ'বার তাই হবে।

ভগবান। আচ্ছা হুজুর! আপনিতো কাশী যাচ্ছেন। যদি ঘটনাচক্রে রমেশ বাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে পড়ে?

মৃত্যুঞ্জয়। তা হলে "ক্ষেত্রেকর্ম্মবিধীয়তে" এই নীতি অবলম্বন

করবো। এই দুনিয়াটা চিরদিনই আরসীতে মুখ-দেখাদেখি ভাবে চলে আসছে। রমেশ আমাকে দেখে আমার কাছে এসে দাঁড়ায়, মাপ চায়, তাহ'লে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবো। আর সে তা না করে, আমিও একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, মুখ ফিরিয়ে চলে যাব।"

ভগবান হাসিয়া বলিল—"বাবু! কাছিতে যখন খুব জোর টান পড়েছে, তখন আপনাকে আরও দ্রুত এগুতে হবে। তা দেখা যাক্! বাবা বিশ্বনাথ কি করেন!"

মৃত্যুঞ্জয় বাবু বলিলেন—"কাল বিকালের এক্সপ্রেসে আমাকে যেতেই হবে। কেননা গাড়ী রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। আজ প্রস্তুত হই গে। তুমি তোমার টাকাকড়ির যা দরকার হয়, দেওয়ানজীর কাছ থেকে নিয়ে যেও।" মৃত্যুঞ্জয় বাবু এই কথা বলিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।

ভগবান মনে মনে বলিল—"দেখা যাক প্রভু! কোথাকার জল কোথায় মরে। রমেশ বাবুর যদি টানের জোর থাকে, আপনি সহস্র চেষ্টা কল্লেও তা থেকে বাঁচতে পারবেন না। যখন মায়ার দরিয়ায় বান উঠেছে, তখন মান অভিমান প্রভৃতি বাজে প্রবৃত্তিগুলোকে খড় কুটির মত কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।"

ভগবান পরদিন কলিকাতা হইতে স্বর্ণের শ্বশুর বাড়ীতে তত্ত্বের উপযোগী কিছু জিনিষপত্র লইয়া, কালিকাপুরে চলিয়া গেল। প্রায় এক মাসের উপর স্বর্ণ শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে, তাহার সন্ধান খোঁজ খবর লওয়া হয় নাই, এজন্য কল্যাণীই ভগবানকে কতকগুলি জিনিস আনিতে ফরমাইস করিয়াছিলেন।

২৪

কালিকাপুরে পৌঁছিয়াই, ভগবান সেইদিন আহারাদির পর, রাখাল সর্দ্দারের মাথায় তত্ত্বের বোঝাটি তুলিয়া দিয়া, বেলা তিনটার পর নরেশচন্দ্রের বাটীর দিকে যাত্রা করিল। কুঞ্জপুরে পৌঁছিতে তাহার অপরাহ্ন হইল।

এই রাখাল সর্দ্দার, আগে লাঠিয়ালের কাজ করিত। তাহার পিতা গোপাল-সর্দ্দার, দশ-আনির বাবুদের ধানকাটা লইয়া বিবাদের সময়, দুই জন প্রতিপক্ষীয় লাঠিয়ালের মাথা ফাটাইয়া, এক বৎসর কারাবাসে থাকে। জনশ্রুতি এই—তাহার প্রপিতামহ আকাল সর্দ্দার নাকি ডাকাতি করিত।

মোটের উপর কথা হইতেছে—এই রাখাল সর্দ্দার ফৌজদারীর আইনের কড়াকড়ি দেখিয়া, বংশানুগত লাঠিয়াল বৃত্তি ত্যাগ করিয়া, তখন কালিকাপুরে জনমজুরের কাজ করিয়া জীবিকা চালাইতে ছিল। তাহাহইলেও, সে যে দশজনের মোহড়া লইতে পারে, এত শক্তি তখন তাহার দেহে।

ভগবান কুঞ্জপুরে পৌঁছিয়া, হাটের মধ্যে এক মুদিখানার দোকানের নিকটে গিয়া রাখালকে বলিল—"সর্দ্দার! মাথার মোটটা নামিয়ে, একবার তামাকটা খেয়ে নাও। আর একখানা ছোট মাঠ পার হ'তে পার্‌লেই, আমরা স্বর্ণদিদির শ্বশুর বাড়ীতে পৌঁছিব।"

রাখাল সর্দ্দার মাথার মোটটী নামাইয়া, মুদীর দোকানের সম্মুখে একখানি কেওড়া-কাঠের বেঞ্চির উপর, তাহার সেই মোটটী

রাখিয়া, তামাকু সাজিতে গেল। এই দোকানী আমাদের ভগবানের পূর্ব্ব পরিচিত। এজন্য সে খুব যত্ন খাতির করিয়া ভগবানকে দোকানের ভিতরে বসাইল।

এই সময়ে ভগবান দেখিল, অন্নদা, অদ্বৈত ও আর একটা লোক চাদরে মুখ ঢাকিয়া, সেই পর্ণকুটীরপূর্ণ হাটের এক দোকানে প্রবেশ করিল। এই দোকানটী সেই হট্টপল্লীর শৌণ্ডিকালয়। অন্নদা ও অদ্বৈতকে এই দূর গ্রামে, এই অবস্থায় দেখিয়া, ভগবানের মনে কি জানি কি কারণে, একটা বিষম কৌতুহল জাগিয়া উঠিল। তাহার উৎক্রোশ দৃষ্টি, সেই শৌণ্ডিকালয়ের দিকেই নিবদ্ধ রহিল।

একা রাখালসর্দ্দারকে দিয়া এই তত্ত্ব পাঠাইলেই চলিত, কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার সঙ্গে ভগবানের আসিবার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল স্বর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য। কেননা,স্বর্ণ তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিল—"ভগবান দাদা তুমি মাঝে মাঝে আমায় দেখিয়া গেলে, আমি খুব মনের স্বচ্ছন্দে শ্বশুরবাড়ীতে থাকিব।" সেই জন্যই ভগবানের এতটা কষ্ট স্বীকার।

ভগবানের তামাক খাওয়া শেষ হইলে, সে সর্দ্দারকে বলিল "একটা কাজ কর রাখাল! তুমি ত আরও দুই একবার স্বর্ণদিদির শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াছ। বোধ হয়, পথটা তোমার মনে আছে। বরাবর সোজা গিয়ে একটা শিবের মন্দির পাবে। ঠিক সেই মন্দিরের কোণাকোণি যে বাড়ীখানা, সেইটেই স্বর্ণদিদির শ্বশুর বাড়ী। বৃথা তুমি এই বোঝা নিয়ে কষ্ট পাও কেন? এখনি চ'লে যাও। আমার অন্য একটু কাজ আছে, সেটা সেরেই যাচ্ছি।"

সর্দ্দার মোট লইয়া চলিয়া গেল। ভগবান দোকান হইতে বাহির হইল। সেই শৌণ্ডিকালয়ের সম্মুখে—হাটের এক পরচালার মধ্যে ঢুকিয়া, একটী গাছের গুঁড়ির পিছনে আত্মগোপন করিয়া, সে বসিয়া রহিল। বলা বাহুল্য, এই ভাবে অদ্বৈত ও অন্নদার গতিবিধি লক্ষ্য করাই, তাহার মনের উদ্দেশ্য।

স্থিরভাবে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, ভগবান যেন একটু নিরাশ হইয়া পড়িল। কারণ সে দেখিল, তাহারা দুইজনে সেই নরকনিবাস হইতে যেন কোনমতেই বাহির হইতে চায় না। অদ্বৈত ও অন্নদা একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া মদ খাইতেছে ও একটা দুষ্ট মতলব আঁটিতেছে, তাহা সে স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিতেছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভগবান দেখিল, তাহারা দুইজনে শৌণ্ডিকালয় হইতে বাহির হইয়া, সেই হাটের একান্তে অবস্থিত এক বটবৃক্ষ তলে আসিয়া দাঁড়াইল। বট গাছটী প্রায় একশত বৎসরের পুরাতন। তাহার চারিদিক হইতে ঝুরি নামিয়া, সে স্থানটীকে খুবই নির্জ্জন করিয়াছে। গাছের নিম্নদেশটা ইটে বাঁধানো। সে ইটগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, খসিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। আর তাহার উপরে ষষ্ঠী শীতলা ও ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি গ্রাম্য দেবতাদের অসংখ্য সিন্দুর মাখানো ঘট সাজানো। এইস্থান ষষ্ঠীদেবীর আশ্রয় স্থান বলিয়া, গ্রামের পুত্রবতী কুলাঙ্গনাগণ ছেলেদের মাথার মানত চুলগুলি দিয়া যান। অনেক একুড়ী দুখিরাম, সাতকড়ি, পাঁচুগোপালের মাথার চুল, এই বটবৃক্ষের তলায় বিছান রহিয়াছে।

এই বটবৃক্ষের অবস্থান স্থানই হাটের শেষ সীমানা। তাহার

পার্শ্বে চৌধুরীদের আম বাগান। এইজন্য এই স্থানটা গ্রামের ষষ্ঠী তলা বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বা বাবাঠাকুরতলাও বলে।

ভগবান যখন দেখিল—এই অন্নদা ও আর দুইজন লোক নির্জ্জনবৃক্ষতলে বসিয়া কি একটা গভীর মন্ত্রণায় নিমগ্ন, তখন তাহার খুবই সন্দেহ হইল। ভিন্ন গ্রামে আসিয়া এরূপ ভাবে এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া, ভরা সন্ধ্যার মুখে কিসের জন্য এ গুপ্ত পরামর্শ?

তখন অন্ধকার হইয়াছে। সমস্ত ধরাবক্ষ অন্ধকারের কোলে বিশ্রাম করিতেছে। এই গ্রামের অনেক স্থানই, ভগবানের উত্তম রূপে পরিচিত ছিল। কেননা এই গ্রাম মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমীদারী ভুক্ত। গ্রামের অনেক ভদ্রলোকের নিকটই সে সুপরিচিত ছিল।

ভগবান এমন এক স্থানে আসিয়া আত্মগোপন করিল, সেখান হইতে সমস্ত কথাই শোনা যায়। সে শুনিল, অদ্বৈত ও অন্নদার মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইতেছিল।

অদ্বৈত বলিল—"তা হ'লে কি কর্ত্তে চাও?"

অন্নদা। দেখ, পাড়া গাঁ, রাত্রি দশটা না বাজ্‌তে বাজ্‌তে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সবাই দোরদাড়া দিয়ে ঘুমোয়। দশটার সময়ই কাজ আরম্ভ করা ঠিক। আমাদের ক্যাম্বিশের ব্যাগের ভেতর মোমবাতি আছে। আর দুই একটা ছোট মশালও আছে। চল, বাজার থেকে তেল কিনে নিয়ে, ঐ বটতলায় বসে মশালটা ভিজিয়ে ফেলি। তাতে কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না। কেননা আজ ভরা অমাবস্যা। জানতো আমরা পাড়াগেঁয়ে লোক। না হয় খড়ের নুড়ো, না হয় নারকোল পাতা, এই জ্বেলেই ত লোকজনও হাটুরেরা

রাত্রে যাতায়াত করে। এ সব দিকে তোমায় ভাবতে হবে না।

বাহির হইলদার মাঝি ব্যাটারা ভাগবে না ত ?

অদ্বৈত। ভাল কি খোকা বাবু! তাদের এক এক বেটা পাঁচিশ পাঁচিশ টাকা খেয়েছে। চালাকি কথা! যাক্! সেই সোঁকাবার ওযুধটা তোমার কাছে আছে ত ?

অন্নদা তাহার কোটের পকেটে হাত দিয়া বলিল—"আছে বই কি ?"

তৎপরে সে বলিল—"আমার ভয় হ'চ্ছে পাছে এই সাংঘাতিক ওষুধ শোঁকাতে গিয়ে না তাকে প্রাণে মেরে ফেলি।

অদ্বৈত। সে জন্য কোনও ভাবনা নাই তোমার। আমি মাত্রা ঠিক করে তোমার রুমালে ঢেলে দোব। ওর শাশুড়ী মাগীর জন্য ভাবনা কিছুই নেই। ভয়—ঐ স্বর্ণপ্রতিমা ছুঁড়িটার জন্য।

মুহূর্ত্তমধ্যে ভগবান সব কথা বুঝিল। তাহার সর্ব্বশরীর ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। হস্ত দ্বয় ক্রোধে মুষ্টিবদ্ধ হইল। এক এক সময়ে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, তখনই সেই সয়তানদের মাথা দুটা, লাথির আঘাতে চুর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়।

কিন্তু স্থিরভাবে ক্ষণেক কাল চিন্তার পর, ভগবান সেই গ্রামের এক বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোক গোপালবাবুর সহিত এ বিষয়ে একটা পরামর্শ করা, বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিল। তার পর সে অতি গোপনে বাঁশ-বাগানের অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া, গোপাল বাবুর বাড়ীর পথ ধরিল।

গোপাল বাবু তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া একটী ভদ্রলোকের

সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন—এমন অসময়ে তিনি ভগবানকে তাঁহার কক্ষমধ্যে ব্যস্তভাবে উপস্থিত হইতে দেখিয়া বলিলেন— "কি ভগবান! সহসা কি মনে করে, মৃত্যুঞ্জয় বাবু ভাল আছেন ত!"

অপর ভদ্রলোকটীর দিকে একবার চাহিয়া ভগবান বলিল— "উপস্থিত সব ভাল। আপনার সঙ্গে একটা খুব জরুর কথা আছে। একবার দয়া করে এ দিকে উঠে আসুন।"

গোপাল বাবু, তখনই বৈঠকখানা হইতে উঠিয়া, বাহিরের দালানে আসিয়া বলিলেন—"ব্যাপার কি ভগবান? তোমার মুখ অত বিমর্ষ কেন?"

ভগবান জানিত, এই গোপাল বাবু মৃত্যুঞ্জয় বাবুর একজন খুব অনুগত বন্ধু। সুতরাং সে বিনাসংকোচে, সমস্ত কথা গোপাল বাবুকে খুলিয়া বলিল। বলা বাহুল্য—গোপাল বাবু সে গ্রামের মধ্যে একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক।

গোপাল বাবু বলিলেন—"এ সংসারে দরিদ্রের, আশ্রয়হীনের রক্ষার একমাত্র উপায় সেই নারায়ণ। তিনি যেন তোমার এই ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করিয়া, আমাদের সদর-পুলিশের ইনস্পেক্টার বাবুকে আজ আমার বাড়ীতে আনিয়া দিয়াছেন। চশমা চোখে ঐ যে বাবুটি বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন—উনিই ইনস্পেক্টার। উনি আমাদের এই গাঁয়ের হরিহর বাবুর জামাই। আমায় খুবই ভালবাসেন। এজন্য শ্বশুরবাড়ী এসে একবার আমার সঙ্গে দেখা না করে যান্ না। এ ভয়ানক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার চেয়ে ওঁর সঙ্গে

পরামর্শ করাই ঠিক। তোমার মুখে সবকথা শুন্‌লে, উনিই একটা উপায় কর্‌তে পারেন।

বা ভগবানকে সঙ্গে লইয়া, গোপাল বাবু তাঁহার বৈঠকখানায় [illegible]য়া ইন্‌স্‌পেক্টার নৃসিংহ বাবুকে, ভগবানের কথিত সমস্ত ব্যাপারই এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন।

নৃসিংহ বাবু—সমস্ত ঘটনা শুনিয়া একটু ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"ও! মানুষে এতদূর শয়তান হতে পারে? তা বেশই হয়েছে। শয়তানদের এখন কোন মতেই বাধা দেওয়া উচিত নয়। তা হ'লে আইন ওদের কিছুই কর্ত্তে পার্ব্বে না। আমরা আগেই প্রস্তুত হয়ে, সেই বাড়ীর আশেপাশেই লুকিয়ে থাক্‌বো। আর ওরা মশাল জ্বালিয়ে যেমন ঘরে আগুণ দিতে যাবে, তখনই ওদের হাতে নাতে ধরে ফেলবো! এজন্য আপনাদের কিছু ভাব্‌তে হবে না।"

গোপাল বাবু বলিলেন—"এই ভগবান, অতি সাদাসিদে লোক। পরোপকার করাই এর ধর্ম্ম। আর এ গ্রামের আদর্শ জমীদার, মৃত্যুঞ্জয় বাবুর ইনি হচ্ছেন, একজন অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারি। মৃত্যুঞ্জয় বাবু, তাঁর প্রজাদের সুখ স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধির জন্য যা কিছু করেছেন, তার উপলক্ষ্য আর প্রধান সহায় আমাদের এই ভগবান।"

ইনস্‌পেক্টার নৃসিংহ বাবু, তখনই এক টুকরা কাগজে দুই চারি লাইন লিখিয়া, সেই গ্রামের পুলিস ষ্টেসনে, গোপাল বাবুর একজন চাকরকে পাঠাইলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে একজন সাদা পোষাক পরা কনষ্টেবল তাঁহাকে একটা পিস্তল আনিয়া দিল। ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, গ্রামের দারোগা বাবু সেই ক্ষেত্রে সদলবলে দেখা দিলেন।

নৃসিংহ বাবু—তাঁহার অধীনস্থ সেই দারোগা ও কনষ্টেবলদের ভবিষ্যৎ করণীয় কার্য্যসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া, ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "রাত্রি ত নয়টা বাজে। আর এখানে বসে, অনর্থক দেরী করলে চলবে না। একে আজ অমাবস্যা, তার উপর আবার আকাশটা খুব মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে।"

ইন্‌সপেক্টার নৃসিংহবাবু, গোপাল বাবুর মুখে ভগবানের পূর্ণ পরিচয় আগেই পাইয়াছেন। এজন্য তিনি বলিলেন—"ভগবান বাবু! তোমায় যেমন বলে দিলুম, ঠিক সেই ভাবেই কাজ করো। কোন রকমে চাঞ্চল্য দেখিও না, বা অসতর্ক হয়ো না। তারা একটু মদ খেয়েছে বলে, তাদের মাতাল বলে মনে ভেবো না। অনেক সয়তানই খুন নরহত্যা, সতীর সতীত্ব নাশ করবার সময়, তাদের দুর্ব্বলচিত্তে একটু বেশী পরিমাণে সাহস সঞ্চয় করবার জন্যে, এই ভাবে মাতাল সেজে থাকে। আমার এই তিনজন ছদ্মবেশী কনেষ্টবলকে সঙ্গে নিয়ে, যাও তুমি। এদের যা বলবে এরা তাই করবে।"

ইনস্‌পেক্টার বাবুর লোকজন লইয়া ভগবান একখানা মাঠ ঘুরিয়া, নরেশচন্দ্রের খিড়কীর উদ্যানে প্রবেশ করিল।

২৫

এদিকে, যে কি সর্ব্বনাশের জোগাড় হইতেছে, তাহা স্বর্ণ-প্রতিমা বা তাঁহার শাশুড়ী কিছুই জানিতে পারেন নাই। সর্দ্দারের মুখে স্বর্ণ শুনিয়াছিল, যে তাহার ভগবান দাদা আসিয়াছে। কিন্তু রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল, তবু তাহার ভগবান দাদা আসিল না কেন? সে একটু অবশ্য জানিত, যে তাহার ভগবান দাদা সর্ব্বদাই একটা না

একটা খেয়ালের অধীন হইয়া কাজ করে। এজন্য সে সর্দারকে খাওয়াইবার জন্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবানের ভাত লইয়া বসিয়া রহিল। দশটা বাজিয়া গেল, নিরাশ চিত্তে ভাতগুলি চাপা দিয়া রাখিয়া, সে শয়ন করিতে গেল। তাহার বৃদ্ধা শাশুড়ী ঠাকুরাণী, ইতি পূর্ব্বেই শয্যাশ্রয় করিয়া নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। স্বর্ণও রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া শুইতে গেল।

ইহার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, তাঁহাদের প্রধান চালা ঘর খানির পশ্চাৎদিকে তিনজন লোক, অতি সন্তর্পণে অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া, প্রেতের মত অতি ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। তাহারা তিনজনে সেই বড় ঘরখানি, অর্থাৎ যে ঘরে স্বর্ণও তাহার শাশুড়ী শয়ন করে, তাহার পিছনে আসিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল। এই তিনজন পাঠকের পূর্ব্ব পরিচিত অন্নদা, অদ্বৈত ও তাহাদের সঙ্গী এক শয়তান।

অদ্বৈত, অন্নদার কাণেকাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—"দেবতা আমাদের সহায়। আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায়—কাজের খুব সুবিধা হয়েছে। মশাল জেলে এইবার ঘরে আগুণ ধরিয়ে দাও।"

তাহাদের সেই সঙ্গীটা মশাল জালিল। কিন্তু সেই ঘরের চালের কানাচটা খুব উঁচুতে বলিয়া, সে মাটিতে দাঁড়াইয়া সেই জ্বলন্ত মশাল কানাচের গায়ে ঠেকাইতে পারিল না।

উপস্থিতবুদ্ধি সম্পন্ন অন্নদাকিশোর বলিল—"দেরী কল্লে ত কাজ চল্‌বে না। একটা কাজ কর তুমি—অদ্বৈত। তুমি না হয় আমার কাঁধে উঠ। মশালটা আমি তোমার হাতে না হয় তুলে দিচ্ছি। তুমিই আগুণ ধরিয়ে দাও।"

এই শয়তানত্রয়ের সর্ব্বনাশের জন্য, পূর্ব্বে যে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহারা ত তাহা জানিতে পারে নাই। এজন্য অদ্বৈত নিঃশঙ্কচিত্তে, অন্নদার প্রস্তাবেই সম্মত হইল।

অন্নদা নীচে রহিল, অদ্বৈত তাহার স্কন্ধোপরি উঠিল। সেই সঙ্গী শয়তানটা, মশাল ধরাইয়া অদ্বৈতের হাতে দিল। অদ্বৈত সেই জ্বলন্ত মশাল চালের এক কোণে লাগাইবা মাত্র, সেখানকার খড়গুলা ধরিয়া উঠিল।

এই সময়ে নৃসিংহবাবু, তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া সিংহবিক্রমে এই তিন শয়তানের উপর পড়িলেন। বলা বাহুল্য—নৃসিংহবাবুর হুকুমে, তখনই একজন কনষ্টেবল, পার্শ্ববর্ত্তী একটা আমগাছে উঠিয়া জ্বলন্ত খড় গুলা স্থানচ্যুত করিয়া দূরে ফেলিয়া দেওয়ায়, আগুণটা তখনই নিভিয়া গেল। শয়তানদের উদ্দেশ্য বিফল হইল।

নৃসিংহ বাবু দুইজন কনষ্টেবলকে বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন—"এখনি শালাদের হাতে হাতকড়ি লাগা।"

অন্নদা কনষ্টেবলের কার্য্যে বাধা দিতে গেল। কিন্তু তখনই একটা বিরাশী সিক্কা ওজনের চপেটাঘাত, তাহার গণ্ডদেশে পতিত হওয়ায়, সে ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য—সেই তিন শয়তান তখনই পুলিসের হাতে বন্দী হইল। আর ধর্ম্ম—এই নিষ্কলঙ্কচরিত্রা অপাপবিদ্ধা, পতিসোহাগিনী, স্বর্ণপ্রতিমাকে এক মহ বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন।

নৃসিংহবাবু—দারোগাকে বলিলেন—"এই তিন শালাকে আচ্ছা করিয়া পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া, আজ রাত্রের মত তোমা

দের থানার হাজত-ঘরে রাখিয়া দাও। এই তিন জন আসামীর জন্য তুমিই দায়ী! খুব হুঁসিয়ার!"

স্বর্ণ-প্রতিমা, তাঁহার শাশুড়ী ও রাখাল সর্দ্দার ঠিক এই সময়ে বাড়ীর পিছনে একটা গোলমাল শুনিয়া, উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। রাখাল তখনই তাহার বাঁশের লাঠীগাছটী হাতে লইয়া, উঠানের দরোজায় শিকলী লাগাইয়া, খিড়কীর দিকে চলিয়া গেল।

সে—যে ব্যাপার দেখিল, তাহাতে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। তাহাদের গ্রামের ধনী মহাজনের পুত্র খোকাবাবুকে পুলিসের হাতে বন্দী হইতে দেখিয়া সর্দ্দার ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিল—"ভগবান দাদা! ব্যাপার কি?"

সেই ক্ষেত্রে ভগবানের নামোচ্চারিত হইতে শুনিয়া, অন্নদা চারিদিকে উদাসদৃষ্টিতে চাহিবামাত্রই দেখিল, ভগবান তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া ঈষৎ হাস্য করিতেছে। তখন সে বুঝিল—কিসে কি ঘটিয়াছে।

কথায় বলে—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে?" এ কথাটার গভীরার্থ সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত, সকলেই বুঝিল। বলাবাহুল্য—আসামীত্রয় থানায় চালান হইয়া গেলে, রাখাল সর্দ্দারও ভগবান অন্দরমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বর্ণকে বলিল—"দিদিমণি! বড় পুণ্যবল তোমার যে আজ নারায়ণ তোমায় রক্ষা করিয়াছেন।

স্বর্ণ ও তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী, ভগবানের মুখে সবকথা শুনিয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলিলেন—"বৌমা! আমরা মহাপাপী। বৈকুণ্ঠের ভগবানকে

কথনও চোখে দেখ্‌তে পাবো না। তা তোমার এই ভগবান-দাদাকে একবার ভাল ক'রে দেখে নিই। এই ভগবান যদি না থাক্‌তো, তাহলে আজ আমাদের কি সর্ব্বনাশ হতো—বল দেখি বোন! আমাদের সবাইকে জ্যান্তে পুড়ে মরতে হতো।"

যাই হোক, সেই রাত্রে ক্ষুধিত ভগবান তাহার স্বর্ণদিদি হইতে মুড়ি গুড় চাহিয়া লইয়া, অতি আনন্দের সহিত তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। তত রাত্রে সে অন্নগ্রহণ করিল না।

২৬

রমেশচন্দ্র কাশীতে গিয়া যে বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, যে কোম্পানীর চাকরী করিতেছিলেন, তৎসম্বন্ধে সকল সংবাদই মৃত্যুঞ্জয়বাবু অজিতের নিকট পাইয়াছিলেন। তাঁহার পাষাণের মত শক্ত অভিমান ও মনের দর্পটা, রমেশের অদৃষ্টের নানাবিধ কষ্ট-লাঞ্ছনা, ও দূরবস্থার প্রচণ্ড আঘাতে, ক্রমশঃ ক্ষয়িতমূল হইয়া আসিয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা মনে মনে ভাবিতেন—"আর কেন? তমোগুণ বর্জ্জন করিবার সময় হইয়াছে। ধরিতে গেলে—আমিই দোষী। রমেশচন্দ্র যদি আমার ভগিনীপুত্র না হইয়া সন্তান হইত, তাহা হইলে কি আমি তাহাকে এতটা হতশ্রদ্ধা করিতাম? এতটা নিষ্ঠুর হইতে পারিতাম?"

অবিমুক্তক্ষেত্র কাশীধামে, ধূর্জ্জটীর চরণ প্রান্তে পৌছিয়া, সেই মায়াযুক্ত মহাদেবের বিভুতির শক্তিতে, তাঁহার মনের সকল উগ্রভাবই কমিয়া গিয়াছে। এখন বাকি—কেবল অবসর মত

রমেশচন্দ্রকে বুকে তুলিয়া লওয়া! তিনি তাহারই উপযুক্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন।

শীঘ্রই সে সুযোগ ঘটিল। সেবার কাশীধামে বসন্তরোগের প্রকোপটা খুব বেশী। রমেশচন্দ্র যে বাসায় থাকিতেন, সেখানে আরও দুইজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী থাকিতেন। রমেশের প্রথমে খুব জ্বর হইল। তারপর বসন্তের গুটিকা দেখা দিল। যে দুইজন বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহারা অতি হৃদয়হীনের মত, "আপনি বাঁচলে বাপের-নাম" এই নীতি অবলম্বনে, রমেশচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য—মৃত্যুঞ্জয়ের কর্ণে এ ভীষণ সংবাদ পৌছিল। তখনও বেশী গুটিকা বাহির হয় নাই। তবে রমেশচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা জ্বরে অজ্ঞান অচৈতন্য বটে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু আর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনের অভিমানের প্রবল বাঁধটা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। তিনি তখনই একখানি গাড়ি করিয়া, অজ্ঞান অচৈতন্য রমেশকে নিজের বাড়ীতে আনিলেন। রমেশচন্দ্র ইহার কিছুই জানিতে পারিলেন না।

রমেশের চিকিৎসার জন্য, একজন বড় কবিরাজ নিযুক্ত হইলেন। সেই সময়ে কাশীতে বিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ নামে, এই ভীষণ রোগের একজন নামজাদা চিকিৎসক ছিলেন। এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে, তাঁহার খুব একটা হাতযশও ছিল। আর তাঁহার ভিজিটও সিবিলসার্জ্জনের মত।

যার পরমায়ু আছে, তাহাকে মারে কে? বিশ্বেশ্বরের করুণায়, এই বিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ সাতদিন ব্যাপী চিকিৎসার পর বলিলেন—

'কোন ভয় নাই বাবুজি ! ইহা সাংঘাতিক ধরণের মসূরিকা নহে ইনি এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।"

রমেশচন্দ্রের মাতুল ও মাতুলানী, তুইজনেই অশ্রান্তভাবে, বিনিদ্র নেত্রে, রমেশের সেবাশুশ্রূষা করিতেছিলেন। রমেশের যে দিন প্রথম জ্ঞান হইল, সে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিল, অতি সুন্দর সূর্য্যালোক ঝলকিত দ্বিতলের এক সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে সে শায়িত।

রমেশ বিস্মিতভাবে বলিল—"আমি কোথায় ?"

রমেশের মাতুলানী ও মাতুল তুইজনেই সেই কক্ষমধ্যে বসিয়া ছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় ও তাঁহার পত্নীর মধ্যে, চোখের ইঙ্গিতে, নীরব ভাষায় একটা কথাবার্ত্তা হইয়া গেল। সে কথার মানে এই, "আর কেন—ধরা দাও না।"

রমেশের মাতুলানী, তখনই ভাগিনেয়ের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিলেন,—"বাবা রমেশ ! তুমি আমার বাড়ীতেই আছ ?"

রমেশ তাহার স্নেহময়ী মাতুলানীকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া উঠিল। সে অশ্রুধারা তাহার রোগবিশীর্ণ গণ্ড দিয়া বহিয়া বালিসের উপর পড়িল। রমেশ উচ্ছাসরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল—"মামী মা ?"

মামী মা, তখনই নিজের অঞ্চলে রমেশের নেত্রবিগলিত সেই অশ্রুধারা মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"কেন বাবা রমেশ ?"

রমেশ। মামী মা ! আপনাদের চরণে আমি বড় অপরাধী। অতি অকৃতজ্ঞ নরাধম আমি। নরকেও আমার স্থান নাই মামী মা ! আমার দেবপ্রতিম মামা কোথায় ?

মৃতুঞ্জয়ের চোখেও জল আসিয়াছিল। তিনি রমেশের শয্যা-পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন—"আমায় ডাকিতেছ রমেশ?"

রমেশের চোখে আবার অশ্রুধারা বহিল। সে শয্যা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিল। তাহার মনের উদ্দেশ্য, সে মাতুলের পা দুখানি ধরিয়া, মার্জ্জনা ভিক্ষা চায়।

মৃতুঞ্জয় তাহাকে উঠিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"বড়ই দুর্ব্বল তুমি। এখনই মূর্চ্ছা যাইবে। চুপ করিয়া শুইয়া থাক।"

রমেশ স্থিরভাবে শয্যায় শুইয়া রহিল। তখনও তাহার চক্ষে জলধারা। সে মাতুলের দিকে চাহিয়া রুদ্ধ স্বরে বলিল—"মামা! আমি আপনার চরণে বড়ই অপরাধী। আমায় মার্জ্জনা করুন

অভিমানের বাঁধের যে টুকু বাকি ছিল, তাহা মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া গেল। স্নেহের প্রবল উচ্ছাস, বন্যার মত মৃত্যুঞ্জয়ের উদারপ্রাণকে একবারে প্লাবিত করিয়া দিল। তিনি বলিলেন—"মার্জ্জনা চাহিবার আগেই ত আমি তোমায় মাপ করিয়াছি রমেশ! তুমি যে আমার সন্তানের চেয়েও প্রিয়। অতীতের কথা সব ভুলিয়া যাও।"

এ করুণার অভিনয়ের দুঃখময় যবনিকা আমরা এই স্থানে ফেলিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, আর একপক্ষ বাদে রমেশচন্দ্র সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। রমেশচন্দ্র একদিন তাহার মাতুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মামা! আমার বাড়ীর সংবাদ কিছু রাখেন কি?"

মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন—"রাখি বই কি বাবা! বৌমা আর আমার নাতনী স্বর্ণপ্রতিমা ভাল আছে। আর আমি ভগবানকে টেলিগ্রাম

করিয়াছি, তাহাদের সকলকে এখানে আনিতে। তাহারা বোধ হয়, কালই এখানে আসিয়া পৌছিবে।”

রমেশচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিলেন—“ভগবান! ভগবান!! সে কি আপনার পরিচিত নাকি?

মৃত্যুঞ্জয় বলিলেন—“ভগবানকে না চেনে কে রমেশ! যে চেনেনা, সেই মহাভ্রান্ত?”

শেষ কথা।

আমাদের গল্প শেষ হইয়া আসিয়াছে। এবার শেষের কথা-গুলি বলিয়া, পাঠক ও পাঠিকার নিকট বিদায় লইব।

বৰ্দ্ধমানের ফৌজদারী আদালতের বিচারে, অন্নদার অদ্বৈতের এবং তাহার সঙ্গীর, গৃহে অগ্নিপ্রয়োগের চেষ্টার জন্য, এক বৎসর কঠোর কারাদণ্ড হইল। বলা বাহুল্য, এই মোকদ্দমায় সময় এই কুপুত্রকে বাঁচাইবার জন্য, কালীকিশোর জলের মত অর্থব্যয় করিয়াও কিছু করিতে পারিল না।

ইহার পরদিন, ভগবান স্বর্ণপ্রতিমা ও কল্যাণীকে লইয়া কাশীতে পৌছিল! সে মিলনের মধুর দৃশ্য, মধুর অপেক্ষাও মধুর।

মৃত্যুঞ্জয় স্বর্ণপ্রতিমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—“এস দিদি! স্বর্ণপ্রতিমা আমার! আমার সোণার সংসার আলো করিয়া তুমি চিরদিন মহালক্ষ্মী রূপে বিরাজ কর।”

পরদিন প্রভাতে, মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাঁহার দেওয়ানজী ও ভগবানের সম্মুখে লেফাফা মধ্য হইতে রমেশকে একখানি কাগজ বাহির

করিয়া পড়িতে দিলেন। রমেশচন্দ্র সে কাগজখানি পড়িয়া দেখিলেন, মাতুল তাঁহাকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিয়াছেন।

রমেশের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। সে মাতুলের পা দুখানি জড়াইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল। মৃত্যুঞ্জয়, রমেশকে বহু-দিনের পরে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। এ স্নেহময় আকর্ষণে তাঁহার মনের বিরাগ, দর্প, অভিমান, অনাসক্তি, সবই শরতের মেঘের মত মুহূর্ত্তমধ্যে উড়িয়া গেল।

একদিন উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, ভগবান রমেশকে তাঁহার মাতুল মৃত্যুঞ্জয় বাবু তাঁহার জন্য কি কি করিয়াছেন সব কথাই খুলিয়া বলিলেন। রমেশ তাহা শুনিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে বলিয়া উঠিলেন— "জানি না মামা মানুষ কি দেবতা! হায়! আমি এমন হতভাগ্য, এতই ভ্রমান্ধ, এতটা আমার মতিচ্ছন্ন দশা, যে এই দেবতাকে আমি চিনিতে পারি নাই।"

রমেশচন্দ্রকে বিষয়-আশয়ের সমস্ত ভারার্পণ করিবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বাবু সপরিবারে ভবানীপুরে আসিলেন। তাঁহার সোণার সংসারে স্বর্ণ-প্রতিমার আবির্ভাব হওয়ায়, তাহা যেন আলোক সমুজ্জল দেব মন্দিরের মত হইয়া উঠিল।

বলা বাহুল্য—মৃত্যুঞ্জয় বাবু, রমেশের আদরিণী কন্যা স্বর্ণ-প্রতিমাকে সোণায় মুড়িয়া দিয়া, জীবন্ত "স্বর্ণ-প্রতিমায়" দাঁড় করাইলেন।

সমাপ্ত।